চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত

॥ ষষ্ঠ পর্ব ॥

শিপ্রা দত্ত

ডি·এম·লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

Copyright reserved by the Author.

প্রকাশক :
শ্রীঅমূল্য গোপাল মজুমদার
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
প্রভাবতী প্রেস
সনাতন হাজরা
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৮৭

মূল্য—২০ ০০

মুখপত্র

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারতের ষষ্ঠ পর্ব প্রকাশিত হলো। প্রথম পাঁচটি পর্ব দেশ বিদেশের পাঠকদের বিশেষ সমাদর লাভ করায় তাঁদের প্রেরণায় ষষ্ঠ পর্ব লিখতে উৎসাহ পেয়েছি।

এক বছর পূর্বে এই পর্বটি প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, প্রেস ও বিদ্যুৎ দানবের অসহযোগীতায় দীর্ঘকাল পর এই পর্বটি আত্ম প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। সপ্তম পর্বে প্রথম খণ্ড শেষ হবে। যে রকম শম্বুক গতিতে দীর্ঘকাল পর পর প্রথম খণ্ডের বিভিন্ন পর্ব আত্ম প্রকাশ করছে—তাতে দ্বিতীয় খণ্ডের বিভিন্ন পর্ব প্রকাশিত হতে কত কাল সময় নেবে জানি না।

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণ ত্রুটির দৌরাত্ম্য হতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না। আশা করি এই অনিচ্ছাকৃত ও অত্যন্ত অনভিপ্রেত ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গ মার্জনা করবেন। প্রতিবার আপনাদের সামনে একই কৈফিয়ৎ দিতে লজ্জা বোধ করলেও প্রেসের দৌরাত্ম্য হতে অব্যাহতি নেই।

এই গ্রন্থের প্রথম দুই পর্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাস যে অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন, তা এর সঙ্গে ছাপানো হলো। সাহিত্যিক ও রামতনু লাহিড়ীর অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাসের পরিচয় নতুন করে বাংলা দেশের পাঠক সমাজকে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

শিপ্রা দত্ত।

আমার পরমারাধ্যা মাতা ৺সুবালা দত্ত, শৈশবে যিনি সর্ব প্রথম আমাকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিয়েছিলেন, যাঁর উৎসাহে সাহিত্য সাধনার পথে এতদূর অগ্রসর হয়েছি—

ও

আমার পরমারাধ্য পিতা ৺অতুল চন্দ্র দত্ত, যাঁর সাহিত্য সাধনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৈশোরে প্রথম সাহিত্য সাধনায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম, সেই পরম পূজনীয় ও পরম প্রিয় জনক-জননীর অমর আত্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

শ্রদ্ধাঞ্জলি

লেখিকার অন্যান্য বই

চেনা অচেনা।

অধ্যাপিকার ডায়েরী।

ভেসে যাওয়া ফুল।

এরা ভুল করে বারে বারে।

আলোর ইসারা।

কালের পদধ্বনি।

কালের ঢেউ।

কাচের সংসার।

সুখের লাগিয়া।

আলো ছায়ার অন্তরালে।

নানা রং।

চলার পথে।

নষ্ট লগ্ন।

হাসি ঝরা রাত্রি।

চট্টগ্রামের লোকসঙ্গীত।

চরিত্রে রামায়ণ মহাভারত।

(১ম পর্ব, ২য় পর্ব, ৩য় পর্ব, ৪র্থ পর্ব, ৫ম পর্ব)

ছোটদের অমৃতের সন্ধানে।

অভিমত

Dr. Kshudiram Das.
M. A. (Gold-medalist). D. Litt. (CAL)
W.B.S E.S. (Retd)
Ramtanu Lahiri. Professor. CAL. UNIVERSITY.
CALCUTTA/KRISHNAGAR
Date. 3. 12. 78.

মহাভারত ও রামাযণ প্রায আডাই হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন গঠনের, এমন কি ভারতবাসীর উচ্চতম ধ্যান ধারণারও নিযন্ত্রী শক্তি রূপে কাজ করে আসছে। এ দুযের কথা স্রোত আজও চলিষ্ণু যেহেতু তা থেকে ইঙ্গিত গ্রহণ করে আধুনিক বেশ কিছু সাহিত্যিক নূতনতর সৃষ্টি অনুশীলন করছেন, জীবন দর্শনের কাজে লাগাচ্ছেন সামাজিক, রাজনীতিক ও প্রবন্ধকারেরা। সমাজ এঁদের নানা ভাবে অভিনন্দিত ও করেছেন। সুলেখিকা শিপ্রা দত্ত এঁদেরই অন্যতম একজন।

তিনি রামামণ—মহাভারত মিলিযে এমন একটি বিষয ধরেছেন, যা নিযে অন্তত বাঙলায এত ব্যাপক ভাবে আর কোনো আলোচনা হযেছে এমন মনে পডছে না। তাঁর প্রযাস হ'ল রামাযণ মহাভারতের চবিত্রগুলির তুলনা মূলক আলোচনা। লেখিকা নিশ্চযই এ দুই মহাকাব্যের মুখ্য চবিত্রগুলির গঠন ও প্রকৃতির মূলে বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য কারছেন। যেমন—যুধিষ্ঠির—রাম, দ্রৌপদী—সীতা, অর্জুন—লক্ষ্মণ, ভীম—কুম্ভকর্ণ, কুন্তী—কৌশল্যা গান্ধারী—মন্দোদরী। কিন্তু কেবল সাদৃশ্য উদ্‌ঘাটনই তাঁর লক্ষ্য বস্তু হযনি। আর ঐ উদ্দেশ্য সাধনে কেবল আর্য রামাযণ মহাভারতকেই তিনি অবলম্বন করেন নি, স্বচ্ছন্দে বাঙলা রামাযণ মহাভারত থেকেও উপাদান সঞ্চযন করেছেন। সম্ভবত অভ্যস্ত বাঙালি পাঠক পাঠিকাদের অনুসরণের সুবিধার্থে। বস্তুতঃ ভাববাদী দৃষ্টি কোণের অধিকার নিযে তিনি অগ্রসর হযেছেন, কোনো ঐতিহাসিক মূল্যাযনের দিকে যাননি। কোন চরিত্রের

কোন্ অংশ কার অনুসরণ হতে পারে এমন বিচারেও প্রবৃত্ত হননি, জাতীয় মানসে সুচির-সংসক্ত আদর্শকেই বহুমান করে নিয়েছেন এবং তদনুযায়ী ঘটনা ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করেছেন। এতে মুষ্টিমেয় পণ্ডিত গবেষক স্থানে স্থানে প্রশ্ন সমাকুল হলেও সাধারণ পাঠক পাঠিকা চমৎকৃত এবং উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহে।

লেখিকা শ্রীমতী দত্তের আলোচনায় তুলিত চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য দুইই দেখানো হয়েছে। তাঁর উপস্থাপন রীতি হ'ল মাঝে মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য গুলি দেখিয়ে ঘটনা ক্রমের বিশ্লেষণে চিত্রের মত সব পরিস্ফুট করার আয়োজন। বস্তুত কাহিনী ক্রমের সংস্পর্শ না থাকলে কেবল তুলনাগুলি নীরস হত। ফলে তাঁর আলোচনা বেশ ব্যাপক হয়ে কয়েকটি খণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম পর্বের আলোচনা আমি আদ্যন্ত দেখেছি। তিনি যথাসাধ্য সরল ও হৃদয়গ্রাহী করে বিষয় উপস্থাপিত করেছেন, অথচ প্রামাণিকতার দিকেও দৃষ্টি দিতে ভোলেননি। দুই কুল রক্ষা করা সহজসাধ্য নয়। এতে শ্রমের প্রয়োজন ও যথেষ্ট। কিন্তু লেখিকা কার্পণ্য করে সংক্ষিপ্ত অথবা ভাসা ভাসা ধরনের আলোচনা করার নিজে সন্তুষ্ট হবার মানুষ নন, বোঝা যাচ্ছে। আমার ধারণায় এ রকম বিস্তৃত উদ্‌যোগ পাঠকদের সানন্দ সমর্থন ও স্বীকৃতি অবশ্যই লাভ করবে।

কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিতব্য এই মূল্যবান্ গ্রন্থের কাগজ ও মুদ্রণাদি আর একটু ভালো হলে আমি অধিকতর আনন্দিত হতাম সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কাগজ নিয়ে ফাটকাবাজি ও প্রেসের দুর্মূল্য ব্যবস্থাপনার দিনে বাঙলায় প্রকাশিত অধিকাংশ বইয়েরই যখন এই দশা, তখন এ বিষয়ে অভিযোগ টিকবে না।

পরিশেষে জানাই শ্রীমতী দত্ত উপন্যাস গল্প ও প্রবন্ধের বেশ কিছু পুস্তক পুস্তিকার লেখিকা হলেও সম্ভবত এই আলোচনা গ্রন্থটির তাঁর স্থান সুনির্দ্দিষ্ট করবে।

ক্ষুদিরাম দাস

কৌশল্যা ও কুন্তী

It is the general rule, that all superior men inherit the elements of superiority from their mothers—Jules Michelet.

রামায়ণে কৌশল্যা ও মহাভারতে কুন্তী চরিত্র অনুশীলন করলে এই উক্তির যথার্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌশল্যা নন্দন রাম ও কুন্তী পুত্র যুধিষ্ঠিরের যে সব আদর্শ গুণাবলী এই দুই মহাকাব্যের চরণে চরণে জ্বলজ্বল করছে, তাঁদের সে সব গুণগ্রামের জন্য তাঁরা তাঁদের জননীদের কাছে ঋণী।

এই দুই মহীয়সী রমণীর অশেষ গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হয়ে রাম ও যুধিষ্ঠির অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অসীম ক্ষমা ও তিতিক্ষা, সত্যের প্রতি অটল শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণের অধীশ্বর হয়েও এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় এ সমস্ত গুণরাজির কবচ পরিধান করেও তাঁরা জীবনব্যাপী দুঃখের সাগর মন্থন করে সায়াহ্নে যশের মুকুট পরে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দক্ষিণ কোসলের মহারাজার দুহিতা কৌশল্যার সঙ্গে অযোধ্যাপতি দশরথের বিয়ে হয়েছিল। রাজা দশরথের তিনি প্রধান মহিষী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বা অন্য কোন মহিষীর দ্বারা দশরথের কোন সন্তান লাভ হয়নি। এই জন্য পুত্র কামনায় রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কৌশল্যা প্রসন্ন চিত্তে অশ্বের পরিচর্যা করে তিনবার খড়গের প্রহারে অশ্বটিকে বধ করেন। ধর্মার্থে তিনি স্থির চিত্তে এক রাত্রি অশ্বের সঙ্গে অতিবাহিত করেন।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এবং পুত্রেষ্টি

যজ্ঞের পায়সান্ন গ্রহণের ফলে যথা সময়ে কৌশল্যা রাম জননী হলেন।

কৌশল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা রবেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা॥ (আদি) ১৮।১২

—দেবরাজ ইন্দ্রকে পেয়ে যেমন দেবমাতা অদিতি শোভিতা হয়েছিলেন, অপরিমিত তেজস্বী পুত্রকে পেয়ে কৌশল্যাও সেইরূপ রাজ-পরিবারে শোভা পেতে থাকেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৌশল্যা রামের জন্মের পূর্বে স্বপ্নে দেখলেন যে স্বয়ং নারায়ণ তাঁর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। কৌশল্যার স্বপ্ন সফল হলো। স্বয়ং নারায়ণ মানুষের রূপ নিয়ে তাঁর গৃহে জন্ম নিলেন।

রাম কৌশল্যার অতি প্রিয় ছিলেন। শৈশবাবস্থা হতে নানা ঘটনার মাধ্যমে এ জনশ্রুতির পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস রামায়ণে একদিন রাম লক্ষ্মণ বনে মৃগয়ায় গেলে দীর্ঘ সময় তাঁদের অদর্শনে কৌশল্যা ব্যাকুল হয়ে দশরথকে জিজ্ঞেস করেন—

প্রস্তুত আছয়ে ঘরে খাদ্য নানাবিধ।
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সন্নিধ॥ (আ)

রাজপ্রাসাদের কোথাও রাম লক্ষ্মণকে খুঁজে না পেয়ে কৌশল্যা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর ভরত, শত্রুঘ্নর মুখে রামের প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে—

কৌশল্যা ধাইয়া গিয়া রামে কৈল কোলে।
এক লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে॥
দরিদ্রের নিধি তুমি নয়নের তারা।
পলকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা। (আঃ)

কৌশল্যার এই উক্তির মধ্যে তাঁর অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ যেন উপ্‌ছে পড়ছে। রাজমহিষীদের মধ্যে এরূপ অপত্য স্নেহ সচরাচর দেখা যায় না। কৌশল্যা প্রধানা মহিষী হয়েও কখনও সেই পদের পূর্ণ মর্যাদা ভোগ করতে পারেননি। তাই একমাত্র পুত্র রামকে নিয়েই তাঁর

ভবিষ্যৎ আশা, ভরসা সব আনন্দের স্বপ্ন।

বৃদ্ধ মহারাজ দশরথ তরুণী ভার্যা কৈকেয়ীর ভয়ে সতত সন্ত্রস্ত। কৌশল্যাকে তাঁর যোগ্য সমাদর দেখাতে পারেননি—এই সত্য রাজা দশরথ ও কৌশল্যা উভয়ের মুখে মাঝে মাঝে শোনা গেছে।

রাম তখন সবে কিশোর। মুনি বিশ্বামিত্র রামকে তারকা রাক্ষসী বধের অভিযানে নেবার জন্য রাজা দশরথের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজা দশরথ অনেক ইতঃস্তত করে পরে মত দিলেন। যাত্রার পূর্বে রাম জননীর নিকট বিদায় নিতে আসলে—

কৌশল্যা শুনিয়া তাহা করেন রোদন।
ভিজিল নয়ন-নীরে নেতের বসন॥
কাতরা কৌশল্যা কোলে করিয়া রামেরে।
আশীর্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে॥ (আঃ)

তিনি যে কত স্নেহময়ী জননী ছিলেন, এই ঘটনা হতেই তা উপলব্ধি করা যায়। পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি অধীর হয়ে কেঁদে ভেঙ্গে পড়লেও ক্ষত্রিয় ধর্মের গ্লানি ঘটালেন না। রামের শিরে হাত রেখে পুত্রের নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন।

No joy in nature is so sublimely affecting as the joy of a mother at the good fortune of her child—জার্মান humourist Jean Paul Richter-এর এই কথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পুত্র সৌভাগ্যে অধীরা কৌশল্যা ও কুন্তী।

মহারাজ দশরথ রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবেন, এই সুসংবাদ শুনে কৌশল্যার বুকে আনন্দের জোয়ার তাঁর মন প্রাণকে মাতিয়ে তুলল।

লোক মুখে রামের অভিষেক সংবাদ শুনে সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ পূর্বেই কৌশল্যার নিকট উপস্থিত। কৌশল্যা এই সুসংবাদ শুনে সীতাকে তাঁর অন্তঃপুরে আনিয়েছেন। আগামী কাল পুষ্যা নক্ষত্রে যুবরাজ পদে রামের অভিষেকের সংবাদ শুনে কৌশল্যা প্রাণায়াম করে

জনার্দনের ধ্যান করছিলেন। (প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনম্।) সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে। রাম তখন জননীর নিকট গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, জননি, পিতা আমাকে প্রজা পালনের কার্যে নিযুক্ত করছেন। আগামী কাল আমার অভিষেক হবে। এই জন্য পিতার নির্দেশে আমার সঙ্গে সীতাকেও এই রাত্রি উপবাসে অতিবাহিত করতে হবে। উপাধ্যায়-দের ব্যবস্থানুসারে পিতা এইরূপ আদেশ দিয়েছেন।

বহু পূর্ব হতেই আকাঙ্ক্ষিত রামের অভিষেক সংবাদ শুনে কৌশল্যা আনন্দাশ্রুসিক্ত হয়ে রামকে বললেন—

বৎস রাম চিরং জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়শ্চ নন্দয়॥ (অযো) ৪।৩৯

—বৎস রাম, তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার বিরোধীরা ধ্বংস হোক। তুমি রাজ্যশ্রী লাভ করে আমার ও সুমিত্রার বন্ধুদের আনন্দ বর্ধন কর।

এখানে লক্ষণীয় যে কৌশল্যা কৈকেয়ী সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

সূতপুত্র কর্ণ রাজপুত্র নয় বলে রাজপুত্র অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁর অধিকার নেই—এ কথা শুনে, দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁর সাথে সখ্যতা স্থাপন করেন।

'হরষিতা কুন্তী দেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন॥ (আঃ)

কুন্তীর অন্তরে তাঁর পরিত্যক্ত পুত্রের প্রতি একটা স্নেহ ও আকর্ষণ সুপ্ত ছিল, তা উল্লেখিত ঘটনা হতে প্রকাশ পায়। যদিও তিনি তাঁর এই গোপন লজ্জার কথা সকলের নিকটই গোপন রেখেছিলেন, তবু অবহেলিত পুত্রের রাজ্য প্রাপ্তির সংবাদ কৌশল্যার মতই তাঁকেও আনন্দে উদ্বেলিত করেছিল। পুত্রের সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যে জননীদের অন্তর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়।

উপরোক্ত উক্তি হতে দেখা যাচ্ছে যে পুত্রের রাজা হবার আনন্দ

কৌশল্যা একা উপভোগ করতে চান না - সপত্নীকেও এ আনন্দের ভাগীদার করতে চান। এখানে সপত্নীর প্রতি তাঁর সহৃদয়তা বা সৌহৃদ্য ও সম্প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

কুন্তী কিন্তু তাঁর এই আনন্দ অন্য কারো সঙ্গে উপভোগ করতে পারেননি। কারণ প্রাক্ বিবাহ পুত্র জন্মানোর গ্লানি যে তিনি কারো কাছেই প্রকাশ করতে পারেননি।

কিন্তু কুন্তী চরিত্রেও সপত্নী মাদ্রীর প্রতি সৌহার্দ্যের ও সম্প্রীতির পরিচয় মহাভারতে বহুস্থানে পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র শুভ সংবাদ শুনেই কৌশল্যা প্রীত হননি ঃ —

শুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে ॥
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান ॥
স্বর্ণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র শাস্ত্রের বিধান ॥

— — — —

সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে।
সবারে আনিয়া রাণী তোষে নানা ধনে ॥

— — — — —

রামচন্দ্র রাজা হবে শুনি ভাগ্য মানে। (অঃ)

রামের প্রতি জননীর অপত্য স্নেহের এইটি আরেকটি নিদর্শন। রাম রাজা হবেন সংবাদে পুত্রের কল্যাণের জন্য তিনি সকলকে দুহাতে দান ধ্যান করতে থাকেন।

অন্যত্র রাম রাজা হবে শুনে তিনি রামকে আশীর্বাদ করে বলেছেন ঃ—

রামের কল্যাণে করিলেন অগণন ॥
কৌশল্যা বলেন রাম হও চিরজীব।
তোমার সহায় হউন শ্রী পার্বতী শিব ॥
অনেক কঠোরে আমি পূজিয়া শঙ্করে।

তোমা হেন পুত্র রাম ধরিনু উদরে ॥

— — — —

রাজমাতা হইলাম তোমার কারণে ॥ (আঃ)

রাজা দশরথের পাটরাণী হওয়ার চেয়েও রাজমাতা হওয়ায় কৌশল্যা দেবীর আনন্দ অধিকতর। কৌশল্যা সন্তানের কল্যাণে সাত শত সপত্নী পরিবেষ্টিত হয়ে (একমাত্র কৈকেয়ী ব্যতীত) ধূপ ধূনো ঘৃত দীপ প্রজ্বলিত করে দেব পূজোয় যখন ব্যস্ত তখন রাম এসে তাঁকে প্রণাম করলে তিনি প্রসন্ন মনে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ—

তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ ॥
নানাবিধ সুখ ভুঞ্জ হও চিরজীবী।
চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী ॥
সেবিলাম শিব শিবা চরণ কমলে। (অঃ)

উপরের উদ্ধৃতি হতে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে তিনি কেবল স্নেহশীলা জননী নন, তিনি ধার্মিক, ভক্তিমতী রাজরাণী রাজমাতা।

কৌশল্যা রামকে আরও বললেন, আমি অতিশুভ নক্ষত্রে তোমাকে পেয়েছি কারণ তুমি নিজ গুণের দ্বারা পিতাকে তুষ্ট করেছো। আমি পুরুষোত্তম হরির প্রসন্নতার জন্য যে সব ব্রত উপবাস করেছি, তা সার্থক হয়েছে। সেইজন্যই এই ইক্ষাকুবংশীয় রাজলক্ষ্মী তোমাকে করুণা করেছেন।

কৌশল্যা যে কতটা ধর্মাশ্রয়ী ছিলেন এখানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কুন্তীও ধার্মিকা ভক্তিমতী রাজরাণী ও রাজমাতা ছিলেন। কাশীদাসী মহাভারতে এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। (গান্ধারীর চরিত্র দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনা হতে প্রতীয়মান হয় যে গান্ধারীর মত কুন্তীর ধন ঐশ্বর্যের দম্ভ না থাকলেও ধর্ম বিশ্বাসে তিনি গান্ধারী হতে অনেক বেশী ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তাঁর পুত্র অর্জুনের

পক্ষে কুবেরের ধন ভাণ্ডার লুঠ করে এমনভাবে কণক চাঁপা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র মহাদেবেরই আশীর্বাদে। প্রকৃত ধার্মিকের প্রতি দেবতারা সতত প্রসন্ন ॥

অতঃপর রাম কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রণাম করে সীতার সঙ্গে আপন ভবনে ফিরে গেলেন।

রামের অভিষেকে বাধ সাধলেন রাজমহিষী কৈকেয়ী। ভগ্ন মনোরথ রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন-রামকে বনে যেতে হলে কৌশল্যা তাঁকে কি বলবেন বা তিনি ও এমন অন্যায় কাজ করে কি কৈফিয়ৎ দেবেন? রাজা দশরথ কৌশল্যার গুণের পরিচয় দিয়ে বললেন—

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীব চ সখীব চ ॥
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি।
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা ॥
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব।
ইদানীং তত্তপতি মাং যন্ময়া সুকৃতং ত্বয়ি ॥ (আযো)
১২।৬৮-৭০

—তিনি শুশ্রূষায় দাসীর ন্যায়। ক্রীড়া সময়ে সখীর ন্যায়। ধর্মাচরণে পত্নীর ন্যায়, কল্যাণ কামনায় ভগ্নীর ন্যায় ও স্নেহ প্রদানে মাতার ন্যায় সর্বদা আমার প্রিয় কামনা করে থাকেন। আমার অতি প্রিয় পুত্রদের জননী প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যা সত্যই সমাদর পাবার যোগ্য। কিন্তু আমি তোমার জন্যই তাঁকে সমাদরে কার্পণ্য করেছি। অন্যত্র দশরথ কৈকেয়ীকে তাঁর ঈপ্সিত দুটি বরের জন্য ভর্ৎসনা করে বলেছেন,

কৌশল্যা মাঞ্চ রামঞ্চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি।
দুঃখান্যসহতী দেবী মামেবানুগমিষ্যতি ॥ (অযো)
১২।৮৯

—কৌশল্যা যদি আমাকে ও রামকে না পান, তবে দুঃখ সহ্য

করতে না পেরে দেবী আমার অনুগমন করবে।

দশরথের উপরোক্তি হতে কৌশল্যার চরিত্রের মনোরম ছবি ফুটে উঠেছে।

রাম কৈকেয়ীর অন্তঃপুর হতে তাঁর চৌদ্দ বছরের বনবাস আদেশ শুনে পিতৃসত্য পালনের এই দুঃসংবাদ নিজ জননী কৌশল্যার নিকট জানাতে তাঁর অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলেন তিনি নানা উপাচারে যজ্ঞাদিতে ব্যাপৃত। অনেকগুলি পূর্ণ কুম্ভও রয়েছে। শ্বেত পট্ট বস্ত্র ধারিণী উপবাস-কৃশাঙ্গী গৌরাঙ্গী কৌশল্যা জল দ্বারা দেব তর্পণ করতে নিরত। কৌশল্যা অনেকক্ষণ পর রামকে দেখে সানন্দে তাঁর দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। রাম জননীকে প্রণাম করলেন, তিনিও পুত্রকে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন—

বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্।
প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্তিঞ্চ ধর্মং চাপ্যুচিতং কুলে॥
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব।
অদ্যৈব ত্বাং স ধর্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি॥ (অযো)
২০।২৩।২৪

—তুমি ধার্মিক মহাত্মা বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু কীর্তি ও কুলোচিত ধর্ম লাভ কর। দেখ তোমার পিতা রাজা কি রকম সত্য প্রতিজ্ঞ। ধর্মাত্মা মহারাজ অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।

এই কথা বলে জননী কৌশল্যা রামকে বসবার আসন দিলেন এবং কিঞ্চিৎ আহার করবার জন্য বললেন।

রাম মাতার সম্মানার্থে আসনটি স্পর্শ করে বললেন জননী, আপনি নিশ্চয় জানেন না যে আপনার সীতার ও লক্ষ্মণের দুঃসহ সময় উপস্থিত! আমার আসনের প্রয়োজন নেই। আমি দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি। কুশের আসন এখন আমার আসন। আমিষ ত্যাগ করে মুনিদের মত ফলমূল দ্বারা প্রাণ ধারণ করে চৌদ্দ বছর নির্জন বনে

বাস করতে হবে। মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্য দান করেছেন এবং আমাকে তপস্বীর বেশে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করেছেন। রামের কথা শুনে জননী কৌশল্যাদেবী ভূপতিত হলেন যেন স্বর্গ হতে কোন দেবতা পতিত হলেন। (পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিব্যশ্চ্যুতা)

ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। কিয়ৎক্ষণ পূর্বে রাণী কৌশল্যা দশরথের গুণের উল্লেখে মুখরা। হঠাৎ তাঁর জীবন নাট্যের পট পরিবর্তন ঘটলো। তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে এই ধারণা যেন দশরথকে রামের প্রতি তাঁর আচরণের মাধ্যমে উপহাস করলো। এ যেন Irony of fate.

কৌশল্যা রাগে দুঃখে সংজ্ঞা হারালে রাম তাঁকে ধরে উঠালেন। রাম জননীকে উঠিয়ে নিজের হাতে তাঁর গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেন।

রামের বিরহের সম্ভাবনায় শোকার্ত জননী তাঁর এতকালের লুকানো দুঃখের ঝাঁপি যেন একমাত্র সন্তানের সামনে খুলে ধরেছেন। যে দুঃখ গ্লানি অনাগত সুখের আশায় দীর্ঘকাল মনের নিভৃত কন্দরে গোপন রেখেছিলেন, এমন আকস্মিক দুঃখের আঘাতে তার ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙে পড়ল।

অতি বেদনা ভরা বুকে লক্ষ্মণের সামনেই রামকে বললেন—

যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায রাঘব।
ন স্ম দুঃখমতো ভূযঃ পশ্যেয়মহমপ্রজাঃ॥
এক এব হি বন্ধ্যাযাঃ শোকো ভবতি মানসঃ।
অপ্রজাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে॥ (অযো)
২০।৩৬—৩৭

—রাম যদি তুই আমাকে এইরূপ দুঃখ দেবার জন্য জন্ম গ্রহণ না করতিস, তাহলে আমি বন্ধ্যা থাকতাম, কিন্তু দুঃসহ দুঃখ পেতাম না। বন্ধ্যা নারীর মনে একটি মাত্র দুঃখ থাকে যে, সে পুত্রহীনা। এছাড়া

তার অন্য কোন দুঃখ হয় না।

আমি পতির অনুরাগ পেয়ে সুখ ও ঐশ্বর্য কখনও দেখতে পাইনি। আশা করেছিলাম যে পুত্রের দ্বারা তা দেখতে পাব। এই জন্যই এতদিন জীবন ধারণ করেছি।

সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্।
অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামররাণাং পরা সতী॥

(অযো) ২০।৩৯

—কিন্তু এখন জ্যেষ্ঠা রাজমহিষী হয়েও কনিষ্ঠ সপত্নীদের বহু কর্কশ বাক্য শুনতে বাধ্য হব। কারণ তারা আমার হৃদয় বিদারক আচরণে সর্বদা আনন্দ পায়।

সপত্নীদের মর্মঘাতী কঠোর বাক্য শোনা অপেক্ষা নারীদের অধিকতর দুঃখ আর কি হতে পারে? আমার শোক ও দুঃখ সীমা হীন ও অপ্রকাশ্য। তুই আমার নিকটে আছিস। তথাপি আমি উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়ে আছি। তুই বনে চলে গেলে আমার কি দশা হবে? নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু হবে। (কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে)। পতির আনুকূল্য না পেয়ে আমি অত্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করছি, আমি কৈকেয়ীর পরিচারিকার ন্যায় কিংবা তার চেয়েও হীন হয়ে রয়েছি। (কৈকয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে।।) যে আমার সেবা করে কিংবা আমাকে মেনে চলে, সে কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখলে আমার সঙ্গে কথা বলে না। কৈকেয়ী সর্বদা ক্রোধ প্রকাশ করে কর্কশ বাক্য ব্যবহার করে। আমি এই দুরবস্থায় পড়ে কিরূপে তার মুখের দিকে তাকাব?

কৌশল্যা অতীতকে টেনে রাজপরিবারে তাঁর প্রকৃত অবস্থা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে পুত্রের নিকট ব্যক্ত করলেন।

দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব।
অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্॥
তদক্ষয়ং মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরাৎ।

বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব ॥

(অযো) ২০।৪৫-৪৬

— রাঘব, তোমার উপনয়নের পর সপ্তদশবর্ষ অতীত হল। আমি নিজ দুঃখের অবসান কামনা করে এতদিন অতিবাহিত করলাম। রাঘব, এখন আমি জরাজীর্ণ হয়েছি, আমি অসীম দুঃসহ দুঃখ ও সপত্নীদের দুর্ব্যবহার বেশী দিন সহ্য করতে পারবো না।

আমি তোর পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় মুখ খানা না দেখে কিরূপে দীন ভাবে এই শোচনীয় জীবন ধারণ করব ? আমি হতভাগী, বহু উপবাস বহু দেবার্চনা ও বহু পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কষ্টে তোকে পালিত ও বর্ধিত করেছি। কিন্তু আমার সবই বৃথা হল—বলে তিনি আক্ষেপ করতে থাকেন। কৌশল্যা প্রথমা মহিষী হলেও ব্যবহারে তিনি দুর্যোবাণী।

কৌশল্যার হৃদয়ে যে দুঃখের সাগর এতকাল সুপ্ত ছিল, রামের বনগমনের খবরে সেই দুঃখ যেন উপছে পড়ছে। তিনি এক সুন্দর উপমার সাহায্যে তাঁর দুঃখের বর্ণনা দিয়ে বললেন—

স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্যতে।

প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা ॥

(অযো) ২০।৪৯

—বর্ষাকালে মহানদীর নতুন জল প্রবাহে যেমন তীর বিদীর্ণ হয়, তোর বনবাসের সংবাদে আমার হৃদয় সেইরূপ বিদীর্ণ হচ্ছে না, তাতে মনে হয়, নিশ্চয়ই আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন।

মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে

ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম।

যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি

প্রসহ্য সিংহো রুদতীং মৃগীমিব ॥ (অযো) ২০।৫০

—নিশ্চয়ই আমার মরণ নাই এবং যমালয়ে আমার জন্য অল্প স্থানও নাই। সিংহ যেমন ক্রন্দনরতা হরিণীকে বলপূর্বক নিয়ে যায়, যম

আমাকে সেরূপ বলপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে না কেন ?

নিশ্চয়ই আমার এই হৃদয় লৌহনির্মিত, যেহেতু এত দুঃখেও আমার হৃদয় ভিন্ন হচ্ছে না। ভূপতনে তা বিদীর্ণ হচ্ছে না। এইরূপ কঠোর দুঃখেও যখন দেহের পতন হল না, তখন নিশ্চয়ই মনে হয় অকালে কখনই মৃত্যু হয় না। আমি পুত্রের উদ্দেশ্যে যে সব ব্রত, দান, সংযম ও তপস্যা করেছি, ঊষর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সে সব ক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল হল, এটাই আমার একমাত্র দুঃখ।

কৌশল্যা সারা জীবনের পুঞ্জীভূত দুঃখ যা এতকাল তিনি একাই বহন করেছিলেন, আজ তা সন্তানের সামনে কেবল প্রকাশই করলেন না, তাঁর মনে এ দুঃখের প্রতিক্রিয়া তিনি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করলেন।

যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া
লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং
বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ॥ (আযো) ২০।৫৩

—যদি কেউ অতি দুঃখে ইচ্ছানুসারে অকালে মৃত্যু বরণ করতে পারত তবে আমি আজই পরলোকে চলে যেতাম। তোমার অভাবে আমার অবস্থা বৎস হীনা ধেনুর মত হবে।

এ প্রকার অসহনীয় নির্মম দুঃখে কাতর হয়ে দশরথের প্রধান মহিষী কৌশল্যা সন্তান রামকে বললেন ধেনু যেমন অত্যন্ত দুর্বল হয়েও বৎসের অনুগমন করে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকলেও আমি বনে তোমার অনুগমন করব।

পুত্রের চরম বিপদের কথা শুনে কৌশল্যা এইভাবে শোকবিহ্বল হলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৌশল্যা রামের জন্য শোক করে বলেছেন—

গুণের সাগর পুত্র যাব যায় বনে।
সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন॥
রাজার প্রথম জায়া আমি মহারাণী।

মাতৃবধ করিলে হইবে তব পাপ।
মাতৃবধ পাপে রাম বড় পাবে তাপ॥
পিতৃসত্য পালিবা সে মায়ের মরণে।
কোন পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে॥ (অঃ)

কৌশল্যার অপার আনন্দ নিমেষের মধ্যে বিষাদে পরিণত হলো। কৌশল্যা লোভী ছিলেন না। রাজ্য থেকে তাঁর কাছে রাম অনেক বড়। পিতৃ সত্য পালনের জন্য রাজ্য ত্যাগ করতে তাঁর আপত্তি নেই। রাজ্যের প্রতি এমন ঔদাসীন্য একমাত্র কৌশল্যার মত ধার্মিকের পক্ষেই সম্ভব।

রামও এই মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। পিতৃসত্য রক্ষার জন্য তিনি রাজপদকে তুচ্ছ মনে করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বনগমনও তাঁর কর্তব্য মনে করে তিনি স্থির প্রতিজ্ঞ হলেন।

একমাত্র সন্তানের বনবাসের চিন্তায় শোকাতুরা জননীর হৃদয়ের আর্তি এখানে ফুটে উঠেছে। সন্তানের প্রতি স্বামীর এই অন্যায় আচরণ কোন প্রকারেই পুত্র বৎসলা জননী সহ্য করতে পারছেন না। চিরদুঃখিনী জননী সন্তান শোকে আত্মঘাতী হবার সঙ্কল্প নিলেন।

বাল্মীকি রামায়ণে কৌশল্যার শোকে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ দশরথ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে আচরণ করতে চেয়েছেন (লক্ষ্মণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) তা শুনে শোকার্ত কৌশল্যা রামকে বললেন—বৎস, লক্ষ্মণ যা বলছে, তা শুনেছিস যদি ঐরূপ তোর অভিপ্রেত হয়, তাহলে এখন যা করণীয়, তা কর।

রামের প্রতি অর্থহীন এ চরম দণ্ডদানে কৌশল্যার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। এ জন্য এরূপ স্বামীকে বন্দী, বধ বা হরণ রূপ দণ্ড দিতে কৌশল্যা সায় দিতে ইতঃস্তত করলেন না।

কৌশল্যা আরও বললেন, আমার সপত্নীর অধর্ম বাক্যে আবদ্ধ হয়ে শোকাকুল জননীকে ত্যাগ করে যাওয়া তোর কখনই উচিত নয়।

কৌশল্যার বিলাপের উত্তরে পূর্ব দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে রাম বলেছিলেন, পিতার বাক্য আমার পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। এজন্য নত মস্তকে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। বনবাসী সুপণ্ডিত কণ্ডু ঋষি ধর্মজ্ঞ হয়েও পিতার বাক্য পালনের জন্য গোহত্যা করেছিলেন। আমাদের বংশেই পিতা সগরের আদেশে তাঁর পুত্ররা পৃথিবী খনন করে অদ্ভুত ভাবে বিনষ্ট হয়ে ছিলেন।

জামদগ্ন্যেন রামেণ বেণুকা জননী স্বয়ম।
কৃত্তা পরশুনাঽরণ্যে পিতৃর্বচনকারণাৎ॥ (অযো) ২১।৩৪

—জমদগ্নির পুত্র রাম পিতার আদেশে কুঠার দ্বারা জননী বেণুকাকে বনে ছেদন করেছিলেন।

এঁরা এবং অন্যান্য দেবতুল্য বহু ব্যক্তি বিনা দ্বিধায় পিতার আদেশ পালন করেছিলেন। সুতরাং আমিও পিতার আদেশ পালন করে তাঁর প্রীতি সাধন করব। আমি আপনাকে দুঃখদায়ক কোন অপূর্ব ধর্মের প্রবর্ত্তন করছি না। (নাহং ধর্মপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে।) আমি যা করছি তা পূর্ব মহাপুরুষদের অনুমোদিত ও আচরিত। আমি তাঁদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করছি মাত্র। এই সংসারে যা সকলের কর্তব্য, আমি তাই করছি, বিপরীত কিছু করছি না। পিতৃবাক্য পালন করলে কেউ হীন হয় না।

অতঃপর তিনি লক্ষ্মণকে বুঝিয়ে বললেন, আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় জননী বুঝতে পারেন নি, এইজন্য তাঁর অতুলনীয় গভীর দুঃখ উপস্থিত হয়েছে।

লক্ষ্মণ, এই সংসারে ধর্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্মেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। পিতার আদেশ ধর্মানুমোদিত। প্রতিজ্ঞা করার পর পিতার, মাতার কিংবা ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। আমি পিতার আদেশেই বন গমনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে অনার্য বুদ্ধি ত্যাগ কর, প্রকৃত ধর্মকে আশ্রয় কর এবং উগ্রতা পরিহার কর। আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।

এ ভাবে তিনি লক্ষ্মণের নিকট ধর্মের কুটিলতা সহজ করে দিলেন।

অতঃপর তিনি কৌশল্যা দেবীকে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, দেবী, আমি বনে যাচ্ছি। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি প্রাণের দিব্য দিচ্ছি, আপনি আমার বনগমনের সময়ের করণীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করুন।

তীর্ণপ্রতিজ্ঞশ্চ বনাৎ পুনরেষ্যাম্যহং পুরীম্।
যযাতিরিব রাজর্ষিঃ পুরা হিত্বা পুনর্দিবম্॥ (অযো) ২১।৪৭

—রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গ ভ্রষ্ট হয়েও পুনরায় স্বর্গ লাভ করেছিলেন, তেমনি আমিও প্রতিজ্ঞা পালন করে বন হতে পুনরায় (অযোধ্যা) এই পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করব।

মাতা, আপনি শোক করবেন না। শোক সংবরণ করুন। বনবাসান্তে পুনরায় এখানে ফিরে আসব। আপনার আমার সীতার লক্ষ্মণের ও জননী সুমিত্রার অবশ্যই পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য। এটাই আমাদের সনাতন ধর্ম। আমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন ত্যাগ করুন। হৃদয়েই দুঃখ নিগ্রহ করুন এবং ধর্মানুমোদিত আমার বনবাসে সম্মত হোন।

রামের এইরূপ ধর্মনিষ্ঠ ও সহিষ্ণু উক্তি শুনে কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা লাভ করে রামকে দেখে কৌশল্যা বললেন,

যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহং
গুরুঃ স্বধর্মেণ সুহৃত্তয়া চ।
ন ত্বানুজানামি ন মাং বিহায়
সুদুঃখিতামর্হসি গন্তুমেব॥ (অযো) ২১।৫২

—বৎস, তোমার পিতা যেমন তোমার গুরু, তোমাকে স্নেহের সঙ্গে পালন করেছি বলে আমিও তোমার সেইরূপ গুরু। আমি তোমাকে বনগমনে অনুমতি দিচ্ছি না। আমি অত্যন্ত দুঃখী। আমাকে ত্যাগ করে বনে যাওয়া তোমার উচিত হবে না।

তুমি আমার নিকটে না থাকলে আমার জীবনের কি প্রয়োজন? অন্যান্য স্বজন, দেবতা ও পিতৃগণের পূজা এবং অমৃতেরই বা কি প্রয়োজন? সকল লোকের সান্নিধ্য অপেক্ষা তোমার সান্নিধ্য আমার মঙ্গলের কারণ।

রাম নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ধর্ম আচরণ ন্যায়সঙ্গত বলে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি আরও বললেন কেবল রাজ্যের জন্য তিনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট যশকে অধর্মানুসারে তুচ্ছ করে রাজ্য প্রার্থনা করেন না। রাজ্যের প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নেই। এই বলে জননী কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

রামকে পিতৃবাক্য পালনে কৃত সঙ্কল্প দেখে কৌশল্যা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—যে রাম কখনও সামান্য দুঃখও পায়নি, যে রাম পরম ধার্মিক ও সব লোকের প্রতি প্রিয়ভাষী, সেই রাম কিরূপে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করবে? যে রামের ভৃত্য ও পরিচারকগণ উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করে সেই রাম বনে কি করে ফলমূল ভোজন করবে? রাজার প্রিয় পুত্র রাম নির্বাসিত হচ্ছে এ সংবাদ কে বিশ্বাস করবে?

নূনং তু বলবাঁল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্।
লোকে রামাভিরামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি॥ (অযো) ২৪।৫

—এই সংসারে সর্ব নিয়ন্তা দৈবই বলবান, নতুবা তুমি সংসারে সর্বজনপ্রিয় হইয়াও বনে গমন করছ?

স্থিরচিত্ত রাম বহু দৃষ্টান্ত দিয়ে যুক্তি দেখিয়ে জননীকে শান্ত করলেন। পতি সেবাই স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম—এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাম জননীকে তাঁর সঙ্গে বনে অনুগমন না করে রাজা দশরথের পরিচর্যা করতে অনুরোধ করেন।

শোকাতুরা কৌশল্যা যখন বুঝলেন যে রামকে সঙ্কল্পচ্যুত করা অসম্ভব, তখন বললেন, তোমার কথানুসারেই কাজ হবে।

রাম কৌশল্যাকে দুঃখিত হতে দেখে বললেন, মাতা, রাজা দশরথ সকলের নিয়ন্তা ও অধিপতি। বিশেষতঃ তিনি আপনার পতি

এবং আমার পিতা। সুতরাং উভয়েরই গুরু। অতএব তাঁর আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। আমি অত্যন্ত আনন্দে চতুর্দশ বৎসর মহারণ্যে বাস করে প্রত্যাগমন করে আপনার নির্দেশে চলবো।

কৌশল্যা তা শুনে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, রাম, পিতার ইচ্ছানুসারে যদি তোমার বনগমনই নিশ্চিত হল, তাহলে আমাকে বন্য হরিণীর ন্যায় সঙ্গে নিয়ে চল। আমি এই সব সপত্নীদের মধ্যে বাস করতে পারবো না। এই কথা বলে কৌশল্যা কাঁদতে লাগলেন। রাম নিজ মতে অটল থেকেই তাঁকে নারী ধর্মের ব্যাখ্যা করে বললেন—

অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।
শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা॥
এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ।
অগ্নিকার্য্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ॥ (অযো)
২৪।২৭।২৮

—যে নারী দেবতাকে নমস্কার করে না, দেবপূজা হতেও নিবৃত্ত হতে থাকে, সেই নারী পতির শুশ্রূষার দ্বারাই স্বর্গ লাভ করে। পতির প্রিয় ও হিত সাধনে রত থেকে সর্বদা তাঁর শুশ্রূষা করবে—এটাই বেদাদি শাস্ত্র ও লোকাচার সম্মত স্ত্রীলোকের নিত্য ধর্ম। আপনি আমার মঙ্গলকামী হয়ে অগ্নিহোত্রাদি অনুষ্ঠানে পুষ্পের দ্বারা দেবতার অর্চনা করুন।

আপনি ধার্মিক দশরথের সেবা করুন। তিনি যদি জীবিত থাকেন, তবে আমি ফিরে আসলে আপনি পরম অভীষ্ট লাভ করবেন।

রামের কথা শুনে কৌশল্যা বললেন—

গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক।
বিনিবর্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ।
গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো॥ (অযো)
২৪।৩২।৩৩

—পুত্র, তোমার বনগমনের কঠিন সঙ্কল্প হতে তোমাকে বিরত করতে পারলাম না। এটা হতেই বুঝতে পারছি দুরতিক্রম্য দৈবকে অতিক্রম করা কঠিন। তুমি যাত্রা কর। সর্বদা তোমার মঙ্গল হোক। মহাভাগ্যবান্ তুমি বন হতে ফিরে মধুর সান্ত্বনা বাক্যে আমাকে আনন্দ দিও।

বৎস, এই সংসারে দৈবের গতি চিরকালই অচিন্তনীয়। আমার বাক্য অতিক্রম করে ঐ দেবই তোমাকে বন গমনে প্রেরণা দিচ্ছে।

দুঃখিনী জননীর অসীম দুঃখ ও সন্তান বিরহের সব রকম দুঃখ সহ্য করবার কি অসীম ধৈর্যের পরিচয় এখানে ফুটে উঠেছে। তিনি যেন সন্তানের মঙ্গলের জন্যই পাষাণে বুক বেঁধে সব সহ্য করার জন্য নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে তৈরী করে নিলেন, এবং দৈবের নিকট আত্ম সমর্পণ করলেন।

কুন্তীও পঞ্চপুত্র পুত্রবধূ দ্রৌপদী সহ বনগমনের সময় এমন অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

পুত্রের অভিষেক সংবাদে আনন্দে অধীরা জননী পুত্রের মঙ্গলের জন্য যেমন দেবমন্দিরে পূজা ও হোমে মগ্ন হয়েছিলেন, তেমনি পুত্রের বনগমনে দৃঢ়তা দেখে পুত্রের মঙ্গলার্থে ধার্মিকী মঙ্গলার্থিনী জননী নানাবিধ মঙ্গলাচারণ করে পুত্রকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করে বলেছেন—

যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥ (অযো) ২৫।৩

—হে রাঘব শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রীতির সঙ্গে ও নিয়মানুসারে যে ধর্ম পালন করছ, সেই ধর্ম তোমাকে রক্ষা করুন ও তোমার মঙ্গল করুন।

দেবতারা ও মহর্ষিরা তোমার বনবাসকালে তোমাকে রক্ষা করুন।

বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সব অস্ত্র দিয়েছেন, ঐ সব অস্ত্র তোমাকে রক্ষা করুন।

পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা।
সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ॥ (অযো)
২৫।৬

—পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা ও সত্য নিষ্ঠার দ্বারা রক্ষিত হয়ে তুমি চিরজীবী হও।

বৎস, দেবতারা, মহর্ষিরা যক্ষ, রক্ষ, কাল, দিক পশুপক্ষী, প্রভৃতি সকলেই তোমার কল্যাণ করুন।

এইভাবে আশীর্বাদ করে জননী কৌশল্যা মালা, গন্ধ ও যথাযোগ্য স্তুতির দ্বারা দেবতাদের পূজা করলেন। অতঃপর রামের মঙ্গলের জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের দ্বারা হোম করালেন। উপাধ্যায় রামের মঙ্গল ও রামের শান্তির উদ্দেশ্যে বিধি পূর্বক হোম করে হুতাবশিষ্ট লোক-পালদের দান করলেন। তিনি মধু, দধি, ঘৃত, ও আতপ তণ্ডুল ব্রাহ্মণদের হাতে দিয়ে স্বস্তিবাচন ও রামের মঙ্গল কামনা করলেন।

কৌশল্যা সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণা দান করে রামকে বললেন—

যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে।
বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্॥ (অযো) ২৫।৩২

—বৃত্রাসুরের বিনাশ সময়ে সর্বদেববন্দিত সহস্রলোচন দেবরাজের যেরূপ মঙ্গল হয়েছিল তোমার সেরূপ মঙ্গল হোক।

অমৃত আহরণকারী গরুড়ের উদ্দেশ্যে মাতা বিনতা যে মঙ্গল কামনা করেছিলেন, সেরূপ মঙ্গল তোমার জন্য কামনা করি। অমৃত প্রাপ্তি সময়ে দৈত্যগণহন্তা বজ্রধর ইন্দ্রের উদ্দেশে অদিতি যেমন মঙ্গল প্রদান করেছিলেন সেইরূপ মঙ্গল তোমার হোক। ত্রিপদ দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণকারী অতি পরাক্রমশালী বামন রূপী বিষ্ণুর যে মঙ্গল হয়েছিল, (ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ) তোমার সেইরূপ মঙ্গল হোক।

ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ।

মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম ॥ (অযো) ২৫।৩৬

—ঋষিরা, সমুদ্র সমূহ, দ্বীপগুলি, বেদ সমূহ, লোকগণ দিক্ সমূহ তোমার মঙ্গল করুক।

মঙ্গলার্থী মাতৃ হৃদয়ের কি সুন্দর অভিব্যক্তি। সন্তানের মঙ্গলের জন্য সকলের কাছে তাঁর হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা জানালেন।

অতঃপর জননী কৌশল্যা রামকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করে বললেন—তুমি সুখে গমন কর (গচ্ছ রাম যথাসুখম্) তোমার অভিলাষ পূর্ণ হোক। তুমি সুস্থ দেহে সব কাজ সম্পন্ন করে পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে আসবে এবং রাজকার্যে মনোযোগ দেবে। তখন আমি তোমাকে দেখে সুখ পাবো।

এমন অবিচলিত কণ্ঠে গহন বনে চৌদ্দ বছরের জন্য ভবিতব্যের হাতে পুত্রকে এমনভাবে সমর্পণ করা সাধারণ জননীর পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র কৌশল্যার মত ধর্মপ্রাণা সতী সাধ্বী জননীর পক্ষেই এরূপ দৃঢ় আত্মসমর্পণ সম্ভব হয়েছিল।

তিনি রামকে আরও বললেন—

ময়ার্চিত দেবগণাঃ শিবাদয়ো
মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিরায় তে
হিতানি কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব ॥ (অযো) ২৫।৪৫

—আমি শিব প্রভৃতি দেবতা, দিক মহর্ষি, ভূত ও দেবতাদের অর্চনা করেছি। তোমার দীর্ঘকাল যাবৎ বনবাস সময়ে তাঁরা হিত কামনা করুন।

অর্থাৎ আজীবন তিনি যে সব দেবতাদের পূজা অর্চনা করেছেন, তাঁরা সর্বতোভাবে রামের মঙ্গল করবেন।

কৌশল্যা সাশ্রুনয়নে রামের স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান যথানিয়মে সম্পন্ন করলেন। রাম জননীকে প্রণাম করলেন। অতঃপর রাম সীতার গৃহাভিমুখে চললেন।

কৌশল্যা যে কত ধর্মপ্রাণা মহিলা ছিলেন, তাঁর নানারূপ পূজার্চনাদি হতে তা প্রমাণিত হচ্ছে।

রামের সঙ্গে সীতার বনানুগমনের প্রাক্কালে তিনি বধূর মস্তক আঘ্রাণ করে আশীর্বাদ করে বললেন :—

অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন সততং সংকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ।
ভর্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ॥ (অযো)
৩৯।২০

—পতির দ্বারা সর্বদা সম্মানিত হয়েও যে সব স্ত্রী বিপদের সময় পতির সমাদর করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে সেই সব স্ত্রী সর্বত্র অসতী।

স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্।
তব দেবসমস্তেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা॥ (অযো) ৩৯।২৫

—আমার পুত্র বনে গমন করেছে, ধনী হোক নির্ধনই হোক তুমি তাকে দেবতা বলে মনে করো। কখনও অবজ্ঞা করো না।

স্বামী ধনী বা দরিদ্র যাই হোক্ না কেন স্বামী সেবা করাই স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য। রাজনন্দিনী রাজবধূ কর্পদক শূন্য স্বামীকে কোন প্রকারে তাচ্ছিল্য যেন না করেন এজন্য শ্বশ্রূমাতার বধূর উদ্দেশ্যে কি সুন্দর হিতোপদেশ।

বুদ্ধিমতী রমণী কৌশল্যা। সেজন্য বধূর মন যাতে কোন প্রকারে স্বামীর প্রতি বিরূপ না হয়—পূর্বাহ্নেই তার জন্য সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে রাণী কৌশল্যার অসীম অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপদেশের মধ্যে।

কেবল স্বামীর প্রতি কর্তব্য নয়। বধূর আচরণ ব্যবহার যেন এমন শালীন হয় যা দেখে অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করবে :

স্বামী সেবা সতত করিবে রাত্রি দিনে।
রাজ বহুরাণী তুমি রাজার কুমারী।
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী॥ (অঃ)

রাজবধূ একা বনে যাচ্ছেন। সেইখানে তাঁর আচরণ সংশোধন করবার জন্য শ্বশ্রূমাতা নিকটে থাকবেন না। তাই যাত্রার প্রাক্কালে তিনি সীতাকে রাজবধূর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিচ্ছেন।

জননী যেমন কন্যাকে সতর্ক করে দিয়ে থাকেন এখানে কৌশল্যাও তেমনি ভাবেই সস্নেহে বধূর কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

অনুরূপ কুন্তীও বন গমনের প্রাক্কালে দ্রৌপদীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ—

বৎসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
স্ত্রীধর্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা॥ ইত্যাদি

(সঃ) ৭৯।৪

—বৎসে, এই চরম দুঃখে পড়েও তুমি শোক কর না। তুমি স্ত্রী ধর্মে অভিজ্ঞা, চরিত্রে ও আচারে প্রতিষ্ঠিতা। স্বামীদের প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হয়, তা তোমাকে বলতে হবে না। তুমি সাধ্বী ও গুণবতী, পিতৃকুল ও শ্বশুর কুল তোমার দ্বারা গৌরবান্বিত হয়েছে। তুমি যে কুরুকুলকে দগ্ধ করনি, এটাই তাদের সৌভাগ্য। তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক্—আমি সর্বদা এই প্রার্থনা করি। সাধ্বী স্ত্রীরা ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয় না। তোমার মহান ধর্মই তোমাকে রক্ষা করবে ও শীঘ্রই শ্রেয়ঃ লাভ করাবে।

কৌশল্যা বলছেন ঃ—

সতর্ক থাকিহ রাম মুনির আশ্রমে॥
জানকীর রূপে চমৎকৃত ত্রিভুবনে।
সাবধান হইও রাম ভয়ানক বনে॥ (অঃ)

এত দুঃখেও কৌশল্যা ভুলেননি যে অরণ্যে পদে পদে সীতার মত রূপসীর বিপদের আশঙ্কা আছে। সেই বিষয়ে রামকে তিনি সতর্ক করে দিতে ভুলেননি। এ রকম হুঁশিয়ারীর মধ্যে তাঁর দূরদৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়।

উত্তরে সীতা শ্বশ্রূ মাতাকে বললেন—আপনি আমাকে যে সব

আদেশ করলেন, আমি তার সমস্তই পালন করব। পতির প্রতি যাতে উত্তম ব্যবহার করা যায় তেমন শিক্ষাই আমি পেয়েছি। আপনি আমাকে অনার্য নারীর সঙ্গে তুলনা করবেনা। (সীতা চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীনা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।
নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা॥

(অযো) ৩৯।২৯

—যেমন তন্ত্রীহীন বীণা বাজে না, যেমন চক্র বিহীন রথ চলে না, তেমনি পতিবিহীনা রমনী শত পুত্রের জননী হলেও সুখ লাভ করে না।

আমি গুরুজনদের নিকট পতিব্রতাদের সামান্য ও বিশেষ ধর্মের কথা শুনেছি। পতিই নারীদের দেবতা—এটা আমি জানি। সুতরাং আমি কি পতির অবমাননা করতে পারি?

রামের বনবাসে যাবার কালে কৌশল্যা রামের রথের দিকে ছুটে 'হা রাম' 'হা সীতে' 'হা লক্ষ্মণ' বলে কাঁদতে কাঁদতে পাগলের মত ছুটতে থাকেন। সমস্ত দেবতার হাতে পুত্রের কল্যাণ ভার ন্যস্ত করেও পুত্র বৎসলা জননী স্থির থাকতে পারলেন না। এ জন্যই শাস্ত্রকারেরা বলেন জননী হলেন ঈশ্বরী দেবী।

রাম বনে চলে গেলে পর পুত্র শোকাতুর রাজা দশরথ কৌশল্যার নিকট এসে বললেন, দেবি, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার দৃষ্টি শক্তি রামের সঙ্গে গেছে। শয্যার উপর বসে দশরথ এই ভাবে রামের জন্য শোক করতে থাকেন। দশরথের এরূপ অবস্থা দেখে কৌশল্যা অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তাঁর সন্নিকটে বসে দুঃখে শোকে কাতরভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

পুত্র শোকাতুরা কৌশল্যা অতিশয় আক্ষেপ করে শয্যাশায়ী রাজা দশরথের নিকট এসে বহুকালের দুঃখের ও লাঞ্ছনার কথা বললেন। এদিন নির্ভয়ে ছিলেন। রামের অবর্তমানে কৈকেয়ীর হাতে তাঁর নতুন

লাঞ্ছনার আশঙ্কার কথা বলতে গিয়ে রাণী কৌশল্যা বললেন, কুটিল স্বভাবা কৈকেয়ী তার অন্তরের বিষ রামের প্রতি উজার করে নির্মোক মুক্তা নাগিনীর মত বিচরণ করবে। সৌভাগ্যবতী স্বার্থপরের মত আপন কার্য সিদ্ধ করে রামকে নির্বাসিত করে তার মনোবাসনা পূর্ণ করেছে। এখন সে গৃহস্থিত দুষ্ট সাপের ন্যায় আমাকে সর্বদা ভয় দেখাবে। এই অযোধ্যায় রামকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে।, কৈকেয়ী যদি বর চাইত যে রাম তার দাস হবে, তবে আমি তা অনু-মোদন করতাম। অগ্নিহোত্রকারী যাজ্ঞিক ব্যক্তি পর্ব দিনে রাক্ষস-দের প্রাপ্য অংশ যেমন নিক্ষেপ করেন, কৈকেয়ী স্বেচ্ছায় রামকে স্থান চ্যুত করে অরণ্যে নিক্ষেপ করল।

গজতুল্য ধীরগামী মহাধনুর্ধারী রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বনে প্রবেশ করেছে। বনবাসের দুঃখ তাদের কোন দিনই ভোগ করতে হয়নি। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় তুমি তাদের বনবাসে পাঠালে, এখন তাদের কি দুর্দশা হবে? তারা তরুণ বয়সের অথচ তাদের সঙ্গে বস্ত্র প্রভৃতি কিছুই নেই। জীবের ভোগের সময়ই তুমি তাদের নির্বাসিত করলে। ফলমূল আহার করে কি ভাবে তারা কাল যাপন করবে? আমার জীবনে কি কখনো সেই সুসময় আসবে যখন আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে পুনঃ দেখতে পাবো? রাম ও লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনে অযোধ্যা নগরীর সকলেই পুনঃ আনন্দ চঞ্চল হবে,। এমন সুসময় কখনো আসবে?

কদা পরিণতো বুদ্ধ্যা বয়সা চামরপ্রভঃ।
অভ্যুপৈষ্যতি ধর্মাত্মা সুবর্ষ ইব লালয়ন্॥ (অযো) ৪৩।১৬

—সুবৃষ্টি যেমন তাপিত ব্যক্তিকে শান্তি দান করে, তেমনি পরিণত বুদ্ধি দেবকান্তি ধর্মাত্মা রাম আমার শান্তির জন্য আসবে?

কৌশল্যা তাঁর এরূপ দুঃখের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে পিছনের জীবনের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে পূর্বে আমি কুৎসিত স্বভাব সম্পন্ন ছিলাম। এ পাপে রামের প্রতি প্রবল

বাৎসল্য থাকা সত্ত্বেও আমি রামকে হারালাম। তিনি নিজেকে বৎস হীন গাভীর সঙ্গে তুলনা করলেন।

সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।

কৈকয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ॥ (অযো) ৪৩।১৮

—সিংহ যেমন বৎস অপহরণ করে ধেনুকে বৎসহীন করে দেয়, কৈকেয়ীও তেমনি বলপূর্বক আমাকে পুত্রহীন করেছে।

সর্বগুণান্বিত আমার একমাত্র পুত্র রাম বিহীন এ জীবন ধারণ করতে আমি চাই না। রাম ও লক্ষ্মণ হীন জীবন আমি চাই না।

অযং হি মাং দীপয়তে সমুত্থিত—

স্তনূজশোকপ্রভবো হুতাশনঃ।

মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো

যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ॥ (অযো) ৪৩।২১

—গ্রীষ্মকালে তেজস্বী সূর্য যেমন প্রখর কিরণের দ্বারা এই পৃথিবীকে দগ্ধ করে। পুত্রশোকজাত অগ্নি আমাকে আজ সেই ভাবে দগ্ধ করছে।

কৌশল্যার উপরোক্ত বিলাপ পুত্রবৎসল জননীর অন্তরের করুণ ব্যথার অভিব্যক্তি। সপত্নীর এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ তিনি মার্জিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কোন রূপ রূঢ় কটু ভাষা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেননি। দুঃখিনী হলেও কৌশল্যা অতিশয় সংযমী।

কৌশল্যার বিলাপ শুনে লক্ষ্মণ জননী সুমিত্রা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। (সুমিত্রা চরিত্র দ্রষ্টব্য)। শরৎকালের অল্প জল সমন্বিত মেঘ যেমন বায়ুর দ্বারা দূরে চালিত হয়। সুমিত্রা দেবীর সান্ত্বনা বাক্যে কৌশল্যার পুত্রশোক কিছু প্রশমিত হল।

কৌশল্যা শোকাভিভূত কিন্তু কর্তব্যচ্যুত নন।

সুমন্ত্র রাম ও তাঁর অনুগামীদের বনে রেখে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁদের সংবাদ শুনে পুরবাসীরা বিলাপ করতে থাকে। রাজা দশরথকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ভূতলে পড়ে থাকতে দেখে অন্তঃপুরে

রোদনের রোল উঠল।

সুমিত্রার সহায়তায় কৌশল্যা দশরথকে শয্যায় বসালেন এবং বললেন, রাজা, রামের দূত রূপে সুমন্ত্র বন হতে প্রত্যাবর্তন করেছে। তুমি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করছ না কেন ?

কৌশল্যা বক্রভাবে দশরথকে বললেন ঃ—

অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব।
উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেঽস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা॥
দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্।
নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্॥ (অঃ)

৫৭।৩০-৩১

—অন্যায় কাজ করে তুমি কি আজ লজ্জিত হয়েছো ? উঠ, তোমার সত্য পালনের জন্য পুণ্য হোক, তুমি শোক করলে তোমার সহায়ক পরিজনবর্গও বিনষ্ট হবে। যার ভয়ে তুমি সারথি সুমন্ত্রকে রামের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে না সেই কৈকেয়ী এখানে নেই। তুমি নিশ্চিন্তে কথা বল।

শোকাকুল কৌশল্যা এরূপ বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। কৌশল্যাকে মূর্ছিত হতে দেখে ও দশরথকে মূর্ছিত অবস্থায় দেখে উপস্থিত মহিলারা কাঁদতে লাগল। সংজ্ঞা লাভ করে দশরথ সুমন্ত্রকে বনবাসী পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি সবিস্তারে সব জানালে শোকার্ত দশরথ বললেন, কৌশল্যা, আমি রামহীন হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না। আমি রামের সঙ্গে লক্ষ্মণকে দেখতে ইচ্ছা করেও দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে বিলাপ করতে করতে তিনি পুনরায় মূর্ছিত হলেন। কৌশল্যা মহারাজার ঐ করুণ বিলাপ শুনে স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা করে অত্যন্ত ভীত হলেন।

এদিকে কৌশল্যাও কম্পিত দেহে পুনঃ পুনঃ সংজ্ঞাহীন হয়ে সুমন্ত্রকে বললেন, সুমন্ত্র, যেখানে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা আছে, আমাকে সেইখানে নিয়ে চল। আমি তাদের অভাবে ক্ষণকালও বাঁচতে চাই

না। তুমি শীগ্‌গির রথ ফিরিয়ে নাও। আমাকেও দণ্ডকারণ্যে নিয়ে চল। যদি আমি তাদের অনুগামী না হতে পারি, তবে মরণ পণ করছি।

কৌশল্যার বিলাপ হতে বোঝা যায়, তাঁর পুত্রশোক কত গভীর। রামের বনগমনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যেন বুকে পাষাণ বেঁধে স্বীয় কর্তব্য করেছেন কিন্তু তাঁদের বনগমনের পর মুহূর্ত হতেই তিনি দুঃখ শোক বেদনায় মোহ্যমান। তাঁর এতটা অধীর হওয়ার কারণ তিনি স্বামীর থেকে উপযুক্ত সমাদর পাননি। কেবল রামের আশায় বুক বেধে ছিলেন। রামই তাঁর ভরসা ছিল।

সুমন্ত্র তাঁকে নানা ভাবে যুক্তি দিয়ে আশ্বাস দিলেও, কৌশল্যা হা প্রিয় পুত্র, হা রাম, বলে বিলাপ করতে থাকেন। এবং স্বামীকে কটাক্ষ করে বললেন, তুমি দয়ালু, দানশীল, প্রিয়বাদী ও রঘুকুলভূষণ —এজন্য ত্রিলোকে তোমার যশ বিস্তৃত। যে পুত্রদ্বয় সুখে লালিত পালিত সীতার সঙ্গে তুমি তাদের দুঃখ দিলে। তারা কিরূপে এ দুঃখ সহ্য করবে? সীতা কোমলাঙ্গী ও সর্বদা সুখ ভোগ করেছে, এই তরুণ বয়সে সে কিরূপে শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করবে?

এইভাবে কৌশল্যা সুখী পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূর বর্তমানে অরণ্যে চরম দুর্দশার উল্লেখ করে বললেন, আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রের ন্যায় কঠোর নতুবা রাম বিহনে এখনও তা বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন?

পুনরায় কৌশল্যা দশরথকে অনুযোগ করে বলেছেন কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই তুমি যে কাজ করেছ, তার ফলে সুখ ভোগের প্রকৃত অধিকারী আমার প্রিয়জনই বিতাড়িত হয়ে অরণ্যে ভ্রমণ করছে।

কৌশল্যা দুঃখে ক্ষোভে কটূক্তি করলেও স্বামীর প্রতি তাঁর সমবেদনা ক্ষীণ হয়নি। তাই তিনি স্বামীর ভয়ের হেতু কি তা উপলব্ধি করেই তাঁকে নির্ভয়ে তাঁর অভিলষিত নানা প্রশ্ন সুমন্ত্রকে জিজ্ঞেস করতে বললেন।

যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাঘবঃ পুনরেষ্যতি।

জহ্যাদ্ রাজ্যঞ্চ কোশঞ্চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে ॥ (অযো) ৬১।১১

—যদি রাম পনের বছরে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে। তখন ভরত যে রাজ্য ও ধন ভাণ্ডার ছেড়ে দেবে—তা মনে হয় না।

তাঁর এরূপ আশঙ্কার যৌক্তিকতা দেখিয়ে তিনি বললেন, শ্রাদ্ধের সময় যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে নিজ বান্ধবকে ভোজন করিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে এবং পরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে চায়, তাহলে তখন দেবতুল্য বিদ্বান গুণবান ব্রাহ্মণরা সুধাভক্ষণেও অভিলাষী হয় না।

ব্রাহ্মণেষ্বপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ ॥ (অযো) ৬১।১৪

—বৃষ যেমন নিজ শৃঙ্গ ছেদনে সম্মত হয় না, তেমনি জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদের ভোজ্যাবশিষ্ট অন্ন ভোজনে সম্মত হয় না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামই বা কি প্রকারে কনিষ্ঠের উপভুক্ত রাজ্য গ্রহণে সম্মত হবে?

এ ধরণের নানা প্রশ্ন ও আশঙ্কা তাঁর মনে উঁকি দিচ্ছিল, এবং রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ছবি তাঁর মনে বা চোখে পড়ল না।

নৈবংবিধমসৎকারং রাঘবো মর্ষয়িষ্যতি।
বলবানিব শার্দূলো বালধেরভিমর্শনম্ ॥ (অযো) ৬১।১৯

—কেউ লেজ স্পর্শ করলে বলবান ব্যাঘ্র তা সহ্য করে না, তেমন রামও এইরূপ অপমান সহ্য করবে না।

মহাযুদ্ধে দেবতা, অসুর প্রভৃতি মিলিত হয়েও রামের ভীতি উৎপাদন করতে পারে না। কিন্তু রাম ধর্মপরায়ণ। সে সব লোককে অধর্ম হতে ধর্ম পথে চালিত করে থাকে। সুতরাং সে কিরূপে অধর্ম করবে। রাম মহাবাহু ও মহাবীর।

স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ।
স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা ॥ (অযো) ৬১।২২

—মৎস্য যেমন নিজ সন্তানকে নিহত করে, তেমনি সিংহের ন্যায়

বলবান বৃষনেত্র নরশ্রেষ্ঠ রাম পিতা কর্তৃক নিহত হয়েছে।

যদি ধর্মপালনরত পুত্রকে নির্বাসিত করে ঋষিদের দ্বারা নির্দিষ্ট দ্বিজাতিদের আচরিত ধর্ম পালন করছো মনে কর, তাতে আমি সর্ব প্রকারেই নষ্ট হবো।

অন্যত্র তিনি মহারাজ দশরথকে বলেছেন—

গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।

তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে॥ (অযো) ৬১.২৪

—স্ত্রীর প্রথম গতি স্বামী, দ্বিতীয় গতি পুত্র, তৃতীয় গতি জ্ঞাতিগণ, চতুর্থ গতি হয় না। তুমি আমার প্রথম গতি হলেও সপত্নীর বশীভূত হওয়ায় আমার নও। আমার দ্বিতীয় গতি রামকে নির্বাসিত করেছ। এই ভাবে তুমি আমাকেও সর্বতোভাবে নষ্ট করেছ।

এই কাজ করে তুমি একমাত্র কৈকেয়ী ও তার পুত্র ভরত ব্যতীত অন্য সকলকেই বিনষ্ট করেছো।

শোকার্ত দশরথ অনুতপ্ত হয়ে বললেন, কৌশল্যা, তুমি অন্যের প্রতিও সর্বদা স্নেহ প্রকাশ করে থাকো, কখনও নির্দয় ব্যবহার কর না। স্বামী নির্গুণ হোক, বা গুণবান হোক, ধার্মিক নারীদের নিকট তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা। তুমি সর্বদা ধর্মপরায়ণা। সংসারে কোন বিষয়টি হেয় বা কোনটি উত্তম তা তুমি জান। অতএব তুমি দুঃখে পড়ে আমাকে এমন অপ্রিয় কথা বলতে পারো না, যেহেতু আমি অতি দুঃখী।

দশরথ এই কথা বললে রোরুদ্যমানা কৌশল্যা মহারাজের দুটো হাত নিজ মাথায় রেখে ভীত ভাবে সসম্ভ্রমে বললেন, আমি ভূলুণ্ঠিত হয়ে তোমার পা ছুঁয়ে প্রার্থনা করছি—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে, আমি বিনষ্ট হব। কারণ আমার কাছে তোমার ক্ষমা প্রার্থনা উচিত না। এই সংসারে সেই স্ত্রী কখনও কুলস্ত্রী হয় না ইহলোক ও পরলোকের গৌরব-জনক পতি যাকে এই ভাবে অনুনয় ও প্রসন্ন করতে হয়। রাজা

আমি ধর্মের স্বরূপ জানি এবং তোমাকেও সত্যবাদী জানি। কিন্তু পুত্রশোকে অতিশয় বিহ্বলা হয়েই আমি তোমাকে অপ্রিয় কথা বলছি।

পুত্রশোকে ধৈর্যহীন কৌশল্যা সব গুণে গুণান্বিতা পরম সতীসাধ্বী স্ত্রী হলেও শোকে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি প্রিয় অপ্রিয় বোধ হারা হয়ে ছিলেন। তাঁর সম্বিত ফিরে আসলে তিনি স্বামীকে রূঢ় কথা বলেছেন বলে অনুতপ্ত হয়ে আত্মদোষ স্খালনের জন্য বললেন—

শোকো নাশয়তে ধৈর্য্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্।
শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ॥

(অযো) ৬২।১৫

—শোকে ধৈর্য, শাস্ত্র জ্ঞান সমস্তই নষ্ট হয়। শোক সব কিছু নষ্ট করে। শোকের তুল্য এমন শত্রু নেই। রামের বনগমনের পর পাঁচটি রজনী যেন তাঁর কাছে পাঁচটি বছরের মত দীর্ঘ মনে হয়েছিল।

শত্রুর প্রহার সহ্য করা যায়, কিন্তু শোক অতি সামান্য হলেও কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

ত্বং হি চিন্তয়মানায়াঃ শোকোঽয়ং হৃদি বর্ধতে।
নদীনামিব বেগেন সমুদ্র সলিলং মহৎ॥ (অযো) ৬২।১৮

—যেমন নদীগুলির বেগের দ্বারা সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পায়। তেমনি রামের চিন্তায় আমার হৃদয়ে শোক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই ভাবে কৌশল্যা মহারাজা দশরথের দুঃখ প্রশমনের কথা বলতে লাগলেন। ক্রমে সূর্যের তেজ ক্ষীণ হওয়ায় দিবসান্তে রজনী উপস্থিত হলো। কৌশল্যার কথায় আশ্বস্ত ও রামের শোকে কাতর হয়ে দশরথ নিদ্রামগ্ন হলেন।

অল্পক্ষণ পরেই দশরথ জেগে উঠলেন। রাহু নামে অসুর যেভাবে সূর্যকে আক্রমণ করে, রাম-লক্ষ্মণের নির্বাসনের শোক সেই ভাবে দশরথকে আক্রমণ করে। রামের নির্বাসনের পর ষষ্ঠ দিবসে অর্ধরাত্রিতে রাজা দশরথ পূর্বকৃত দুষ্কর্ম স্মরণ করে তা কৌশল্যার কাছে ধীরে

ধীরে প্রকাশ করলেন—

যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাঽশুভম্।

তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্মনঃ॥ (অযো) ৬৩।৬

—কল্যাণি, মানুষ শুভ বা অশুভ যে কাজই করবে, শুভাশুভকর্তা সেই মানব নিজ কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করবে।

যে লোক কাজ আরম্ভ করার সময় কাজের লঘুত্ব গুরুত্ব কিংবা দোষ গুণ বিচারের দ্বারা অবগত হয় না, তাকে বালক বলা হয়। যদি কেউ পলাশ পুষ্প দেখে ঐ পুষ্পজাত ফলের জন্য লোভ প্রকাশ করে এবং আম্রবন ধ্বংস করে পলাশ মূলে জল দেয়, তাহলে ফল লাভের সময় অবশ্যই তাকে দুঃখ পেতে হবে। যে ব্যক্তি ফলের কথা না ভেবে কাজ করে, সে পলাশ সেচনকারীর মত ফল লাভ কালে অবশ্যই শোকগ্রস্ত হবে।

সোঽহমাম্রবনং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ ন্যষেচয়ম্।

রামং ফলাগমে ত্যক্ত্বা পশ্চাচ্ছোচামি দুর্মতিঃ॥ (অযো) ৬৩।১০

—কর্মফল বিচার না করে দুর্মতি আমি আম্রবন কাটতে গিয়ে পলাশ বৃক্ষে জল সেচন করেছি। রামকে ত্যাগ করে ফললাভের সময় পরে আমাকে অনুতাপ করতে হচ্ছে।

উপরোক্ত উপমা দিয়ে দশরথ নিজের বুকের বেদনা ব্যক্ত করলেন। তিনি কৌশল্যার নিকট তাঁর বিগত জীবনের দরজা খুলে দিয়ে বললেন,—আমি কুমার অবস্থায় ধনুর্ধারী ও শব্দবেধী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলাম। ঐ শব্দবেধীর অহমিকার জন্যই আমি সেই পাপ করেছিলাম।

তদিদং মেঽনুসংপ্রাপ্তং দেবি দুঃখং স্বয়ংকৃতম্।

সম্মোহাদিহ বালেন যথা স্যাদ্ভক্ষিতং বিষম্॥ (অযো) ৬২।১২

—মোহবশতঃ বালক যেমন বিষ ভক্ষণ করে, তেমনি আমি মোহ-বশতঃ পাপ করেছিলাম। আমার দুষ্কর্মের ফল স্বরূপ এখন এই দুঃখ পাচ্ছি।

সাধারণ লোক যেমন পলাশ পুষ্পেই আকৃষ্ট হয়, ফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, আমিও তেমনি শব্দবেধী হওয়ায় ফলের প্রতি লক্ষ্য না করে তাতে অনুরক্ত হয়েছিলাম। তোমার তখনও বিয়ে হয় নি। আমি যুবরাজ ছিলাম। সেই সময় বর্ষাকালে ব্যায়াম অনুশীলনের সঙ্কল্প নিয়ে ধনুর্বাণ নিয়ে রথে চড়ে আমি সরযূ নদীতে গেলাম। আমি রাত্রিতে নদীর ঘাটে জল পানার্থে সমাগত মহিষ, হস্তী, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বধ করতে ইচ্ছা করলাম। গভীর অন্ধকারে নিকটস্থ কলস পূর্তির শব্দকে নদীগমনকারী হস্তীর শব্দ ভ্রমে সেই হস্তীকে বধ করার উদ্দেশ্যে তূণীর হতে বিষধর সর্পের ন্যায় শর তুলে শব্দ লক্ষ্য করে সেই দিকে শর নিক্ষেপ করলাম। আমি যে দিকে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলাম, সেই স্থান হতে কোন এক বনবাসীর 'হা' 'হা' শব্দ শুনতে পেলাম। আমার তীক্ষ্ণ বাণে তার বুক বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে জলে পতনোন্মুখ হয়ে ভূলুণ্ঠিত হল। সে হাহাকার বোল হতে এক মনুষ্য কণ্ঠ স্পষ্ট হলো।

আমাদের মত তপস্বীর উপর কি প্রকারে অস্ত্রাঘাত হল? আমি রাত্রিশেষে নির্জন নদীতে জল নেবার জন্য এসেছি। কে আমাকে বাণাহত করলে? আমি কার অপকার করেছি? আমি ঋষি, বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করি। কাউকে দণ্ড দিই না। আমার মত জটাধারী, বল্কল ও মৃগচর্ম পরিধানকারী ব্যক্তিকে অস্ত্রের দ্বারা বধ করা কিরূপে সঙ্গত? আমাকে বধ করে কার উপকার হবে? আমি তার কি অপকার করেছি? যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে তার কোন ফল হবে না বরং অনর্থই হবে। আমার প্রাণ নাশের জন্য আমি দুঃখিত নই। কিন্তু আমার মৃত্যুতে আমার পিতামাতার জন্যই দুঃখিত। আমি বৃদ্ধ মাতাপিতাকে চিরকাল প্রতিপালন করে আসছি। আমার মৃত্যুতে আমার মাতা পিতা কিভাবে জীবন ধারণ করবেন? হায়, আমার বৃদ্ধ মাতা পিতা ও আমি একটি বাণের দ্বারা নিহত হলাম।

দশরথ কৌশল্যাকে বললেন—আমি সর্বদা ধর্মপরায়ণ। সুতরাং ঐরূপ করুণ বাক্য শুনে অতিশয় দুঃখিত হলাম। আমার হাত হতে ধনুর্বাণ পড়ে গেল। সেই রাত্রে ক্রন্দনরত ঋষির করুণ কাহিনী শুনে আমি শোকাবেগে বিহ্বল ও বিচার বুদ্ধিহীন হলাম। পরে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে সেই স্থানে গেলাম। সরযূ তীরে আমার বাণে আহত তাপস বালককে দেখতে পেলাম। তাঁর জটাভার বিক্ষিপ্ত, জলকুম্ভ হস্তচ্যুত ধূলি ও শোণিত ধারায় সর্ব শরীর পরিব্যাপ্ত হয়েছে। অস্ত্রবিদ্ধ হয়ে তিনি ভূতলে শায়িত আছেন। তাঁকে দেখে আমি ভীত ও ব্যাকুল হলাম। তিনি আমাকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, রাজন, আমি বনে বাস করছি। এই অবস্থায় আমি আপনার কি অপকার করেছি? আমি মাতা পিতার জন্য জল আহরণে এসেছিলাম। আপনি আমাকে বাণের দ্বারা আঘাত করলেন এবং একটি বাণের আঘাতে আমাকে ও আমার মাতা পিতাকে নিহত করলেন। তাঁরা উভয়েই অন্ধ, দুর্বল এবং তৃষ্ণাতুর হয়ে আমার প্রতীক্ষা করছেন। তাঁরা আমার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় অতি কষ্টে তৃষ্ণার জ্বালা সহ্য করে আছেন।

ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা ॥
পিতা যন্মাং ন জানীতে শায়ানং পতিতং ভুবি।

(অযো) ৬৩।৪১-৪২

—আমি মনে করি যে আমার তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের কোন ফলই নেই। কারণ আমি ভূলুণ্ঠিত হয়ে রয়েছি, এটা পিতা জানতে পারছেন না।

আর জানতে পারলেই বা তিনি কি করবেন। তিনি স্বয়ং বার্দ্ধক্যের জন্য অশক্ত এবং অন্ধত্বের জন্য চলাফেরায় অসমর্থ।

ভিদ্যমানমিবাশক্তস্ত্রাতুমন্যো নগো নগম্।
পিতৃস্ত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষু রাঘব ॥
ন ত্বামনুদহেৎ ক্রুদ্ধো বনমগ্নিরিবৈধিতঃ।

ইয়মেকপদী রাজন্ যতো মে পিতুরাশ্রমঃ ॥

(অযো) ৬৩।৪৩-৪৪

—একটি বৃক্ষ বিদীর্ণ হলে যেমন অন্য বৃক্ষ তাকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়, আমার পিতাও আমাকে রক্ষা করতে অসমর্থ। রাঘব, বায়ু চালিত অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে, আমার পিতার ক্রোধ আপনাকে দগ্ধ করবার পূর্বেই আপনি আমার পিতার নিকট সত্বর গিয়ে এই সংবাদ দিন।

এই সংকীর্ণ পথ দিয়ে আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়। আপনি তার সমীপে গিয়ে তাকে প্রসন্ন করুন।—যাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে অভিশাপ না দেন। আপনি আমার বুক হতে এই বাণ উচ্ছেদ করে আমাকে শল্য হীন করুন।

কৌশল্যা, তপস্বীর এই সব কথা শুনে বাণের বিষয় আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে যদিও এই শল্য তাঁর পক্ষে খুবই যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু এইটি উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে ইনি প্রাণ ত্যাগ করবেন। আমি চিন্তা ও দ্বিধাগ্রস্ত তাপস বালক তা লক্ষ্য করলেন। এবং আমার ঐ অবস্থা দেখে তিনি অতি কষ্টে বললেন—আমি স্থির চিত্ত হচ্ছি। আপনি ব্রহ্মহত্যারূপ দুঃখ হৃদয় হতে দূর করুন। (ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদযাদপনীয়তাম্) আমি দ্বিজাতি নই। আপনার মনে ব্রহ্মহত্যার আশঙ্কা যেন না হয়। আমি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মেছি। মুনি কুমার ঐরূপ বললে, আমি অতি কষ্টে তার বুক থেকে শল্য উদ্ধার করলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

দশরথ বললেন, ব্যথিত চিত্তে জলপূর্ণ ঘটটি নিয়ে আশ্রমে গেলাম। সেখানে বৃদ্ধ উত্থানশক্তি হীন অন্ধ দম্পতীকে দেখলাম। এঁরাই ঐ মুনি কুমারের মাতা পিতা। আমার পায়ের শব্দ শুনে ঐ অন্ধমুনি বললেন, বৎস, তুমি এত বিলম্ব করলে কেন? শীঘ্র জল আনো। তোমার মাতা যাঁর জন্য তুমি জল আনতে গিয়ে জল

ক্রীড়া করছিলে, তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। তুমি শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ কর। পুত্র, তুমিও তপস্বী। তোমার মাতা কিংবা আমি যদি তোমার কোনরূপ অপ্রিয় কাজ করে থাকি, তা মনে রেখো না।

ত্বং গতিস্ত্বগতীনাঞ্চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্।
সমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কথং ত্বং নাভিভাষসে॥ (অযো)
৬৪।১০

—আমাদের তুমিই গতি ও চক্ষু। যেহেতু আমরা গতিহীন ও অন্ধ আমাদের প্রাণ তোমাতেই নির্ভরশীল। বৎস, তুমি কথা বলছ না কেন?

অন্ধ মুনি এইভাবে অপরিস্ফুট স্খলিত ও পিপাসর্ত হয়ে বললেন। আমি ভীত হয়ে তাকে বললাম। আমি ক্ষত্রিয়। আমার নাম দশরথ। আমি আপনার পুত্র নই। আমি সবিস্তারে তাঁর নিকট পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দিলাম এবং বললাম মৃত্যুর পূর্বে আপনারা উভয়েই অন্ধ, আপনাদের কি দশা হবে—এই দুঃখে তাপস কুমার বিলাপ করছিলেন। আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার পুত্রকে হত্যা করেছি। যা হবার তা হয়েছে, এখন আমার এই কার্য্যে যা কর্তব্য করুন। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। আমার এই স্বীকারোক্তির জন্য মুনি আমাকে কঠোর শাপ দিতে পারলেন না!

আমি করযোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে সেই ঋষি অশ্রু প্লাবিত নয়নে এক দীর্ঘশ্বাস টেনে বললেন, রাজন, যদি আপনি স্বয়ং এসে আমাকে এই অশুভ সংবাদ না দিতেন তাহলে এখনই আপনার মস্তক শত সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে যেতো। বানপ্রস্থধর্মাবলম্বীকে যদি কোন ক্ষত্রিয় জ্ঞান পূর্বক নিহত করে তাহলে যে পাতক হয়, তার দ্বারা ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও স্থানচ্যুত হয়। আমার পুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী তপস্বী মুনির উপর স্বজ্ঞানে শরনিক্ষেপ করলে, নিক্ষেপকারীর মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়। আপনি অজ্ঞানবশতঃ এই কাজ করেছেন। সেই জন্য এখনো জীবিত আছেন। জ্ঞান পূর্বক এই কাজ করলে

আমরা আপনার কথা কি বলব, এতক্ষণে রঘুবংশই নির্মূল হয়ে যেতো।

মুনি অতঃপর পুত্রের শবের পার্শ্বে যেতে চাইলেন। তখন আমি একাকীই মুনি দম্পতীকে পুত্রের মৃতদেহের পাশে নিয়ে গিয়ে তাঁদের দিয়ে তার শব স্পর্শ করালাম। শোকার্ত মাতা পিতা উভয়েই মৃত সন্তানের দেহের উপর লুঠিয়ে পড়ে বিলাপ করতে থাকেন। এবং বললেন এই তপস্বীর বংশে জন্মগ্রহণ করে কেউই অশুভগতি প্রাপ্ত হয়নি। তুমি আমার একমাত্র বান্ধব। যে তোমাকে নিহত করেছে, সেই ব্যক্তির অশুভগতি হবে। (স তু যাস্যতি যেন তং নিহতো মম বান্ধবঃ) মুনি দম্পতী বার বার এই বিলাপ করলে, সেই সময় মুনি কুমার নিজ কর্ম বলে দিব্যদেহ ধারণ করে অতি সত্বর ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গমন করতে উদ্যত হলেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে তিনি বৃদ্ধ মাতা পিতাকে আশ্বস্ত করে পিতাকে বললেন,—

স্থানমস্মি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পরিচারণাৎ।
ভবন্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ॥ (অযো) ৬৪।৪৯

—আপনাদের উভয়ের পরিচর্য্যা করার জন্য আমি উত্তমগতি প্রাপ্ত হলাম। আপনারাও অতি শীঘ্রই আমার নিকট আসবেন। পিতাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়ে দিব্য সুশোভন বিশাল বিমানে করে মুনিপুত্র স্বর্গে গেলেন।

অতঃপর মুনি পত্নীর সঙ্গে অতি সত্বর পুত্রের তর্পণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে আমাকে বললেন, রাজন, তুমি এখনই আমাকে বধ কর। মৃত্যুতে আমার আর কষ্ট নেই। আমার একটি মাত্র পুত্রকে তুমি বধ করে আমাকে পুত্রহীন করলে। তুমি অজানত আমার পুত্রকে নিহত করায় সদ্য ভস্মসাৎ না করে আমি তোমাকে দুঃখজনক অভিশাপ দিচ্ছি।

পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন কালং করিষ্যসি॥ (অযো) ৬৪।৫৪

—এখন পুত্র বিয়োগজনিত আমার যেরূপ দুঃখ হচ্ছে, তেমনি পুত্রশোকই তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।

তুমি ক্ষত্রিয় এবং অজ্ঞান বশতঃই ঋষিকে হত্যা করেছ। এইজন্য ব্রহ্মহত্যা তোমাকে গ্রাস করছে না। (তস্মাত্বং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ।)

মুনি দম্পতী দশরথকে অভিশাপ দিয়ে বললেন দাতা ব্যক্তি যেমন দক্ষিণা দানের ফল অবশ্যই পায়। তেমনি অচিরেই তুমি এই কাজের ভয়ানক ফল পাবে। এই অভিশাপ দিয়ে বিলাপ করতে করতে তাঁরা চিতায় আরোহণ করে স্বর্গধামে চলে গেলেন।

দশরথ উপরোক্ত কাহিনী বিবৃত করে বললেন, অখাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে অন্ন ভোজন করলে যেমন ব্যাধি আক্রমণ করে, তেমনি পূর্বকৃত কর্মফলে আমি দুঃখে পড়েছি। ঋষির অভিশাপ আজ ফললো বলে তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে বললেন,—

কৌশল্যা, পুত্রশোকে আমার মৃত্যু আসন্ন, আমি এখন তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর। মৃত্যু পথিক কাউকে দেখতে পায় না। যদি রাম আমাকে একবার স্পর্শ করত কিংবা কিঞ্চিৎ অর্থ অথবা যৌবরাজ্য গ্রহণ করত, তাহলে আমি বেঁচে যেতাম। দেবি, আমি রামের প্রতি যে ব্যবহার করেছি, তা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু সে আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেছে, তা তার উপযুক্তই হয়েছে। কৌশল্যা, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার স্মৃতি লোপ পাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর কি যে আমি এই মৃত্যুকালে ধর্মজ্ঞ সত্য পরাক্রম রামকে দেখতে পাচ্ছি না। (ন হি পশ্যামি ধর্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্)

তিনি শোকে অভিভূত হয়ে বিলাপ করে বললেন, আমি এখন অনাথ ও প্রায় জ্ঞানশূন্য। হায় রঘুকুলনন্দন, হায় মহাবাহো, হায় ক্লেশনাশন, হায় পিতৃবৎসল। তুমিই আমার রক্ষা কর্তা, তুমিই

আমার পুত্র। তুমি এই সময় কোথায় গেলে ?

হায় কৌশল্যা, হায় সুমিত্রা, তোমরা কোন দোষ করনি। আমি আর তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না। হায় কৈকেয়ী, কুলকলঙ্কিনী, তুমি অতি ক্রুর প্রকৃতি এবং আমার পরম শত্রু। এইভাবে শোক করতে করতে মহারাজা দশরথ কিছুক্ষণের জন্য শান্ত হলেন।

দশরথকে শান্ত স্তব্ধ দেখে কৌশল্যা ও সুমিত্রা নিদ্রিত হলে তিনি শোকে ও তাপে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

মহারাজা দশরথকে স্ত্রৈণ বলে কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দশরথের অভিশপ্ত জীবন ও রামের জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁর দেহ ত্যাগের মধ্যেই কি সে অভিযোগ খণ্ডন করা যায় না ? যথার্থই তিনি যদি স্ত্রৈণ হতেন, তবে কৈকেয়ীকে তিনি এভাবে তিরস্কার কেন করবেন ? তিনি তো পরমানন্দে ভরতকে সিংহাসনে বসিয়ে কৈকেয়ীর সঙ্গে আনন্দে দিন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু বস্তুতঃ তিনি কৈকেয়ীকে সমর ক্ষেত্রে তাঁকে সেবা করার জন্য যে বর দিয়েছিলেন, সেই সত্য রক্ষার্থেই তো তিনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কাজ করলেন, যা তিনি নিজেও সহ্য করতে পারলেন না।

রাত্রে কৌশল্যার কক্ষেই দশরথ তন্দ্রাভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর পাশে

কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকপরাজিতে।
প্রসুপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথাকালসমন্বিতে॥ (অযো) ৬৫।১৬

—বিধির বিধান অখণ্ডনীয়। তাই বেহুলাকে নিদ্রায় মগ্ন রেখে যেমন লক্ষিন্দরের চিরনিদ্রার ব্যবস্থা করেছিলেন কালপুরুষ, তেমনি শোকতুরা দুই রানী যখন দুঃখে শোকের ক্লান্তিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখনই দশরথ চির নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে নিদ্রিত দেখে এবং নিদ্রিত থাকা অবস্থায় মহারাজ প্রাণহীন হয়েছেন বুঝে সমস্ত অন্তঃপুর মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। দশরথের অন্যান্য মহিষীদের কান্নায় কৌশল্যা ও সুমিত্রার ঘুম ভাঙ্গল।

তাঁবা উভয়ে বাজাকে দেখে ও স্পর্শ কবে শোকাতিভূত হযে ভূতলে পতিত হলেন।

অতঃপব মৃত স্বামী দশবথেব মস্তক কোলে নিযে কৌশল্যা অশ্রুপূর্ণ নযনে কৈকেয়ীকে তিবস্কাব কবে বললেন, কৈকেযি। তোমাব স্বভাব অত্যন্ত কুট। তুমি বাজাকে ত্যাগ কবে সানন্দে নিষ্কণ্টক বাজ্য ভোগ কব। তোমাব অভিলাষ পূর্ণ হোক। বাম আমাকে ত্যাগ কবে চলে গেছে। এখন স্বামীও চলে গেলেন। এই অবস্থায আমি আব বাঁচতে চাই না। তোমাব মত ধর্ম ত্যাগিনী ভিন্ন অন্য কোন্ স্ত্রী দেবতা স্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ কবে বাঁচতে চায়?

ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিং পাকমিব ভক্ষয়ন্।
কুব্জানিমিত্তং কৈকয্যা বাঘবাণাং কুলং হতম্॥

(অযো) ৬৬।৬

—লুব্ধ ব্যক্তি অন্যেব সম্পত্তি লাভেব জন্য বিষ ভোজন কবালে তাতে যে দোষ হয, তা বুঝতে পাবে না। কুব্জাব জন্য কৈকেযীব দ্বাবা বঘুবংশ ধ্বংস হল।

কৈকেয়ীব জন্য বাজা দশবথ বামকে নির্বাসিত কবে সীতাকেও নির্বাসিত কবাব ন্যায় অন্যায কাজ কবেছেন। এই দুঃসংবাদে বাজা জনক আমাবই মত দুঃখ পাবেন। বাম জীবিত থেকেও সে আমাব দৃষ্টিব অগোচবে চলে গেছে। সেজন্য আমি যে অনাথ ও বিধবা হলাম তা সে জানতে পাবছে না। (সে মামনাথাং বিধবাং নাদ্য জানাতি ধার্মিকঃ।) সদাচাবব্রতী বৈদেহী অবণ্যে নানা প্রকাব দুঃখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হচ্ছে।

বৃদ্ধ জনক সীতাব বিষয চিন্তা কবে শোকাকুল হযে নিশ্চযই প্রাণ ত্যাগ কববেন। যাহোক আমি পাতিব্রত্যধর্ম পালনেব জন্য আজই প্রাণ ত্যাগ কবব। (সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।) স্বামীব মৃতদেহ আলিঙ্গন কবে আগুনে প্রবেশ কবব। কৌশল্যা স্বামীব মৃতদেহ আলিঙ্গন কবে এইভাবে বিলাপ কবতে লাগলেন।

শোক শোভাযাত্রা করে আসে। যে স্বামী জীবিতাবস্থায় কখনও প্রধানা স্ত্রীর যোগ্য সমাদর দেননি যাঁর জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ চোদ্দ বছরের জন্য বনবাসী হয়েছেন, তাঁর মৃত্যুতে এইভাবে তাঁর শোক করার মধ্যে যথার্থই তাঁর পাতিব্রত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর অমাত্যগণ শোকাকুল কৌশল্যাকে অন্যান্য মহিলাদের দ্বারা অন্যত্র সরিয়ে নিলেন, বশিষ্ঠ প্রভৃতির আদেশানুসারে তৈলপূর্ণ পাত্রে রাজার শব সংরক্ষিত করা হল এবং সেই সময়ে করণীয় সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলেন। দশরথের যে কোন একজন পুত্রের অনুপস্থিতিতে শব দাহ করতে অমাত্যরা রাজি হলেন না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভরত মাতুলালয় হতে দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে কৌশল্যার সঙ্গে দেখা করলে—

পুত্র বলি কৌশল্যা ভরতে নিল কোলে।
উভয়ের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে॥

— — — — — —

মায়ে—পোয়ে রাজ্য কর ভরত এখন।
কালি রাজা হবে রাম আজি অধিবাস॥
হেনকালে, তব মাতা দিল বনবাস॥
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী।
কোন্ দোষে পুত্রে মোর করে দেশান্তরী॥
আমাকে করিয়া দূর ঘুচাও এ কাঁটা।
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জটা॥
দুঃখ ভাগী যেই জন সেই পায় দুঃখ।
মায়—পোয়ে ভরত করহ রাজ্যসুখ॥ (অঃ)

কৌশল্যার বাক্যে ভরত দুঃখিত চিত্তে তাঁর চরণ স্পর্শ করে নানা শপথ করে সর্বশেষ বললেন—

রামেরে বঞ্চিয়া রাজা আমি যদি চাই।

ইহ পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ॥ (অঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে ভরত মাতুলালয় হতে প্রত্যাবর্তন করে জননী কৈকেয়ী হতে অযোধ্যার সব খবরাখবর জানতে পেরে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন (ভরত চরিত্র দ্রষ্টব্য) ও বিলাপ করতে থাকেন।

ভরতের বিলাপে কৌশল্যা তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে সুমিত্রাকে বললেন ঃ—ক্রূরকার্যকারিনী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এসেছে। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এই কথা বলে বিষণ্ণ বদনা শীর্ণদেহা প্রায় চৈতন্য শূন্যা কৌশল্যা কাঁপতে কাঁপতে ভরতের কাছে আসলেন। ভরতও রাজপুত্র শত্রুঘ্নের সঙ্গে কৌশল্যার গৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। তাঁরা উভয়ে পথিমধ্যে কৌশল্যাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন।

কৌশল্যা দুঃখে অভিভূতা হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। কৌশল্যা জ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ভরতকে বললেন।

বৎস, তুমি রাজ্য কামনা করেছিলে এখন নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর কাজের দ্বারা অতি শীঘ্র তুমি রাজ্য পেয়েছো। কিন্তু আমার পুত্র রামকে চীর বসন পরিয়ে বনবাসী করে ক্রূর বুদ্ধি কৈকেয়ীর কি লাভ হল ? যাহোক রাম যেখানে আছে, কৈকেয়ী আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারে। অথবা যে পথে রাম গেছে, আমি সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিহোত্র (দশরথের নির্দেশে ভরত কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে কাজ করলে, তিনি পিতার প্রেতকার্য্য যেন না করেন, সেই নির্দেশ ছিল। সুতরাং কৌশল্যা অগ্নিহোত্র সঙ্গে নিলে তার দ্বারা ভরত প্রেতকার্য্য করতে পারবেন না।) নিয়ে অত্যন্ত সুখেই সেই পথে গমন করব। কিংবা ইচ্ছা করলে তুমিই আজ আমাকে রাম যেখানে তপস্যা করছে সেখানে নিয়ে যেতে পার।

এই রাজ্য হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ধনধানপূর্ণ ও অতি বিশাল। কৈকেয়ী তোমাকে এই রাজ্য দিচ্ছে। কৌশল্যা এইভাবে অনেক

নিষ্ঠুর উক্তি করলেন।

ভরত ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে কৌশল্যার পা জড়িয়ে ধরলেন এবং বিলাপে রুদ্ধ কণ্ঠ হয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন। (ভরত চরিত্র দ্রষ্টব্য) জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভরত নানা প্রকার শপথ করলেন। ভরতের শপথ শুনে সস্নেহে কৌশল্যা ভরতকে কোলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ—

মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে।
শপথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে॥ (অযো) ৭৫।৬১

—এইভাবে নানা শপথ করে, তুমি আমার প্রাণে আঘাত করছ। এতে আমি পুনরায় দুঃখ পাচ্ছি। পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, তুমি স্বর্গ হতে চ্যুত হওনি।

বৎস, তুমি যদি সত্যনিষ্ঠ হও, তবে সাধুদের গম্য লোকে গমন করবে। এই কথা বলে কৌশল্যা ভরতকে কোলে নিয়ে আলিঙ্গন করে কাঁদতে থাকেন।

এইখানে কৌশল্যার শোকের মধ্যে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। যার জন্য তাঁর একমাত্র পুত্র পুত্রবধূর চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস হলো, স্বামী গত হলেন—সেই ভরতকে সামনে পেয়েও তিনি কোন প্রকার অভিশাপ দিলেন না।

পিতার মৃত্যুর পর রাজবাড়ীতে ফিরে জননী কৈকেয়ীর মুখে সব ঘটনা শুনে ব্যথিত ভরত জননীকে ভর্ৎসনা করেন। ঐ ভর্ৎসনার সময় ভরত কৌশল্যার প্রশংসা করে বলেছিলেন ঃ—

তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌশল্যা দীর্ঘদর্শিনী।
ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে॥ (অযো) ৭৩।১০

—দীর্ঘদর্শিনী জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যা দেবী ও ধর্মানুসারে আপন ভগ্নীর মতই তোমার সঙ্গে ব্যবহার করেন,

উপরোক্ত উক্তি হতে কৌশল্যা যে কৈকেয়ীর সঙ্গে সপত্নীর ন্যায় ব্যবহার না করে ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করতেন তারই প্রমাণ

পাওয়া যায়। জননী কৌশল্যার চরিত্রে সপত্নী প্রেমের এইটি একটি নিখুঁত চিত্র।

ভরতের ব্যবহার কৌশল্যার হৃদয়কে বিশেষ রূপে অভিভূত করেছে। চিত্রকূট গমনের পথে শৃঙ্গবেরপুর নিষাদরাজ গুহের সাথে রাম সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার সময় শোকার্ত ভরত অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন কৌশল্যা আলিঙ্গন করে কাঁদতে কাঁদতে ভরতকে প্রশ্ন করলেন ঃ—

পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে।
অস্ত রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্॥
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে।
বৃত্তে দশরথে রাজ্ঞি নাথ একস্ত্বমদ্য নঃ॥ (অযো) ৮৭।৯-১০

—পুত্র, তোমার ব্যাধি তোমার শরীরকে পীড়িত করছে না তো? এখন এই রাজবংশের অস্তিত্ব তোমার উপর নির্ভরশীল। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণ বনে গেছে, রাজা দশরথ পরলোকে গমন করেছেন, এখন আমি তোমার দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছি। তুমিই আমাদের একমাত্র গতি।

কৌশল্যা ভরতকে প্রশ্ন করলেন, বৎস, তুমি লক্ষ্মণের সম্বন্ধে কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনতে পাওনি তো? অথবা স্ত্রী সহ বনবাসী রামের কোন অপ্রিয় সংবাদ শুনতে পাওনি তো? রামই আমার একমাত্র পুত্র।

কৌশল্যার কথা শুনে ভরত তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। (ভরত চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কৌশল্যার উক্তি হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে সপত্নী পুত্র ভরতের উপর তিনি কতটা নির্ভরশীল।

ভরতের জননীরা ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করলে, তিনি ভরতকে বললেন, রঘুনন্দন, আমি তোমার মাতাদের পৃথক পৃথক পরিচয় জানতে চাই।

তখন ভরত ভরদ্বাজ মুনির কাছে জননীদেরও পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের জননী কৈকেয়ীর নিন্দা ও কৌশল্যার প্রভূত প্রশংসা করলেন।

যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্ ॥
পিতুর্হি মহীষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি।
এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
কৌশল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা।

(অযো) ৯২।২০।২১

—ভগবন, শোকে ও অনশনে ক্লিষ্টা অতি দুঃখী এই যে দেবোপম জননীকে দেখছেন, তিনি পিতার প্রধানা মহিষী কৌশল্যা। অদিতি যেমন ধাতার জননী। ইনিই সেইরূপ সিংহতুল্যগতি পুরুষব্যাঘ্র বা পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামের জননী।

রাম পিতৃসত্য পালন না করে অযোধ্যায় ফিরতে রাজী না হওয়ার সকলে ফিরে আসলেন। তারপর বাল্মীকি রামায়ণে কৌশল্যা সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায়নি।

রাজকুমারী, রাজমহিষী, রাজমাতা কৌশল্যার জীবন দুঃখ ছায়ায় আবৃত। জীবনে সুখ বা শান্তি তিনি বেশীদিন ভোগ করতে পারেননি। তাঁর একমাত্র আশা ছিল যোগ্য পুত্র রামের উপর। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনিও বনে নির্বাসিত হওয়ায়, শোকে দুঃখে তিনি ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু ধৈর্যশীলা রমনী অচিরেই নিজেকে সংযত করে রেখেছিলেন।

দশরথ ও কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধার্মিক রমণী দেবসেবার মাধ্যমে নিজের জীবনের পুঞ্জীভূত ব্যথাকে শান্ত সমাহিত রাখতেন।

কৌশল্যার সহিষ্ণুতা অসাধারণ। এমন সহিষ্ণু, ধার্মিক জননীর সন্তান বলেই রামের মধ্যেও আমরা এত গুণের সমাবেশ দেখতে পাই। তিনি আদর্শ রমণী।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে চৌদ্দ বছর পর রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমনের পর আবার দেখা পাই ঃ—

আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিল রন্ধন।
চারি ভাই করিলেন অমৃত ভোজন॥ (লঃ)

সুগৃহিণী আনন্দময়ী জননী কৌশলাকে অন্নপূর্ণারূপে আবার দেখা গেল। স্বহস্তে রন্ধনকরে পুত্রদের পরিবেশন করে খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে তাঁর দীর্ঘ কালের ব্যথা বেদনা যেন দূর হল, আত্মতৃপ্তি বোধ করলেন।

কৌশল্যাকে উত্তরকাণ্ডে আবার দেখা গেল রাম পুনরায় সীতার সতীত্বের পরীক্ষা নিতে চাইলে ঃ—

কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
রামেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী॥
লইলা পরীক্ষা এক সাগরের পার।
কি হেতু পরীক্ষা নিতে চাহ আররার॥
ধন্য জনকের মান্য জানকীর বাপ।
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ॥
সীতাকে জানিহ তিনি কমলা আপনি।
নাহিক সীতার পাপ জানে সর্ব প্রাণী॥
সীতারে লইয়া তুমি থাক গৃহবাসে॥ (উঃ)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে সর্বশেষে সপত্নীদের সঙ্গে কৌশল্যাকে আবার দেখা গেল সীতার পাতাল প্রবেশের পর তিনি সপত্নীদের নিয়ে দুই নাতিকে প্রবোধ দিয়ে বললেন ঃ—

মা হইয়া পুত্রেরে যে হৈল নিদারুণ।
সে মায়ের জন্য কেন করহ ক্রন্দন॥
.. ..
পিতামহী আমরা যে আছি কি বিশেষে॥ (উঃ)

এইখানেও কৌশল্যার সপত্নী প্রীতি ও বাৎসল্য রসের প্রকাশ

পাওয়া যায়।

সীতার পাতাল প্রবেশের দীর্ঘকাল পরে কৌশল্যা পুত্র পৌত্র পরিবৃত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

বসুদেবের পিতা যদুশ্রেষ্ঠ শূরের পৃথা নামে একটি কন্যা জন্মেছিল। তিনি তাঁর পিসতুত ভাই নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর প্রথম যে সন্তান হবে তা তিনি কুন্তিভোজকে দেবেন। শূর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে তাঁর কন্যা পৃথাকে কুন্তিভোজকে দান করেন। পালিত পিতার নাম অনুসারে পৃথার অপর নাম কুন্তী।

পিতৃগৃহে থাকাকালীন কুন্তিভোজ কুন্তীকে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের সেবা কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। দুর্বাসা মুনি কিছুকাল কুন্তিভোজের গৃহে অতিথি রূপে অবস্থান করেন। তখন কুন্তির সেবায় তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে দুর্বাসা একটি মন্ত্র দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঐ মন্ত্রের দ্বারা তিনি যখন যে দেবতাকে আহ্বান করবেন, সেই সেই দেবতার অনুগ্রহে পুত্র লাভ করবেন। কুন্তীর ভবিষ্যৎ সঙ্কটের বিচার করেই দুর্বাসা তাঁকে ঐ বর দিয়েছিলেন।

দুর্বাসার মন্ত্রের যথার্থ্য পরীক্ষা করতে অভিলাষী হয়ে কুন্তী কৌতূহলবশতঃ সূর্যের উদ্দেশ্যে সেই মন্ত্রোচ্চারণ করেন। কুন্তীর আহ্বানে সূর্যদেব আবির্ভূত হলেন। কুন্তীদেবীর আহ্বানে সূর্যদেব উপস্থিত হলে কুন্তী অপ্রস্তুত হয়ে তার প্রগলভতার জন্য ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু কুন্তী অনুনয় বিনয় দ্বারা সূর্যকে নিরস্ত করতে পারলেন না। নিজের কুমারীত্ব ও গুরুজনদের ভয় প্রভৃতির উল্লেখ করলেও সূর্যদেব তাঁকে অব্যাহতি দিলেন না। সূর্যদেব তাঁকে বললেন—

যে পুত্র জন্মাবে সে আমার মত কুণ্ডল ও আমার কবচ ধারণ করেই জন্মাবে। সে শস্ত্রের দ্বারা অভেদ্য হবে। সে এমন দাতা হবে যে তার ব্রাহ্মণকে অদেয় কিছুই থাকবে না।

কালক্রমে কন্যা কুন্তীর এক দেবতুল্য সন্তান জন্ম নিল। লোক-

নিন্দা ও জ্ঞাতিদেব ভযে কুন্তী নবজাত শিশুকে ধাত্রীব সহায়তায একটি কাঠেব বাক্সে কবে জলে ভাসিয়ে দিলেন এবং সকলেব নিকট এ ব্যাপাবটি গোপন বাখলেন। পুত্রকে বিসর্জন দিতে তাঁব মন খুবই দুঃখে কাতব হযেছিল। চিব জীবন প্রথম মাতৃত্বেব এই ব্যথা তিনি মনেব কন্দবে নিভৃত বেখেছিলেন।

বাধাব স্বামী সূতপুত্র অধিবথ সেই ভাসমান শিশুকে পেযে স্বামী স্ত্রী তাকে পুত্রেব ন্যায় প্রতিপালন কবে। সহজাত কুণ্ডল ও কবচ যুক্ত শিশুকে দেখে তাবা তাঁব নাম বাখলেন 'বসুষেণ'।

মহাব্রতধাবিণী ধার্মিক কুন্তী তেজ রূপ ও নানা গুণ সম্পন্ন ছিলেন। এজন্য এই বিশাল নযনা তেজস্বিনী কন্যাব জন্য অনেক বাজাই পাণি প্রার্থী হযে এসেছিলেন। তখন বাজা কুন্তিভোজ স্বযংবব সভা আহ্বান কবে বাজাদেব নিমন্ত্রণ কবলেন। কুন্তী স্বযংবব সভায় পাণ্ডুব রূপে মুগ্ধ হযে তাঁকে ববমাল্য দিযে ববণ কবেন। কিছুকাল পবে ভীষ্ম মদ্রাধিপতি শল্যবাজেব ভগ্নী মাদ্রীব সঙ্গে পুনবায় পাণ্ডুব বিবাহ দেন। বাজা পাণ্ডু বহু দেশ জয কবে অনেক ধন বত্ন আহবণ কবেন। পাণ্ডুব এই পবাক্রমে সকলেই আনন্দিত ও তাঁব প্রশংসায় মুখব।

ধৃতবাষ্ট্রেব আজ্ঞায় পাণ্ডু দিগ্বিজযে নিজ বাহুবলে অর্জিত সমস্ত ধন ভীষ্ম, সত্যবতী ও জননী অম্বিকা ও অম্বালিকাকে দান কবলেন। বিদুবকেও তিনি কিছু ধন দিলেন এবং তাবই কিছু অংশ সুহৃদদেব দিলেন। কুন্তী ও মাদ্রীব প্রেবণায় পাণ্ডু আলস্য, রাজপ্রাসাদে বাস এবং বাজোচিত শয্যা ও আসন ত্যাগ কবে বন মধ্যে বাস কবতে লাগলেন, এবং মৃগযা কবে সময কাটাতে লাগলেন।

একদিন বাজা পাণ্ডু মৃগ ও সর্পাদি পবিপূর্ণ মহাবণ্যে বিচবণ কবতে কবতে শৃঙ্গারবত মৃগ দম্পতীকে বাণ বিদ্ধ কবলেন। মৃগ বেশী কিন্দম মুনি তাঁকে অভিপাশ দিলেন—"তুমি আমাকে যে অবস্থায় বধ কবলে, তোমাবও ঐ অবস্থায শোচনীয় মৃত্যু হবে।" এ অভিশাপেব পব মৃগ

দম্পতীর মৃত্যু ঘটে।

পাণ্ডু স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতাপনলে দগ্ধ হতে লাগলেন। তিনি তপস্যার দ্বারা এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন মনস্থ করেন। তখন তার স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী তাঁকে বলেছিলেন—

অন্যেঽপি হ্যাশ্রমাঃ সন্তি যে শক্যা ভরতর্ষভ।
আবাভ্যাং ধর্মপত্নীভ্যাং সহ তপ্তুং তপো মহৎ॥

(আঃ) ১১৮।২৭

—হে ভরতর্ষভ, সন্ন্যাস ছাড়া অন্য আশ্রমও আছে। ঐরূপ আশ্রম গ্রহণ করলে আমরা উভয় ধর্মপত্নীও তোমার সঙ্গে মহৎ তপস্যা করতে পারব।

উপরোক্ত উক্তি হতে কুন্তী ও মাদ্রীর পতি ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভার্যাদের অনুরোধে পাণ্ডু বানপ্রস্থ নিলেন। কিন্তু পিতৃঋণ শোধ করার উপায় না থাকায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না।

তিনি একদিন কুন্তীকে ডেকে বললেন, ইহলোকে সন্তানই একমাত্র প্রতিষ্ঠা স্বরূপ। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি ভালভাবে করলেও সন্তানহীন লোককে এ সব অনুষ্ঠান পবিত্র করে না। (সর্বমেবানপত্যস্য ন পাবনমিহোচ্যতে)।

কুন্তি, আমি একথা জেনেই আজ তোমাকে সন্তানের জন্য বলছি। কারণ অপুত্রকবশতঃ আমি ঊর্ধ্ব লোক লাভ করতে পারবো না। মৃগরূপী ঋষির শাপে আমার পুত্র জনন শক্তি ভ্রষ্ট হয়েছে। আমার নিষ্ঠুর কাজের ফল স্বরূপ ঐ শাপ।

ধর্মশাস্ত্রে ছয় রকম পুত্রকে পিতার সম্পত্তির অধিকারী করা হয়েছে। (১) স্বয়ং পিতা কর্তৃক উৎপাদিত (২) নিজ পত্নীর গর্ভে উত্তম পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত (৩) পুত্রিকাভাবে দত্ত কন্যার পুত্র (৪) নিয়োগ প্রথায় বিধবাতে উৎপন্ন পুত্র (৫) কন্যা অবস্থায় জাত পুত্র (৬) ভগ্নির গর্ভজাত পুত্র বা ভাগ্নে এই ছয় প্রকার পুত্র সম্পত্তির অধিকারী।

অপত্যং ধর্মফলদং শ্রেষ্ঠং বিন্দন্তি মানবাঃ।
আত্মশুক্রাদপি পৃথে মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥ (আঃ)
১১৯।৩৬

—হে পৃথে, স্বয়ং মনু বলেছেন—নিজ বীর্যজাত পুত্র ব্যতীত উক্ত অধম পুত্র হতেও আপৎকালে মানব শ্রেষ্ঠ ধর্মফলও পেতে পাবে।

আমি নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। সুতবাং আমা হতেও উত্তম পুরুষেব দ্বাবা তুমি সন্তান উৎপাদন কব—এটা আমি তোমাকে আদেশ কবছি।

কুন্তী বললেন, হে ধর্মজ্ঞ, আমি তোমাব ধর্মপত্নী ও তোমাতে আসক্ত। আমি তোমাব সঙ্গেই স্বর্গে যাব। আমি তোমাকে ব্যতীত মনে মনেও অন্য কাউকেও চিন্তা কবতে পাবব না। তোমাব সমান বা তোমা হতেও বিশিষ্ট কোন্ পুরুষ এ পৃথিবীতে আছে?

পাণ্ডু পুনবায কুন্তীকে বললেন, আমি পুত্র দর্শনেব জন্য অত্যন্ত কাতব হযেছি। কবপুটে আমি তোমাকে বলছি, তুমি আমাব কথা শোন। যাতে আমি পুত্র পেতে পাবি তুমি তাবই ব্যবস্থা কব। আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন গুণবান তাপস ব্রাহ্মণেব দ্বাবা তুমি সন্তান-বতী হও।

তখন কুন্তী পাণ্ডুকে দুর্বাসা মুনিব ববেব কথা জানিয়ে বললেন—

ব্রাহ্মণস্য বচস্তথ্যং তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
অনুজ্ঞাতা ত্বযা দেবমাহ্বয়েযমহং নৃপ॥ (আঃ)
১২১।১৫

—ব্রাহ্মণেব বচন সত্য কিনা তা পবীক্ষাব উপযুক্ত সময হযেছে। আপনাব অনুজ্ঞা অনুসাবে আমি যে দেবতাকে আহ্বান কবব তিনিই ঐ মন্ত্রে আকৃষ্ট হযে আপনাব হিতকাবী পুত্র প্রদান কববেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে কুন্তী স্বামীব নিকট তাঁব পূর্ব পবীক্ষার কথা গোপন কবেছেন। পাণ্ডুব অনুবোধে কুন্তী যথাক্রমে ধর্ম, পবন ও

ইন্দ্রের দ্বারা যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করলেন।

পাণ্ডু পুত্রলোভে কুন্তীকে পুনরায় পুত্র কামনা করতে বলায় কুন্তী বললেন—

নাতশ্চতুর্থং প্রসবমাৎস্বপি বদন্ত্যত।
অতঃ পরং স্বৈরিণী স্যাদ্ বন্ধকী পঞ্চমে ভবেৎ ॥ (আঃ)
১২২।৭৯

—চতুর্থ প্রসবের কথা আপৎকালেও ঋষিরা বলেন না। কেননা, চারিটি পুরুষ গমন করলে স্ত্রী স্বৈরিণী (বেশ্যা) হয় এবং পঞ্চম সন্তানে স্ত্রী 'বন্ধকী' নামে আখ্যাতা হয়।

আপনি এই ধর্ম জেনেও কেন প্রমত্ত পুরুষের ন্যায় সন্তানোৎপত্তির জন্য আমাকে বলছেন—বলে তিনি পাণ্ডুর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

পাণ্ডু বললেন—তুমি যা বলেছ, ধর্মশাস্ত্রও ও তাই বলে। মাদ্রীরও পুত্র লাভের ইচ্ছা হলে কুন্তী যে ভাবে সন্তান লাভ করেছেন পাণ্ডুকে তাঁর জন্যে অনুরোধ করলেন।

পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিলেন। মাদ্রী অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেবকে পুত্র রূপে লাভ করলেন।

পাণ্ডু মাদ্রীর জন্য কুন্তীকে পুনরায় অনুরোধ করলেন। তখন কুন্তী রাজা পাণ্ডুকে গোপনে বললেন, আমি মাদ্রীকে একবার মাত্র কোন দেবতাকে স্মরণ করতে বলেছিলাম। কিন্তু সে একবারই দুটি সন্তান লাভ করেছে। সুতরাং তার দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছি। আমার জানা ছিল না যে দেবতাদ্বয়কে একসঙ্গে আহ্বান করলে দুটি পুত্র লাভ হয়। সুতরাং আমার অনুরোধ তুমি এ বিষয়ে আর আদেশ করো না।

অতঃপর বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি বংশীয়গণ পরস্পর পাণ্ডুর কথা আলোচনা করছিলেন। শতশৃঙ্গ নিবাসী মুনিদের নিকট পাণ্ডুর

অভিশাপের কথা জেনে শোকাভিভূত হলেন। অনেকে ঐ মুনিদের নিকট পাণ্ডুর খোঁজ করতে এসে পাণ্ডুর দেবদত্ত পাঁচটি সন্তানের খবর শুনে উৎফুল্ল হয়ে বসুদেবকে এই সুসংবাদ জানালেন। বৃষ্ণিগণ তাঁকে বললে, আপনি রাজা পাণ্ডুর হিতাকাঙ্ক্ষী সুতরাং পাণ্ডুর পুত্ররা যাতে ক্রিয়াহীন না হয়, তার ব্যবস্থা করুন।

অতঃপর বসুদেব কুমারদের জন্য পোষাক পরিচ্ছদ, দাসদাসী গাভী, রৌপ্য সুবর্ণ মুদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য পুরোহিতের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ কাশ্যপকে আসতে দেখে পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী আনন্দিত হলেন, এবং বসুদেবের ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

পাণ্ডু তখন সেই ধনের দ্বারা উপনয়নান্ত সমস্ত সংস্কার কৃত্য সমূহের অনুষ্ঠান করলেন। কাশ্যপ তাঁদের উপাকর্ম সংস্কার করিয়ে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। এইভাবে পাণ্ডু পুত্ররা বেদাধ্যয়নে পারদর্শী হলেন। শর্যাতিবংশের পৃষৎ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁর পুত্র রাজা শুক। তিনি অস্ত্র দ্বারা সমস্ত বসুন্ধরাকে জয় করেছিলেন। সেই রাজা বান-প্রস্থাশ্রম গ্রহণ করে শতশৃঙ্গ পর্বতে ফলমূল আহার করে তপস্যা কর-ছিলেন। তিনি পাণ্ডু পুত্রদের ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই রাজা যখন বুঝলেন যে অর্জুন ধনুর্বেদে তাঁর সমান হয়েছে, তখন তিনি তাঁর সমস্ত অস্ত্র অর্জুনকে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করলেন।

একদা বসন্তকালে কামার্ত হয়ে রাজা পাণ্ডু মাদ্রীর নিষেধ অমান্য করে সঙ্গম করায় কিন্দম মুনির শাপে কাল প্রাপ্ত হলেন। মাদ্রীর বিলাপে কুন্তী তথায় ছুটে গেলেন এবং সব শুনে মাদ্রীকে ভর্ৎসনা করলেন। কুন্তী ও মাদ্রী বিলাপ করতে থাকলে চারণদের সঙ্গে মহর্ষিরা তথায় আসলেন এবং তাঁরা তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

কুন্তী সহমরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। মাদ্রী জানালেন তাঁরই জন্য পাণ্ডুর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং তিনিই সহমরণে যাবেন। মাদ্রী কুন্তীকে বললেন, তুমি আমার দুই পুত্রের প্রতি নিজ পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করতে পারবে—তা আমি বিশ্বাস করি।

মহর্ষিগণ কুন্তী ও মাদ্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমরা উভয়েই সৌভাগ্যবতী ও সন্তানবতী। সুতরাং তোমাদের সহমরণ উচিত নয়। আমরা পাণ্ডু পুত্রদের সঙ্গে করে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌঁছিয়ে দেব। ধৃতরাষ্ট্র লোভী। যদি সে অধর্মবশতঃ তাদের আশ্রয় না দেয় বা তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করে, তবে কুন্তীর পিত্রালয়ে বৃষ্ণি-বংশীয়রা ও কুন্তিভোজ তাদের আশ্রয় দেবে এবং মাদ্রীর পিত্রালয়ে মদ্ররাজ শল্য মাদ্রীপুত্রদের প্রতিপালিত করবে। যদিও সহমরণ খুবই পুণ্যের কথা। কিন্তু তোমাদের পক্ষে সহমরণ মঙ্গল জনক নয়। শাস্ত্রে বলে যে বিধবা ব্রহ্মচারিণী হয়ে নিয়ম পালন করে ব্রত, উপবাসের দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধন করে, ভূমিতে শয়ন ও ক্ষার লবণাদি বর্জন করে একাহারাদির দ্বারা শরীরকে শোষণ করে, সে সহমরণ অপেক্ষাও অধিক পুণ্য অর্জন করে।

কুন্তী বললেন, ব্রাহ্মণদের নির্দেশ শিরোধার্য করে তাঁরা যেরূপ বলবেন, আমি সেইরূপ করব। আমি মনে করি মহর্ষিরা যা বলছেন তাই আমার স্বামী ও পুত্রদের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

মাদ্রী বললেন—

কুন্তী সমর্থা পুত্রাণাং যোগক্ষেমস্য ধারণে।
অস্যা হি ন সমা বুদ্ধ্যা যদ্যপি স্যাদরুন্ধতী॥ (আঃ) ১২৪।

—কুন্তী পুত্রদের প্রতিপালন করতে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাঁর বুদ্ধি আমি অরুন্ধতী অপেক্ষাও বেশী মনে করি।

সপত্নীর মুখে কুন্তীর এই প্রশংসার মূল্য কম নয়।

তিনি আরও বললেন—কুন্তীর বৃষ্ণিরা ও স্বয়ং কুন্তিভোজ সহায়ক আছেন। আমি তাঁর ন্যায় পুত্রদের পালন করতে সমর্থ নই। তাছাড়া আমি ভোগে অতৃপ্ত। তাই আমি স্বামীর অনুগমন করতে চাই। কুন্তীদেবী আমাকে অনুমতি দিন। আমি স্বর্গে গিয়ে পতির সেবা করব। এই কথা বলে মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হাতে দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। অতঃপর পাণ্ডবদের আলিঙ্গন করে তাঁদের

মস্তক আঘ্রাণ করে যমজ পুত্রদের যুধিষ্ঠিরের হাতে সমর্পণ করলেন।

কুন্তী তাঁকে সহমরণের অনুমতি দিলেন। মাদ্রীও তাঁকে প্রণাম করে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

পাণ্ডুর পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করে কুন্তী পুত্রদের নিয়ে ঋষিদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গেলেন। সেইখানে ঋষিরা পাণ্ডুর অভিশাপ, পুত্রদের জন্ম, তাঁর মৃত্যু ও মাদ্রীর সহমরণের কথা ভীষ্মাদি কৌরব শ্রেষ্ঠদের সত্যবতী ও গান্ধারী প্রভৃতি মহিষীদের জানালেন। তাঁদের পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতকার্য সম্পাদন করতে এবং পুত্রদের সহ মাতা কুন্তীকে গ্রহণ করতে বললেন। এই কথা বলে গন্ধর্বদের সঙ্গে মহর্ষিগণ হঠাৎ অন্তর্ধান হলেন।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে বিদুর ভীষ্মের সঙ্গে পবিত্র স্থানে পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতকাজ সম্পন্ন করলেন।

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে থেকে পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্রও শাস্ত্রে ও শস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। শৈশবাবস্থা হতে পাণ্ডবদের দুর্যোধন ঈর্ষা করতেন। কুন্তী এজন্য সর্বদাই শঙ্কিত থাকতেন এবং বিদুরই ছিলেন তাঁর একমাত্র পরামর্শদাতা ও হিতাকাঙ্ক্ষী।

একদিন পাণ্ডবরা দুর্যোধনের আমন্ত্রণে তাঁদের সঙ্গে খেলা করতে গেলেন। ক্রীড়া অবসানে সকলেই ফিরে এলেন, কিন্তু ভীমকে জলে স্থলে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুনে স্নেহময়ী জননী কুন্তীর চিন্তা কাশীদাসী মহাভারতে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে

বিদুরে কহেন কুন্তি গদ্‌গদ্ ভাষে॥
ভাই সহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে এল বৃকোদর না আইলে কেনে॥
দুষ্ট দুর্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রুরমতি নির্লজ্জ সে মারিয়াছে তারে॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির চিত্তে হইল যন্ত্রণা॥ (আঃ)

পুত্রের বিপদের আশঙ্কায় দুঃখিনী অনাথিনী অসহায় জননীর দুঃখের অভিব্যক্তি ফুটেছে এখানে।

বিদুর তাঁকে প্রবোধ দিয়ে ভীমের সম্বন্ধে কোন প্রকার অমঙ্গল চিন্তা করতে বারণ করেন এবং অন্যান্য চার পুত্রকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে বললেন। তিনি আরও বললেন বেদব্যাস বলেছেন আপনার পুত্ররা সকলেই দীর্ঘায়ু হবে। ভীম শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই কথা বলে বিদুর নিজের গৃহে চলে গেলেন। কুন্তী চিন্তান্বিত হয়ে সব পুত্রকে নিয়ে এক ঘরে কাটালেন। ভীম পরে ফিরে আসলেন। (ভীম চরিত্রে দ্রষ্টব্য)

রাজপুত্রদের শিক্ষা সমাপান্তে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছাক্রমে দ্রোণের নির্দেশে বিদুর বিশাল একটি রঙ্গভূমি তৈরী করলেন। শুভ তিথিতে শুভ ক্ষণে কুরু-পাণ্ডব রাজপুত্ররা সব রকম শস্ত্র, অশ্ব, গদাযুদ্ধ ইত্যাদি সব রকম শিক্ষা প্রদর্শনী করলেন। এই সময় কুন্তীর পরিত্যক্ত পুত্রটিও আপন শস্ত্র জ্ঞানের পরিচয় দেবার জন্য রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করলেন। সহজাত কবচ ও কুণ্ডলের দ্বারা—

কুন্তী দেবী জানিলেন আপন নন্দনে ॥
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তী দেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা হয় মহাতাপ ভাবি। (আঃ)

কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের শক্তি ও কৌশলের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে চাইলেন। তখন রাজপুত্রদের অন্যতম শস্ত্রগুরু কৃপাচার্য কর্ণের পরিচয় জানতে চান এবং বললেন—

অয়ং পৃথায়াস্তনয়ঃ কনীয়ান্ পাণ্ডুনন্দনঃ।
কৌরবো ভরতা সার্ধং দ্বন্দ্বযুদ্ধং করিষ্যতি ॥
ত্বমপ্যেবং মহাবাহো মাতরং পিতরং কুলম্।
কথয়স্ব নরেন্দ্রাণাং যেষাং ত্বং কুলভূষণম্ ॥ (আঃ) ১৩৫।৩১-৩২

—তোমার এই প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথার গর্ভজাত পাণ্ডুর ক্ষেত্রে উৎপন্ন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ। এখন তুমিও তোমার পিতা মাতা

ও কুলেব পবিচয় দাও। তুমি যে বাজকুলেব কুলভূষণ—তাব পবিচয় দাও। কুল শীলে সমকক্ষ না হলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হতে পাবে না।

কৃপাচার্যেব এই কথা শুনে কর্ণেব মুখ লজ্জায অবনত হল। (কর্ণ চবিত্র দ্রষ্টব্য) দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গবাজ্য দান কবায় জননী কুন্তীব অন্তব আনন্দে ভবে গেল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি কাউকে কিছু বললেন না।

সামাজিক কাবণে এই পবিত্যক্ত পুত্রকে তিনি সব বকমে বঞ্চিত কবেছিলেন। সেই ত্যক্ত পুত্রেব প্রতিও যে তাঁব গোপন স্নেহাকর্ষণ ছিল, পুত্রব বাজ্য প্রাপ্তিতে তাঁব মধ্যে যে আনন্দেব বাণ ডেকেছিল, তাব থেকেই তা প্রতীযমান হয়।

যুধিষ্ঠিবেব যশ ও ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে দুর্যোধন ও ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডবদেব দগ্ধ কবে মাববাব ষডযন্ত্র কবে কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডবকে কৌশলে বাবণাবতে পাঠিয়ে দিলেন। নিজেদেব অসহাযতাব কথা চিন্তা কবে পাণ্ডবেবা এ নগবে যেতে বাধ্য হন। পথি মধ্যে বিদুব ম্লেচ্ছ ভাষায় যুধিষ্ঠিবকে সাবধানী বাণীব দ্বাবা তাঁদেব সতর্ক কবে দিলেন।

যখন বিদুব, ভীষ্ম ও নগববাসীবা সকলে ফিবে গেলেন, তখন কুন্তী যুধিষ্ঠিবেব নিকট এসে বললেন, ক্ষত্তা (বিদুব) অত লোকেব মধ্যে যে কথাগুলি না বলাব মত বলে গেল এবং তুমি যে বললে, "আমি সবই বুঝেছি"—আমবা তাব কিছুই বুঝতে পাবলাম না।

যদীদং শক্যমস্মাভির্জ্ঞাতুং ন চ সদোষবৎ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্বং সংবাদং তব তস্য চ ॥ (আঃ)১৪৪।৩১

—যদি তা আমাদেব বলাব মত হয এবং আমবা জানলে কোন ক্ষতি হবাব সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তোমাদেব উভযেব কথাব মর্ম আমি জানতে চাই। (যুধিষ্ঠিব চবিত্র দ্রষ্টব্য)

মাতা কুন্তী যে কত সংযত বুদ্ধিমতী ও সুবিবেচক তাঁব এ জিজ্ঞাসা তা প্রমাণ কবে। কৌতুহল তাঁব সংযমেব দ্বাবা দমিত।

রাজকন্যা, রাজরাণী, রাজমাতা কুন্তীর বারণাবতের মরণ ফাঁদের ও তারপর বনে বনে ঘুরে বেড়াবার কঠিন দুঃখপূর্ণ দিনগুলির কথা স্মরণ করলে, তাঁর জন্য সমবেদনা জাগে। কৌশল্যার জীবন এমন ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল ছিল না।

হিড়িম্বা রাক্ষসী ভীমকে স্বামী রূপে গ্রহণ করতে চাইলে, যুধিষ্ঠির ও ভীম তার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় হিড়িম্বা কুন্তীকে বলল, আমি আমার সুহৃদ, স্বজন ও স্বধর্ম—সব পরিত্যাগ করে আপনার পুত্রকে পতিরূপে বরণ করছি। এই বীর ও আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি প্রাণ ত্যাগ করব। আপনি আমাকে মুগ্ধা, ভক্তা ও অনুগতা মনে করে কৃপা করুন। (মত্বা মূঢ়েতি তন্মা ত্বং ভক্তা বানুগতেতি বা) আপনি আমার পতির সঙ্গে মিলন করিয়ে দিন। আমি দেবরূপী আমার এই ইষ্টদেবকে নিয়ে অভীষ্ট দেশে চলে যাব এবং যথা সময়ে পুনরায় তাঁকে আপনার নিকট ফিরিয়ে দেব। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন।

আমি স্বভাবে নিশাচরী নই। আমি রাক্ষসকুলের সাধ্বী কন্যা, আমার নাম সালকটঙ্কটি। আমি যুবতী ও দেবরূপিণী। আমি আপনাদের পুত্রবধূ হলে, আপনাদের সকলেরই সেবা করব এবং আপনার সব বিপদে আমি সাবধানে আপনাদের রক্ষা করব।

আমি মনে মনে চিন্তা করা মাত্রই আপনাদের গগনমার্গে বহন করতে পারবো। যদি আপনাদের দ্রুত কোথাও যেতে হয়, আমি স্বয়ং আপনাদের পিঠে করে সেখানে নিয়ে যাব। অত্যন্ত দুর্গম স্থানে সমস্ত বিপদ হতে আপনাদের রক্ষা করব।

যে উপায়ে বিপদ হতে উদ্ধার লাভ করা যায় এবং প্রাণ রক্ষা হয় ধর্মানুবর্ত্তী পুরুষ সব পরিত্যাগ করে সেই উপায়কেই অবলম্বন করে থাকে। ধর্ম পালনে সঙ্কট উপস্থিত হওয়ার নামই আপদ। এইরূপ আপৎকালে যে ধর্মকে ধারণ করে, সেই উত্তম ধার্মিক।

পূণ্যই প্রাণকে ধারণ করে, এজন্য পূণ্যকেই প্রাণদাতা বলা হয়।

যে যে উপায়ে ধর্মকে আচরণ করা চলে, তাতে নিন্দার কোন কথা নাই।

রাক্ষসযোনি সিদ্ধ দিব্যজ্ঞানবলে আমি অতীত ও অনাগত বস্তুকে দেখতে পাচ্ছি। এজন্য আমি বলছি যে আপনাদের ভাল সময় আসন্ন। আজ আপনারা নিকটবর্তী ঐ সরোবরে গিয়ে স্নান করে বনস্পতির নীচে বিশ্রাম করুন। সেখানে ব্যাসদেবের দর্শনে আপনাদের সব গ্লানি দূর হবে। অতঃপর সে কুন্তী দেবী ও পাণ্ডবদের অতীত সত্য ঘটনা কয়েকটি বিবৃত করে।

হিড়িম্বার এই সব কথা শুনে কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, যুধিষ্ঠির, এই রাক্ষসী সুন্দর ধর্মের কথা বলছে। এই রাক্ষসী ভীমের প্রতি আসক্তা। সুতরাং সে ভীমের কি অনিষ্ট করবে? যদি পুত্রোৎপত্তি পর্যন্ত ভীমের ভজনা করতে সম্মত হয়, তবে সে তার ভজনা করুক।

অতঃপর যুধিষ্ঠির কুন্তীর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন কুন্তী হিড়িম্বাকে বোলে নিলেন। অতঃপর পাণ্ডবরা কুন্তী ও হিড়িম্বাসহ শালিহোত্র মুনির সরোবরে পৌঁছলেন। সেখানে গিয়ে রাক্ষসী বনস্পতির নীচে ঝাড়ু দিয়ে পাণ্ডবদের জন্য এক পর্ণ কুটীর তৈরী করল এবং নিজের ও কুন্তীর বাসের জন্য এক কোণে একটি কুটীর তৈরী করল। পাণ্ডবরা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যা বন্দনা করে সেই সরোবরের জলপান করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মিটালেন। শালিহোত্র মুনি পাণ্ডবরা ক্ষুধার্ত জেনে ধ্যান মাত্র তাঁদের জন্য ভোজ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর পাণ্ডবরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন কুন্তী ভীমকে বললেন—

মহারাজ পাণ্ডু যেমন তোমার মান্য ছিলেন, তেমনি যুধিষ্ঠিরও তোমার মাননীয়। ধর্মানুসারে আমিও তোমার গৌরবের পাত্রী ও মাননীয়া। তুমি পাণ্ডু ও আমার হিতের জন্য আমাদের কথা শোন। পাপী ধৃতরাষ্ট্র আমাদের বিপদে ফেলেছে। হে বৃকোদর, আমাদের এই সঙ্কটের প্রতিকারের অন্য উপায় দেখছি না। কিছুদিন যাতে

আমরা এই দুর্গম স্থানে সুখে আহার বিহার করে বাস করতে পারি তার ব্যবস্থা কর। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আজ আমাদের সামনে এক ধর্ম সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। এই রাক্ষসী তোমার প্রতি আসক্তা। সে যুধিষ্ঠির ও আমার কাছে তোমাকে পতিরূপে প্রার্থনা করছে।

ধর্মের অনুরোধে তুমি একে পুত্র দাও। আমাদের উভয়ের কথার কোন প্রত্যুত্তর তোমার কাছে চাই না। ভীম মাতার আদেশ মান্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কুন্তী খুবই বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। হিড়িম্বা যদি সাধারণ রাক্ষসী হতো, তবে তিনি কখনই ভীমের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হতেন না। কিন্তু এই সঙ্কট মুহূর্তে হিড়িম্বার সাহায্যে তাঁদের উপকৃত হবার সম্ভাবনা আছে উপলব্ধি করেই এমন অবাস্তব প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ভীমকে এই বিয়ে করতে বাধ্য করেন।

ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভজাত পুত্র ঘটোৎকচ পিতামহী কুন্তীকে ও পিতৃব্যদের প্রণাম করে বলল, আমাকে কি করতে হবে আজ্ঞা করুন।

কুন্তী সস্নেহে উত্তর দিলেন—

ত্বং কুরূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ ভীমসমো হ্যসি।
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রোঽসি পঞ্চানাং সাহায্যং কুরু পুত্রক॥ (আঃ)
১৫৪।৪৩

—তুমি কুরুকুলে জন্মেছ, সাক্ষাৎ ভীমের ন্যায় শক্তিশালী তুমি এবং পঞ্চপাণ্ডবের তুমি জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং হে পুত্র, তুমি পাণ্ডবদের সাহায্য করবে।

উত্তরে ঘটোৎকচ বলল—রাবণ ও ইন্দ্রজিতের যেমন শারীরিক বল ও বীর্য ছিল, এই মর্ত্যলোকে আমারও তেমনি। হয়ত তাদের চেয়ে অধিকও হতে পারে। যখনই আমার প্রয়োজন হবে স্মরণ করলেই আমি আপনাদের জন্য তখনই উপস্থিত হব এই কথা বলে

ঘটোৎকচ বিদায় নিল।

ব্যাসদেবের পরামর্শে জতুগৃহ দগ্ধ হবার পর পঞ্চ পাণ্ডব অরণ্যে গুপ্ত ভাবে বসবাস করছিলেন। তাঁরা একাচক্রা নগরে ব্রাহ্মণ বেশে এক ব্রাহ্মণের ঘরে আশ্রয় নিলেন। এখানে তাঁরা ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

একদিন চার ভ্রাতা ভিক্ষায় বের হলে, ভীম কোন কার্যবশতঃ কুন্তীর নিকট ছিলেন। এমন সময় কুন্তী সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে ভয়ানক আর্তনাদ শুনতে পেলেন। তাদের কান্না ও বিলাপ শুনে কুন্তী তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ভীমকে বললেন—আমরা অনেক দিন এই ব্রাহ্মণের গৃহে নিরুদ্বেগে অজ্ঞাতবাস করছি। এজন্য আমার মনে হচ্ছে এদের কিছু হিত আমাদের করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করে, সেই ব্যক্তিই মহাপুরুষ। (যাবচ্চ কুর্য্যা-দন্যোঽস্য কুর্য্যাদভ্যধিকং ততঃ) সুতরাং অন্যলোকে এই বিপদে ঐ ব্রাহ্মণের যে উপকার করত, তোমাকে তার চেয়ে বেশী করতে হবে। ব্রাহ্মণের বিপদে আমরা যদি কোন উপকার করি তবে খুবই ভাল হয়।

ভীম কুন্তীকে ব্রাহ্মণদের কিরূপ বিপদ হয়েছে তা জানতে বললেন। উভয়ের মধ্যে যখন এরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল, তখন ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে পুনরায় আর্তনাদ শোনা গেল। কুন্তী দ্রুত পদে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

কুন্তী বললেন, আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি—তা জানতে পারলে, আমার সাধ্য মত তা দূর করবার চেষ্টা করব। তিনি জানতে পারলেন ঐ নগরের দুই ক্রোশ দূরে বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। সেই এই জনপদ ও নগরের প্রভু। সেই এই নগর রক্ষা করে।

বেতনং তস্য বিহিতং শালিবাহস্য ভোজনম্
মহিষৌ পুরুষশ্চৈকো যস্তদাদায় গচ্ছতি॥ (আঃ) ১৫৯।৬

—তার কর ধার্য করা হয়েছে—প্রতিদিন তার ভোজনের জন্য বিশ ধামা শালি ধানের অন্ন, দুটি মহিষ এবং একটা পুরুষ, ঐ অন্ন নিয়ে সেখানে যাবে।

প্রত্যেক গৃহস্থ একদিন করে তাকে খাবার দেয়। যদিও অনেক বৎসর পর এক গৃহস্থের পালা পড়ে, তথাপি তা দেওয়া সকলের পক্ষেই খুব কষ্টকর হয়। যদি কেউ তার ব্যতিক্রম করে তবে রাক্ষস স্ত্রী পুত্র সহ সেই পরিবারের সকলকে খেয়ে ফেলে। বস্তুতঃ পক্ষে এখানকার যে রাজা সে বেত্রকীয় গৃহ নামক স্থানে থাকে। সে এই রাক্ষসের হাত হতে রক্ষা না করায় প্রজারা শান্তিতে বাস করতে পারে না। এরূপ একজন দুর্বল কাপুরুষ রাজার রাজ্যে বাস করার জন্য প্রজাদের এত দুঃখ। সেই পালা আজ এই ব্রাহ্মণ পরিবারে। আজ এঁদের একজনকে কর স্বরূপ প্রাণ দিতে হবে। ব্রাহ্মণের এমন অর্থ নেই যে অন্য পরিবারের কাউকে ক্রয় করে পাঠাতে পারে। অথচ পরিবারের মধ্যে কাউকে ত্যাগ করতে চাচ্ছে না। তাই সপরিবারে সকলে একত্রে রাক্ষসের নিকট যাবে স্থির করছে। তবে রাক্ষস তাদের সকলকেই খাবে। এতে আর কারো কোন দুঃখ থাকবে না। কুন্তী ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তিনি তাদের পরিত্রাণের উপায় দেখতে পাচ্ছেন।

একস্তব সুতো বালঃ কন্যা চৈকা তপস্বিণী।
ন চৈতযোস্তথা পত্ন্যা গমনং তব রোচয়ে॥ (আঃ) ১৬০।২

—আপনার একমাত্র পুত্র ও একমাত্র তপস্বিণী কন্যা এবং তাদের একমাত্র জননী। এদের কারও যাওয়া আমার রুচিকর নয়।

মম পঞ্চ সুতা ব্রহ্মংস্তেষামেকো গমিষ্যতি।
ত্বদর্থং বলিমাদায় তস্য পাপস্য রক্ষসঃ॥ (আঃ) ১৬০।৩

আমার পাঁচ পুত্র আছে। এদের মধ্যে একজন তোমার দেয় কর নিয়ে সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের নিকট যাবে।

কুন্তীর এই প্রস্তাবের মধ্যে কেবল তাঁর কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পায়নি,

তাঁর উদারতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সাধারণ রমণীর পক্ষে এই রকম ত্যাগের কথা চিন্তাও অসম্ভব।

ব্রাহ্মণ উত্তরে বললেন—আমার বাঁচবার ইচ্ছা এমন নয় যে আমার জন্য কোন অতিথি ও ব্রাহ্মণের প্রাণ দিতে হবে। অধম ও অধর্ম জাতির মধ্যে এমন লোক দেখা যায় না যে ব্রাহ্মণের জন্য নিজেকে বা পুত্রকে বিসর্জন দিতে চায়। আমার পক্ষে যা ভাল তা আমাকেই বুঝে দেখতে হবে। ব্রহ্মবধ ও আত্মবধের মধ্যে আত্মবধই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবধে যে পাপ হয় তার নিস্তার নেই। অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মবধ অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেষ্ঠ। আমি অবশ্য স্বয়ং আত্মহত্যা করতে চাই না। কিন্তু অন্যে আমাকে মেরে ফেললে তাতে আমার পাপ নেই।

আগতস্য গৃহং ত্যাগস্তথৈব শরণার্থিনঃ।
যাচমানস্য চ বধো নৃশংসো গর্হিতা বুধৈঃ॥ (আঃ) ১৬০।১০

—গৃহাগত পুরুষের ত্যাগ, শরণার্থীর ত্যাগ এবং নিজের রক্ষার জন্য যে প্রার্থনা করছে, তাকে বধ—এ সবই অত্যন্ত মনীষী নিন্দিত নিষ্ঠুর কাজ।

মহাত্মারা বলেছেন—কোন রকম নিন্দিত কাজ ও নিষ্ঠুর কাজ কখনো করিবে না। বরং আমি আজ সপরিবারে মারা যাব, তথাপি আমার জন্য ব্রাহ্মণবধ আমি হতে দিতে পারি না।

কুন্তী বললেন—আমার এই বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা কর্তব্য। আপনার পুত্র যেমন আপনার প্রিয়, তেমনি আমি শত-পুত্রবতী হলেও কোন পুত্রই আমার কাছে অপ্রিয় হত না (ন চাপ্যনিষ্টঃ পুত্রো মে যদি পুত্রশতং ভবেৎ।)

তবে আমার এই পুত্র বলবান, তেজস্বী ও মন্ত্রসিদ্ধ। রাক্ষস আমার এই পুত্রকে বধ করতে সক্ষম নয়। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আমার এই পুত্র সেই রাক্ষসের কাছে ভোজনও পৌঁছিয়ে দেবে এবং নিজেকেও রক্ষা করবে। আমার এই পুত্র পূর্বে বহুবার বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বহু বলবান বিশাল শরীর রাক্ষস দেখেছে

করিনি, কিন্তু বুদ্ধিদ্বারা ধর্ম রক্ষার জন্য এইরূপ নিশ্চয় করেছি।

আজ ভীমের দ্বারা আমাদের দুটি কাজই নিষ্পন্ন হবে। একটি ব্রাহ্মণ রক্ষা, অন্যটি মহৎ ধর্মাচরণ। যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কাজে সাহায্য করে, সে উত্তম লোক পায়—এটাই আমার ধারণা। যদি কোন ক্ষত্রিয় অপর কোন ক্ষত্রিয়ের প্রাণ রক্ষা করে সে ইহলোকে বিপুলা কীর্তি ও পরলোকে মহাযশ লাভ করে। বৈশ্যের কাজে যদি কোন ক্ষত্রিয় সাহায্য করে, তবে সে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রজারঞ্জক রাজা খ্যাতি লাভ করে। যদি কোন শরণার্থী শূদ্রকে সঙ্কট হতে মুক্ত করে, তবে ধনী বংশে জন্মগ্রহণ করে। মহামতি ব্যাসদেব আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। তাই আমি এই কাজ করেছি। হিড়িম্বাকে পুত্রবধূ করা ও ভীমের জীবন বিপন্ন করে ব্রাহ্মণকে সাহায্য করা কুন্তী চরিত্রের অতি উচ্চ বৈশিষ্ট।

উপরোক্ত কথার মধ্যে কুন্তীর ধর্মজ্ঞান ও মহান্ কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মাত্র উদারতা নয়। গো ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তির প্রমাণ থেকেই তাঁর ধার্মিক চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়। মা ও ছেলের মনের প্রসারতার বৈসাদৃশ্য পাঠককে বিস্মিত করে ও নির্মম আঘাত করে।

কাশীদাসী মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন ঃ—

মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ।

— — — —

ভীম পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালো।
রাক্ষস-সংহার হবে ভীম ভুজবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তাহা সম পুণ্য বাপু না করি গনন॥
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজ্য—রক্ষা দ্বিজ—রক্ষা আর যে পৌরুষ।

হেন কর্মে কেন তুমি হইলা বিবস ॥ (আঃ)

বীর ভীম বক রাক্ষস বধ করে সাধ্বী জননীর মান রক্ষা করলেন। কেবল ব্রাহ্মণ পরিবার রক্ষা পেলো না, সমস্ত একচক্রা নগর রক্ষা পেল। বক মরল। ভীম জয় মালা পরে নতুন করে বীর আখ্যা পেলেন।

বক রাক্ষস বধ করার পর পাণ্ডবরা বিশেষ ভাবে বেদ অধ্যয়ন করতেন ও ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতেন। একদিন এক কঠোর ব্রতানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এলেন। কুন্তীও তার পুত্ররাও সেই ব্রাহ্মণের সেবা করতে থাকেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁদের নিকট নানা তীর্থ, নদী, রাজা ও নানা আশ্চর্য দেশ ও নগরের বর্ণনা করতেন। তাঁর কাছে পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল দেশে যাজ্ঞসেনীর অদ্ভুত স্বয়ংবর সভার কথাও শুনলেন।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে পাণ্ডবরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কুন্তী দেখলেন পুত্রেরা সকলেই স্বয়ংবর দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছে। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমরা এই ব্রাহ্মণের গৃহে অনেকদিন আছি এবং এই নগর দেখেও বেশ আনন্দিত হয়েছি। এখানকার বন উপবন আমরা বার বার দেখেছি। এখানে ভিক্ষাও প্রয়োজনানুরূপ পাওয়া যাচ্ছে না। যদি তুমি ভাল মনে কর চল আমরা পাঞ্চাল দেশে যাই। সেখানে রমনীয় দেশ দেখা যাবে। পাঞ্চাল দেশে অনায়াসে ভিক্ষা জুটবে এবং রাজা দ্রুপদও ব্রাহ্মণ ভক্ত তা শুনেছি। এক জায়গায় বেশী দিন থাকাও আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি না (একত্র চিরবাসশ্চ ক্ষমো ন চ মতো মম।)—যদি তুমি ভাল মনে কর, তবে আমরা সকলেই পাঞ্চাল দেশে যাবো।

অতঃপর কুন্তীর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পাণ্ডবরা সকলে পাঞ্চাল দেশে যাত্রা করলেন। পাঞ্চাল দেশে তাঁরা এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের ছদ্ম বেশে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হলেন। (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য) অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করে

দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। ভীমার্জুন বাস গৃহে প্রবেশ করে মাতাকে দেখা মাত্র আনন্দিত চিত্তে যাজ্ঞসেনীর দিকে তাকিয়ে বললেন—মা, আমরা ভিক্ষা এনেছি। (তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতৌ ভিক্ষেত্য থাবেদয়তাং নরাগ্র্যৌ)।

কুন্তী দেবী কুটিরের মধ্যে ছিলেন। তিনি পুত্রদের না দেখেই বললেন—

ভুঙ্‌ক্তেতি সমেত্য সর্বে। (আঃ) ১৯০।২

—তোমরা সকলে তা ভাগ করে ভোগ কর।

কিন্তু পরক্ষণেই কুন্তী দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে অনুতাপ করে বললেন, আমি এ কি বললাম ?

কাশীদাসী মহাভারতে অনুতপ্ত কুন্তী বলছেন—

কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম করিলা।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা॥
ভিক্ষা জানি বলি বাঁটি খাও পঞ্চজন।
কি মতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন॥
বেদের সমান হয় মায়ের বচন। (আঃ)

তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, বল দেখি এখন কি করা যায়। আমার কথাও মিথ্যা না হয় এবং পাঞ্চাল পুত্রীরও ধর্ম নষ্ট না হয় এবং অধর্মের ফলে কোন নীচ যোনি না পায়।

যুধিষ্ঠির পূর্বেই ব্যাসদেবের নিকট হতে জেনেছিলেন দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হবে। মার অজ্ঞাতে তাঁর আদেশ সত্যে পরিণত হতে চলল। তিনি ভ্রাতাদের বললেন—

সর্বেষাং দ্রৌপদী ভার্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা॥

(আঃ) ১৯০।১৬

—দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হবে।

দ্রুপদ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কুম্ভকারের গৃহে পাঠিয়ে ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী পঞ্চ পাণ্ডবের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেন। তখন দ্রুপদ রাজা

তাঁদের নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে আনলেন। আর ব্যাসদেবও দ্রুপদ রাজার নিকট এসে পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর পূর্ব জন্মকথা জানালেন এবং তাকে (দ্রুপদ) দিব্য দৃষ্টি দিয়ে পাণ্ডবদের দিব্য রূপ দেখালেন। দ্রুপদ রাজা সন্তুষ্ট হয়ে ব্যাসদেবের নির্দেশে পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর দ্রৌপদী কুন্তীকে প্রণাম করে দাঁড়ালে, তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন :—

ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রানী, অগ্নির সঙ্গে স্বাহা, চন্দ্রের সঙ্গে রোহিণী নলের সঙ্গে দময়ন্তী, নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মী যেরূপ ভক্তি বিনম্র আচরণ করেন, তুমি পতিদের সঙ্গে সেইরূপ আচরণ করবে। তুমি অনন্ত সুখী হয়ে দীর্ঘজীবী ও বীর পুত্রের জননী হও, সৌভাগ্যবতী, ভোগ সম্পন্না যজ্ঞে দীক্ষিতা এবং পতিব্রতা হও। গৃহে আগত অতিথি, সাধু, বৃদ্ধা, বালক ও গুরুজনদের যথারীতি সেবা করে তোমার দিন অতিবাহিত হোক।

কুরুজাঙ্গলমুখ্যেষু রাষ্ট্রেষু নগরেষু চ।
অনু ত্বমভিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা॥ (আঃ) ১৯৮।৯

—কুরুজাঙ্গল প্রধান রাষ্ট্র ও নগরগুলিতে তুমি রাজার সঙ্গে রাজ্ঞীপদে অধিষ্ঠিত হও এবং ধর্মের উপর তোমার স্বাভাবিক অনুরাগ হোক।

মহাবলশালী পতিদের বিক্রমে বিজিতা সমগ্র পৃথিবীকে তুমি অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণদের দান কর।

হে গুণান্বিত বধূ, পৃথিবীতে যত উৎকৃষ্ট গুণ-সম্পন্ন বস্তু আছে, সমস্তই তুমি লাভ কর এবং চিরকাল সুখে থাক। আজ তোমাকে যে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তুমি পুত্রবতী ও গুণবতী হলে তোমাকে এর অধিক অভিনন্দন জানাব।

কুন্তীর এই আশীর্বাদের মধ্যে তাঁর পুত্রবধূর প্রতি গার্হস্থ্য-ধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি সবই উল্লেখিত হয়েছে। এই আশীর্বাদের

মাধ্যমে বোঝা যায় কুন্তী কতটা শিক্ষিতা ও গুণান্বিতা ছিলেন।

কিছুকাল পাণ্ডবরা জননীসহ দ্রুপদ রাজার কাছেই রইলেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও পঞ্চ পাণ্ডবকে হস্তিনাপুরে আনালেন এবং তাঁদের ইন্দ্রপ্রস্থে অর্ধেক রাজ্য দিলেন।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেন। যুধিষ্ঠিরের যশ ও ঐশ্বর্যে ঈর্ষা পরবশ হয়ে ধৃতরাষ্ট্র শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় আহ্বান করেন। প্রথম বার দ্যূত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির তাঁর ঐশ্বর্য, রাজ্য পঞ্চ ভাই এমন কি স্ত্রী দ্রৌপদীকেও পণে হারালেন। দ্রৌপদীকে হারাবার পর কোশাকর্ষণ করে তাঁকে সভাস্থলে নিয়ে আসার বর্ণনায় কাশীদাসী মহাভারতে বলা হয়েছে—

গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ পসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লৈয়া যাবে মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় নাহিক তোমার॥ (সঃ)

যে কুলবধূকে পাশা খেলার নেশায় পুত্র পণ রেখেছে, সেই বধূর সম্ভ্রম রক্ষা করতে তাঁর পঞ্চ বীর স্বামী অপারগ হলেও, তেজস্বিনী শ্বশ্রূ মাতা কুন্তী পিছু হটলেন না। তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে এই অন্যায় প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেন।

কৌরব বীর ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপ, প্রভৃতি যদিও সভাস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা কোন প্রতিবাদ জানাননি। এক মাত্র বিদুরই এই দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাই তের বছর পরে কৃষ্ণ যখন শান্তির বা সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হস্তিনাপুরে এসেছিলেন পিতৃস্বসা কুন্তীর সঙ্গে বিদুরের গৃহে দেখা করতে আসলেন। তখন কুন্তী রাজ্য সভায় লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীর প্রতি অশিষ্ট আচরণের জন্য বিদুরের তীব্র প্রতিবাদের উল্লেখ করলেন এবং বললেন আচরণের দ্বারা

মানুষ শ্রদ্ধেয় ও পূজ্য হয়। যদিও তিনি ক্ষত্তা, তবু তিনি তাঁর আচরণের জন্য সর্বজন পূজ্য।

এখানে কুন্তী মানব চরিত্রের মূল্যায়নের নতুন মাপকাঠি রাখলেন। যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বার দ্যূত ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে রাজ্য হারিয়ে তের বছরের জন্য নির্বাসনে যেতে বাধ্য হলেন। বিদুর বৃদ্ধা কুন্তীকে পাণ্ডবদের অবর্তমানে তের বছর তাঁর কাছে রেখে যেতে বলায়,পাণ্ডবরা সানন্দে সম্মত হলেন।

বন গমনের পূর্বে দ্রৌপদী অন্তঃপুরের নারীদের নিকট বিদায় নিয়ে কুন্তীর নিকট গেলেন। দ্রৌপদীকে বনে যেতে উদ্যত দেখে কুন্তী শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা ও বিহ্বলা হয়ে পড়লেন। পরে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে তাঁকে বললেন,

হে বৎস, মহাবিপদ দেখে শোক কর না। স্ত্রীর ধর্ম কি.তা তুমি ভাল করেই জান। কারণ তুমি চরিত্রবতী ও সদাচারসম্পন্ন (শীলাচারবতী তথা) তোমাকে পতিদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি সাধ্বী ও গুণসম্পন্না। তোমার দ্বারা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়কুলই অলংকৃত হয়েছে। যাদের তুমি দৃষ্টির দ্বারা দগ্ধ করনি, সেই কৌরবরা ভাগ্যবান। যাহোক আমার মঙ্গল চিন্তায় রক্ষিত হয়ে তুমি নির্বিঘ্নে পথ গমন কর। সতী নারীরা অবশ্যম্ভাবী বিপদে কখনও বিকার গ্রস্ত হয় না। গুরুজনদের আর্শীবাদ ও ধর্মের দ্বারা রক্ষিতা হয়ে তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করবে। বনে আমার কনিষ্ঠ পুত্র সহদেবের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

দ্রৌপদী ভাই হবে বলে কাঁদতে কাঁদতে এক বস্ত্রে উন্মুক্ত কেশে অন্তঃপুর হতে বের হলেন। কুন্তী তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ে দেখলেন তাঁর পুত্ররা দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই দেহ রুরু মৃগের চর্মাবৃত সকলেই অধোমুখে শোকার্ত সুহৃদদের দ্বারা পরিবৃত। তাঁদের সেই অবস্থায় কুন্তী তাঁদের নিকট গিয়ে তাঁদের আলিঙ্গন করে কেঁদে বললেন—

তোমরা সকলেই সৎ ধর্ম, সচ্চরিত্র, সদাচার ও সৎস্থিতি প্রভৃতি গুণে ভূষিত, সকলেই উদার হৃদয়, ঈশ্বরের দৃঢ় ভক্ত, দেবগণের যজ্ঞ-পরায়ণ, তোমাদের এই বিপদ ও দৈব বিপর্যয় কি করে হল? কার কুৎসিত চিন্তা হতে এরূপ হল—এই চিন্তা করে স্থির করতে পারছি না।

স্যাৎ তু মদ্ভাগ্যদোষোঽয়ং যাহং যুষ্মানজীজনম্।
দুঃখায়াসভুজোঽত্যর্থং যুক্তানপ্যুত্তমৈর্গুণৈঃ॥ (সঃ) ৭৯।১৫

—এটা আমারই ভাগ্যদোষ। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতেই তোমরা উত্তম গুণ সম্পন্ন হয়েও এমন দুঃখ ও কষ্টের ভাগী হলে।

তোমরা বীর্য, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ ও তেজে সমৃদ্ধ হলেও ধন ও ঐশ্বর্য শূন্য হয়ে কৃশ শরীরে দুর্গম বনে কি করে বাস করবে?

যদ্যেতদেবমজ্ঞাস্যং বনে বাসো হি বো ধ্রুবম্।
শতশৃঙ্গান্মৃতে পাণ্ডৌ নাগমিষ্যং গজাহ্বয়ম্॥ (সঃ) ৭৯।১৭

—আমি যদি পূর্বে জানতে পারতাম যে তোমাদের নিশ্চিত বনবাসে যেতে হবে তাহলে রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্বত ছেড়ে এই হস্তিনাপুরে আসতাম না।

কুন্তী আক্ষেপ করে বললেন—তোমাদের পিতাই ধন্য—যিনি তপস্বী ও মেধাবী ছিলেন। এবং পুত্রদের জন্য এইরূপ দুঃখ না পেয়ে স্বর্গে গেছেন। ধর্মজ্ঞা কল্যাণী সতী মাদ্রীও ধন্যা। তিনি অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্না ছিলেন। তাই পতির সঙ্গে সহমৃতা হয়েছেন। আমাকে ধিক্।

তিনি পুত্রদের সম্বোধন করে বললেন, অতি দুঃখে তোমাদের ন্যায় সৎ পুত্রদের আমি ত্যাগ করতে পারবো না। আমিও তোমাদের সঙ্গে বনে যাব। (সাহং যাস্যামি হি বনং)

কুন্তী দুঃখে অভিভূত হয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করেছো। আমার প্রাণ নিঃশেষ হয়ে আসছে, বিধাতার কি চোখ

নাই। বিধাতা কি আমার ভাগ্যে মৃত্যু লেখেননি। এজন্যই কি আয়ু আমাকে পরিত্যাগ করছে না? হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এবং আমার নরোত্তম পুত্রদের কেন দুঃখ হতে ত্রাণ করছ না? তুমি সবার রক্ষাকর্তা এই সত্য কেন ব্যর্থ হল? আমার সর্বগুণান্বিত পুত্রদের কেন তুমি দুঃখ দিচ্ছ, কেন তুমি এদের দয়া করছ না?

সেয়ং নীত্যর্থবিজ্ঞেষু ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদিষু।
স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা॥ (সঃ) ৭৯।২৬

—নীতি ও অর্থ বিদ্যায় নিপুণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি কুলপতিগণ বর্তমান থাকতেও এরূপ আপদ কি করে আসল?

কুন্তী ও ভীষ্ম, দ্রোণাদি আচার্যদ্বয়ের উপস্থিতিতে এমন অধর্ম কর্ম কি প্রকারে সম্ভব হল সেই প্রশ্নই উত্থাপন করছেন। তিনি আরও বললেন, মহারাজ পাণ্ডু, তুমি কোথায় আছ? তুমি কি দেখছ না যে, তোমার পুত্ররা শত্রুদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে কপট দ্যূতে হেরে বনে যাচ্ছে? কি করে তুমি তা উপেক্ষা করছ?

কুন্তী চরিত্রে আর একটি বিশেষত্ব তিনি তাঁর নিজের তিন সন্তান অপেক্ষা মাদ্রী পুত্র সহদেবকে বেশী স্নেহ করতেন। তাই তিনি সহদেবকে সম্বোধন করে বললেন—সহদেব, তুমি ফিরে এসো। তুমি আমার শরীর হতেও অধিক প্রিয়। তুমি কুপুত্রের ন্যায় আমাকে ত্যাগ কর না। সত্যধর্ম পালনের জন্য অন্যান্য ভাইরা বনে যাক্, তুমি আমার কাছে থাক, আমার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা যে ধর্ম অর্জিত হবে, তুমি সেই ধর্ম লাভ কর।

নিজের সন্তানকে সকলেই স্নেহ করে—কিন্তু সপত্নী পুত্রের জন্য এইরূপ শোক অতি বিরল। সপত্নী পুত্রের প্রতি তাঁর বাৎসল্যরস অধিক প্রকাশ পেয়েছে। নাগরিকরাও কুন্তীর বিলাপে যা বলেছেন তা সমর্থন করে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

অতঃপর ক্রন্দনরতা কুন্তীকে প্রণাম করে পাণ্ডবেরা বনে চলে গেলেন। এবং বিদুর বহু শাস্ত্র ও যুক্তি দিয়ে শোকার্ত কুন্তীকে শান্ত

করে তাঁর গৃহে আনলেন।

এখানে জননী কৌশল্যা ও জননী কুন্তী উভয়ের শোকের সাদৃশ্য আছে। কৌশল্যা সধবা হয়েও স্বামী প্রেমে বঞ্চিতা, পুত্র ছিল তাঁর শেষ অবলম্বন। বিধবা কুন্তীর সব পুত্রই এক সঙ্গে বনে গমন করছেন। এর চেয়ে অধিক দুঃখ মার পক্ষে আর কি হতে পারে? কৌশল্যার মত তিনিও সন্তানদের ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে তাঁরই মত সন্তানদের সঙ্গে বনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে শোকাতুরা জননীর করুণ বিলাপ কবি সুন্দর ভাবে রূপ দিয়েছেন—

বড় ভাগ্যবান পাণ্ডু স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রদের এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধম পাপিনী॥

— — — —

লোভেতে রহিনু পুত্রগণের পালিতে।
তাহার উচিত ফল এ দুঃখ দেখিতে॥

— — — —

বিধি মোরে বন্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে॥ (সঃ)

ভাগ্যহীনা জননী সন্তানদের জন্য শোকে অভিভূত হয়ে বার বার নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছেন।'

দীর্ঘ তের বৎসর অতিক্রান্ত হলে পাণ্ডবেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৈত্রিক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষ্ণকে হস্তিনায় দূত রূপে পাঠান। সেই সময় কৃষ্ণ পিসিমা কুন্তীর নিকটে গেলেন।

কৃষ্ণকে দেখে কুন্তী তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে পুত্রদের কুশল জিজ্ঞেস করে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর কৃষ্ণের সৎকার করলেন। যখন কৃষ্ণ আতিথ্য গ্রহণে বসলেন, তখন কুন্তী

বললেন—

আমার পুত্র পাণ্ডবরা—যারা বাল্যকাল হতেই গুরুজনদের সেবায় নিরত। পরস্পর স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ, সকলের নিকট সম্মার্হ এবং সকলের প্রতি সমান ভাবসম্পন্ন, তারা শত্রুদের কপটতায় বশীভূত হয়ে রাজ্যচ্যুত হয়ে এবং জনসমাজের মধ্যে বাস করবার যোগ্য হলেও নির্জন বনে বাস করছিল।

মঙ্গলাভিলাষী আমার পুত্ররা হর্ষ ও ক্রোধ জয় করেছে। তারা ব্রাহ্মণদের মঙ্গলার্থী ও সত্যবাদী। তথাপি প্রিয়জন এবং সুখভোগকে ত্যাগ করে আমাকে ক্রন্দনরত দেখেও আমাকে ত্যাগ করে বনে চলে গেছে।

অহার্যুশ্চ বনং যান্ত সমূলং হৃদয়ং মম।
অতদর্হা মহাত্মানঃ কথং কেশব পাণ্ডবাঃ॥ (উঃ) ৯০।৭

—বনে যাবার সময় পাণ্ডবরা আমার হৃদয়কে সমূলে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে। তারা কখনও বনে বাসোপযোগী নয়, তথাপি তারা এই কষ্ট কিরূপে পেলো?

এরা বাল্যকাল হতে পিতৃহীন। আমিই তখন হতে তাদের প্রতিপালন করছি। আমাদের অবর্তমানে তারা কি ভাবে বিশাল বনমধ্যে বাস করছে? কুন্তী এক এক করে প্রত্যেক পুত্রের গুণাগুণ বর্ণনা করে তাদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন। দ্রৌপদী সম্বন্ধে তিনি বললেন—

দ্রৌপদী কুমারী কৃষ্ণা আমার সব পুত্র হতে অধিক প্রিয়। সে উচ্চকুল সম্ভূতা, অনুপম সুন্দরী ও সমস্ত সদগুণে বিভূষিতা।

পুত্রলোকাৎ পতিলোকং বৃণানা সত্যবাদিনী।
প্রিয়ান্ পুত্রান্ পরিত্যজ্য পাণ্ডবাননুকর্ষতে॥ (উঃ) ৯০।৪৪

—পুত্রলোক হতে পতিলোককে যে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাকেই বরণ করে নিয়েছে, সেই সত্যবাদিনী (দ্রৌপদী) নিজের প্রিয় পুত্রদের ত্যাগ করে পাণ্ডবের অনুসরণ করেছে।

সেই উত্তমকুলজাত সর্বকল্যাণী মহারাণী দ্রৌপদী এখন কেমন আছে? সে মহাধনুর্ধর, শৌর্যশালী, যুদ্ধ নিপুণ এবং অগ্নিতুল্য তেজস্বী পঞ্চ পতি লাভ করেছে। সেই কৃষ্ণাকেও দুঃখ ভোগ করতে হোল। চৌদ্দ বছর গত হল। আমি পুত্রাদির বিরহে সন্তপ্তা। সত্যবাদিনী দ্রৌপদীকে কতদিন দেখিনি। যদি এরূপ সদাচার ও সৎকর্ম পরায়ণা দ্রৌপদী অক্ষয় সুখ লাভ করতে না পায় তবে এটা নিশ্চয়ই করে বলা যায় যে মনুষ্য পুণ্য কর্মদ্বারা সুখলাভ করতে সমর্থ হয় না।

আমার সর্বাধিক প্রিয় দ্রৌপদীকে আমি সভা মধ্যে নিয়ে যেতে দেখলাম। এর থেকে অধিক কোন দুঃখ আমি পূর্বে কখনও পাই নাই (ন মে দুঃখতরং কিঞ্চিদ্ ভূতপূর্বং ততোঽধিকম্।) সেই সভায় এক মাত্র বিদুর ব্যতীত অন্য কেউ প্রতিবাদ জানায়নি। মানুষ নিজের সদাচারের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ হয়; ধন ও বিদ্যা দ্বারা নয়। (বৃত্তেন হি ভবত্যার্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া।) তিনি বিদুরের প্রশংসা করে আরও বললেন—

তস্য কৃষ্ণ মহাবুদ্ধের্গম্ভীরস্য মহাত্মনঃ।
ক্ষত্তুঃ শীলমলঙ্কারো লোকান বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি ॥

(উঃ) ৯০।৫৪

—হে কৃষ্ণ, মহামতি গম্ভীর স্বভাব মহাত্মা বিদুরের স্বভাবই তাঁর ভূষণ, যা সমগ্র ভুবনে ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

উপরের মন্তব্য নিশ্চয় তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়।

তিনি কৃষ্ণকে দুঃখ করে আরও বললেন—

পূর্বে দুষ্ট রাজারা যে পাশা খেলা ও মৃগয়া আরম্ভ করেছিল, তা কখনও সুখের হয়নি। সভামধ্যে কৌরবদের নিকট ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা দ্রৌপদীকে এরূপ কষ্ট দিয়েছে যে, তাতে কারও মঙ্গল হতে পারে না। সেই অপমান আমার হৃদয় দগ্ধ করছে। আমার পুত্ররা রাজ্য ত্যাগ করে বনে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে এক বছর অজ্ঞাত বাস করেছে।

এখন পর্যন্ত রাজ্য না পাওয়ায় তাদের জীবিকার ব্যাঘাত হচ্ছে। পুত্রদের সঙ্গে আমারও এইরূপ দুঃখ ভোগ হওয়া উচিত হয়নি।

দুর্যোধনেন নিকৃতা বর্ষমদ্য চতুর্দশম।
দুঃখাদপি সুখং নঃ স্যাদ্ যদি পুণ্যফলক্ষয়ঃ॥ (উঃ) ৯০।৬০

—দুর্যোধনের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে দুরবস্থার মধ্যে তাদের চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। যদি সুখ ভোগের এই অর্থ ই হয় যে, পুণ্যের ফল ক্ষয় হওয়া, তবে ত পাপের ফল স্বরূপ দুঃখ ভোগের পর আমাদেরও সুখ লাভ হওয়া উচিত।

আমার মনে পাণ্ডবদের ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কোন বিভেদ বোধ ছিল না। এই সত্যের প্রভাবে আমি নিশ্চয়ই দেখছি যে তুমি কৃষ্ণ, ভাবী সংগ্রামে শত্রুদের হত্যা করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্কট হতে মুক্ত হয়েছ এবং রাজলক্ষ্মী তোমাদেরই বরণ করেছে। পাণ্ডবদের মধ্যে এমন বহু সদ্‌গুণ আছে যাদের জন্য শত্রুরা তাদের পরাজিত করতে পারবে না।

কুন্তীর উপরের উক্তির মধ্যে এক দৃঢ় চরিত্রের মহিলার ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর সত্য, দৃপ্ত উক্তিতে করুণা ভিক্ষা নেই—আছে দাবীর উপযুক্ত যুক্তি—

তিনি কৃষ্ণকে আরও বললেন—

নৈব শক্যাঃ পরাজেতুং সর্বং হ্যেষাং তথাবিধম্।
পিতরং ত্বেব গর্হে যং নাত্মানং ন সুযোধনম্॥
যেনাহং কুন্তিভোজায ধনং বৃত্তিরিবার্পিতা।
বালাং মামর্য্যকস্তুভ্যং ক্রীডন্তীং কন্দুহস্তিকাম॥
(উঃ) ৯০।৬২—৬৩

—আমি যে কষ্ট ভোগ করছি, এর জন্য আমি নিজেকে দোষ দিচ্ছি না, দুর্যোধনকে দোষী বলে মনে করি না; কিন্তু এর জন্য আমি কেবল আমার পিতার নিন্দা করছি, যিনি আমাকে রাজা কুন্তী-ভোজের হাতে সেই ভাবে সমর্পণ করেছিলেন, যেরূপ দানী পুরুষ

সাধারণ ভিক্ষুককে ধন দান করে।

আমি তখন বালিকা ছিলাম, হাতে বল নিয়ে খেলতাম। সেই অবস্থায় তোমার পিতামহ মিত্র ধর্ম পালন করতে নিজ মিত্র কুন্তী-ভোজের হাতে আমাকে দান করেন। এইরূপ আমার পিতা ও আমার শ্বশুরও আমার সঙ্গে বঞ্চনা করেছেন, এতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার জীবন ধারণে কি লাভ?

কুন্তীর উপরোক্ত ক্ষোভ খুবই মর্মস্পর্শী। নিজের দুর্ভাগ্যকে দোষারোপ করতে গিয়ে বলছেন তাঁর পিতা বন্ধুর নিকট তাঁকে বালিকা বয়সে দত্তক দিয়েছিলেন। এজন্য কুন্তীর মনের সুপ্ত অভিমান এখানে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। আপন সন্তানকে এমন ভাবে পরকে দিয়ে দেওয়া তাঁর প্রতি দারুণ নির্মমতাই প্রমাণ করে। এর পরেই তাঁর ক্ষোভের আরও কারণ পাওয়া যায়। শ্বশুরের প্রতি তাঁর ক্ষোভের হেতু তিনি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেননি।

যথার্থই কুন্তীর দুঃখের অনেক কারণ ছিল। তাঁকে চির দুঃখিনীই বলা যায়।

Archbishop of Dublin Richard Whately বলেছেন—Woman is like the reed which bends to every breeze, but breaks not in the tempest—কথাটি কুন্তীর জীবনে প্রযোজ্য। জীবনভর ঝড় তাঁকে বার বার আঘাত করেছে ও দুমড়িয়েছে কিন্তু কখনও ভাঙতে পারেনি।

তিনি আরও বললেন—অর্জুনের জন্ম লগ্নে দৈববাণী হয়েছিল যে এই শিশু মহাসংগ্রামে কৌরবদের সংহার করে রাজ্য অধিকার করবে এবং নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করবে। সেই দৈব-বাণীতে আমি দোষ দেখছি না। ধর্মকে নমস্কার করছি। (নাহং তামভ্যসূয়ামি নমো ধর্মায় বেধসে।) যদি ধর্ম থাকে, তবে তুমি সমস্ত কামনা পূর্ণ করবে—যা দৈববাণী হয়েছিল।

ন মাং মাধব বৈধব্যং নার্থনাশো ন বৈবতা।

তথা শোকায দহতি যথা পুত্রৈর্বিনাভবঃ ॥ (উঃ) ৯০।৬৯

—মাধব, বৈধব্য, ধনক্ষয এবং জ্ঞাতিদেব সঙ্গে দিনে দিনে শত্রুতা বৃদ্ধি এসব আমাকে তেমন দুঃখ দিচ্ছে না, যেমন পুত্রবিবহ আমাকে দগ্ধ কবছে।

আজ চৌদ্দ বছব হল—আমি যুধিষ্ঠিব, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দেখতে পাচ্ছি না।

জীবনাশং প্রনষ্টানাং শ্রাদ্ধং কুর্বন্তি মানবাঃ।
অর্থতস্তে মম মৃতাস্তেষাং চাহং জনার্দন ॥ (উঃ) ৯০।৭২

—জনার্দন, যাবা প্রাণ নাশান্তে অদৃশ্য হয় তাদেব জন্যই লোকে শ্রাদ্ধ কবে। যদি মৃত্যুব অর্থ অদৃশ্য হওয়াই হয়, তবে আমাব কাছে পাণ্ডবেবা মৃত এবং আমিও তাদেব কাছে মৃত।

কুন্তী যুধিষ্ঠিব সম্বন্ধে বলে পাঠালেন—পুত্র, তোমাব ধর্মেব প্রচুব ক্ষতি হচ্ছে। তুমি তাকে বৃথা নষ্ট কব না।

পবাশ্রযা বাসুদেব যা জীবতি ধিগস্তু তাম্।
বৃত্তেঃ কার্পণ্যলব্ধায়া অপ্রতিষ্ঠৈব জ্যাযসী ॥ (উঃ) ৯০।৭৪

—বাসুদেব, অন্যেব আশ্রিতা হযে যে জীবন ধাবণ কবে, তাকে ধিক্কাব। দীনতা দ্বাবা জীবন ধারণ অপেক্ষা মৃতু ববণ কবাই শ্রেষ্ঠ।

অথো ধনয়ঞ্জং ব্রূয়া নিত্যোদ্যুক্তং বৃকোদবম্।
যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽযমাগতঃ ॥ (উঃ) ৯০।৭৫

—তুমি অর্জুনকে ও অপেক্ষাকাবী ভীমকে বলবে, যুদ্ধেব জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে। ক্ষত্রিয়া বমণী যে প্রযোজনেব জন্য পুত্রেব জন্ম দেয় সেই সুসময় উপস্থিত হযেছে।

এ সময়ে তাবা যদি যুদ্ধ না কবে তবে তাদেব জীবন ব্যর্থ হবে এবং সর্বকালেব জন্য তাদেব ত্যাগ করবে। সময় এলে তোমাদের প্রাণ ত্যাগ করতে হবে। (কালে হি সমনুপ্রাপ্তে ত্যক্তব্যমপি জীবনম্।)

নকুল সহদেবকে বলো—তোমবা প্রাণকে পণ বেখেও পরাক্রম

দেখিয়ে ভোগ কর।

বিক্রমার্ধিগতা হ্যর্থা ক্ষত্রধর্মেণ জীবতঃ।

মনো মনুষ্যস্য সদা প্রীণন্তি পুরুষোত্তম॥ (উঃ) ৯০।৭৯

—পুরুষোত্তম, ক্ষত্রিয় ধর্মে জীবন নির্বাহকারী মানুষের মনকে পরাক্রমে লব্ধ ধনই সর্বদা সন্তুষ্ট রাখে।

তুমি অর্জুনকে বলবে—তুমি দ্রৌপদীর নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। কৃষ্ণ তুমি তো জান যে ভীম ও অর্জুন ক্রুদ্ধ হলে, তারা যমরাজতুল্য হয়ে দেবতাদেরও মৃত্যু মুখে ফেলতে পারে। দ্রৌপদী যে সভায় উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিল এবং দুঃশাসন ও কর্ণ তার প্রতি যে কর্কশ বাক্য বলেছিল, এ সবই ভীমসেন ও অর্জুনের অপমান। এর যে কি ফল হবে তা তারা দেখবে। শত্রুকে সংহার না করা পর্যন্ত ভীম ক্ষান্ত হয়ো না।

রাজ্য গেছে, এতে আমার দুঃখ নেই। পাশা খেলায় পরাজয় হয়েছে এতেও কোন দুঃখ নেই। আমার পুত্রদের বনে পাঠিয়েছে তাও আমার দুঃখের কারণ হয়নি। কিন্তু আমার শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বধূকে যে এক বস্ত্রে সভায় টেনে এনেছিল এবং বর্বরদের কটু বাক্য শুনতে হয়েছে, এর থেকে অধিক দুঃখ আর আমার কি হতে পারে?

কুন্তী কেবল মাত্র স্নেহ, মায়া, মমতা ও করুণার আদর্শ নন, তিনি বীর ক্ষত্রিয়াণীও বটে। যথার্থই কুন্তীর দুঃখ কৌশল্যার দুঃখের তুলনায় অনেক বেশী। কৌশল্যাকে পরান্নশ্রয়ী থাকতে হয়নি বা দ্রৌপদীর মত সভাস্থলে গুরুজন ব্যক্তির সমীপে কৌশল্যার পুত্রবধূকে বিবস্ত্র করতে কেউ চেষ্টা করেননি। পুত্রবধূর অন্যায় নির্যাতনের ব্যথাই শ্বশ্রূমাতার অন্তরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

কুন্তীর সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাণীর মধ্যে ক্ষত্রিয়া রমণীর দৃপ্ত ও উগ্র মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর খেদোক্তি হতে এটাই প্রমাণ হয় যে তিনি জীবনে কখনও শান্তি বা সুখ পাননি।

তিনি আক্ষেপ করে আরও বললেন—

যস্যা মম সপুত্রায়াস্ত্বং নাথো মধুসূদন।
রামশ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠঃ প্রদ্যুম্নশ্চ মহারথঃ॥
সাহমেবংবিধং দুঃখং সহেঽদ্য পুরুষোত্তম্।
ভীমে জীবতি দুর্ধর্ষে বিজয়ে চাপলায়িনি॥ (উঃ) ৯০।৮৮-৮৯

—হে মধুসূদন, তুমি, বীর শ্রেষ্ঠ বলবান ও মহারথী প্রদ্যুম্ন পুত্রদের সঙ্গে কুন্তীর যারা রক্ষক, যুদ্ধে যে কখনও পলায়ন করেনি সেই বিজয়ী অর্জুন ও দুর্ধর্ষ বীর ভীমের মত যার পুত্র জীবিত, সেই আমি এরূপ দুঃখ আজ সহ্য করছি কেন?

শোকাতুরা পিসিমা কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন—পিসিমা, তোমার মত সৌভাগ্যবতী দ্বিতীয় আর কে আছে? তুমি রাজা শূরসেনের কন্যা এবং মহারাজ আজমীরের কুলবধূ। একদিন তুমি সকলের কল্যাণকারী মহারাণী ছিলে এবং তোমার পতি-দেবতা তোমাকে সর্বদা বিশেষ সম্মান করতেন।

বীরসূর্বীরপত্নী ত্বং সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।
সুখ-দুঃখে মহাপ্রাজ্ঞে তাদৃশী সোঢ়ুমর্হতি॥ (উঃ) ৯০।৯৩

—তুমি বীরপত্নী, বীর জননী ও সমস্ত সদগুণে সম্যক প্রকাশিতা। তোমার ন্যায় বিবেকবতী রমণীর সুখ ও দুঃখ নীরবে সহ্য করা উচিত।

তোমার সব পুত্রই নিদ্রা, আলস্য, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত গ্রীষ্ম—এই সবই জয় করে বীরোচিত সুখ উপভোগ করছে। তারা কখনও অল্পে তুষ্ট হয় না। কারণ তারা অত্যন্ত উৎসাহ সম্পন্ন ও মহাবলশালী। (ন তু স্বল্পেন তুষ্যেয়ুর্মহোৎসাহ—মহাবলাঃ।) মহাপুরুষদের বাক্য এই যে—

অন্তপ্রাপ্তিঃ সুখং প্রহুর্দুঃখমন্তরমেতয়োঃ॥ (উঃ) ৯০।৯৭

—অন্তিম অর্থাৎ সুখ দুঃখের অতীত স্থিতি প্রাপ্তিই হল প্রকৃত সুখ এবং সুখ দুঃখের মধ্যে স্থিতি হল দুঃখ।

পিসিমা, দ্রৌপদী ও পাণ্ডবরা তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে। তুমি

শীঘ্র দেখবে পাণ্ডবরা নীরোগ অবস্থায় তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছে। তারা শত্রুদের বধ করে সাম্রাজ্য লক্ষ্মী সম্পন্ন হয়ে সমগ্র ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হবে।

কৃষ্ণের কথা শুনে কুন্তী বললেন, কৃষ্ণ, পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর হবে এবং যা যা তাদের পক্ষে করণীয় বলে তুমি বিবেচনা কর, আমি তা অবশ্যই করব। ধর্মলোপ না করে, ছল ও কপটতা হতে দূরে থেকে সময়োচিত কাজ করতে উদ্যোগী হবে। আমি তোমাতে সত্যপরায়ণতা ও বংশমর্যাদার প্রভাব জানি। প্রত্যেক কাজের ব্যবস্থাপনায় মিত্র সংগ্রহবিষয়ে এবং বুদ্ধি ও পরাক্রমে তোমার যে অদ্ভুত প্রভাব আছে, তাও আমি জানি। আমাদের কুলে তুমিই ধর্ম, তুমিই সত্য, তুমিই মহাতপস্যা, তুমিই রক্ষক এবং তুমি পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা, সব কিছু তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত, তুমি যা কিছু বল, তা সমস্তই সত্য হয়।

অতঃপর কৃষ্ণ পিসিমা কুন্তীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে দুর্যোধনের গৃহ অভিমুখে গেলেন। পরে কৌরব সভা হতে ফিরে কৃষ্ণ যা যা ঘটেছে সমস্ত সংক্ষেপে কুন্তীকে শোনালেন। (কৃষ্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য)।

সব কথা শুনে কুন্তী কৃষ্ণকে বললেন, তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট বলবে—পুত্র, তোমার প্রজা-পালক-রূপ ধর্মের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। তুমি সেই ধর্ম পালনের অবকাশকে ব্যর্থ কর না। যেমন বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে অসমর্থ অজ্ঞ বেদ পাঠকের বুদ্ধি কেবল বেদের মন্ত্র-সমূহ আবৃত্তি করেই নষ্ট হয় এবং কেবল বেদমন্ত্র পাঠরূপ ধর্মের উপরই নজর রাখে তেমনি তোমারও বুদ্ধি কেবল শান্তি ধর্মের উপরই আবদ্ধ আছে।

স্বয়ং বিধাতা তোমার জন্য যে ধর্ম সৃষ্টি করেছেন, তুমি সেদিকে দৃষ্টি দাও। ক্ষত্রিয়রা বাহুবলের সাহায্যেই জীবিকা নির্বাহ করে। তারা যুদ্ধ করবার জন্য সৃষ্ট হয়েছে এবং প্রজাপালন ধর্মই তাদের পরম ধর্ম।

অতঃপর কুন্তী উদাহরণ স্বরূপ পুরাকালের একটি ঘটনা বিবৃত করলেন। ধনকুবের রাজর্ষি মুচুকুন্দের উপর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে একটি সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল দান করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃত হলেন। তিনি বললেন, তিনি নিজ বাহুবলে উপার্জিত রাজ্য উপভোগ করবেন। তাঁর এই প্রস্তাবে কুবের যুগপৎ প্রসন্ন ও বিস্মিত হলেন। তারপর রাজা মুচুকুন্দ নিজ বাহুবলে এই পৃথিবী ন্যায়ানুসারে জয় করে শাসন করেছিলেন।

রাজার দ্বারা রক্ষিত হয়ে প্রজারা যে সব ধর্মাচরণ করে, তার চার ভাগ ফল রাজা লাভ করে। রাজা যদি নিজে ধর্ম পালন করেন, তাহলে তিনি তার দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন এবং তিনি যদি অধর্মাচরণ করেন, তবে তাঁর নরকে গতি হয়। রাজার দণ্ডনীতি যদি রাজার স্বধর্মানুসারে ব্যবহৃত হয় তবে তাতে তিনি ব্রাহ্মণদের চার বর্ণকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। রাজা যদি ন্যায় পথে চলেন, তবে জগতে সত্যযুগ নামক উত্তমকাল আবির্ভূত হয়। (তদা কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্ততে।) রাজাই কালের কারণ। (রাজা কালস্য কারণম্)।

রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণম্॥ (উঃ) ১৩২।১৭

—রাজাই সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপর যুগের স্রষ্টা এবং চতুর্থ যুগ যে কলি, তার আবির্ভাবের কারণও হলেন রাজা।

নিজের সৎকর্ম দ্বারা রাজা অক্ষয় স্বর্গলাভ করে থাকেন। ত্রেতা যুগের প্রবৃত্তির ফলে রাজার স্বর্গ লাভ হয় বটে, কিন্তু তা অক্ষয় হয় না। দ্বাপর যুগের প্রবর্তনের ফলে রাজা যথাযথ ভাগ্যানুসারে পুণ্য ও পাপের ফল পান। কিন্তু কলি যুগের প্রবৃত্তির জন্য রাজাকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করতে হয়। ফলে রাজাকে বহু বর্ষ ধরে নরকেই বাস করতে হয়।

তিনি যুধিষ্ঠিরের উদ্দেশ্যে আরও বলে পাঠালেন—তোমার পিতা

পিতামহ যা পালন করে গেছেন, তুমি সেই রাজধর্মের দিকে দৃষ্টি দাও। তুমি যার আশ্রয় নিতে চাচ্ছ, তা রাজর্ষিদের রাজধর্ম নয়।

যুধিষ্ঠির, তোমার পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এবং কৃষিকর্ম ও তোমার যোগ্য নয়। তুমি তো অপরের ক্ষতি হতে ত্রাণ কর্তা ক্ষত্রিয়। তোমাকে তো বাহুবলের দ্বারাই জীবিকা চালাতে হবে। তোমার পৈতৃক রাজ্য শত্রুর হাতে পড়ে লুপ্ত হচ্ছে। তুমি সাম, দান, ভেদ অথবা দণ্ডনীতির দ্বারা তাকে পুণরায় উদ্ধার কর। (সাম্না ভেদেন দানেন দণ্ডেনাথ নয়েন বা।)

ইতো দুঃখতরং কিং নু যদহং হীনবান্ধবা।
পরপিণ্ডমুদীক্ষে বৈ ত্বাং স্মৃত্বামিত্রনন্দন ॥ (উঃ) ১৩২।৩৩

—এর চেয়ে আর অধিক দুঃখ কি হতে পারে যে আমি তোমাকে জন্ম দান করেও বন্ধুবান্ধবহীন সাধারণ রমণীর ন্যায় জীবিকার জন্য অপরের প্রদত্ত অন্ন পিণ্ডের উপর আমাকে নির্ভর করতে হচ্ছে।

আমেরিকার ধর্মযাজক Edwin Hubbell Chapin বলেছেন—No language can express the power and beauty and heroism and majesty of a mother's love. It shrinks not where man cowers, and grows stronger where man faints, and over the wastes of wordly fortune sends the radiance of its quenchless fidelity like a star in heaven.

এই উক্তিটি যেন কুন্তী চরিত্রের প্রতিকৃতি। কুন্তী চরিত্রের একটি প্রশংসনীয় দিক এইভাবে সন্তানদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য ক্ষাত্রধর্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ কৃষ্ণ মারফৎ তাঁর সন্তানদের কাছে পাঠানো। বিশেষ করে দুর্বল চিত্ত যুধিষ্ঠিরকে বলে পাঠিয়েছিলেন—তিনি যেন ক্ষত্রিয়ের ন্যায় পৃথিবী জয় করে প্রজাপালন করেন—এটাই হলো তাঁর ক্ষাত্রধর্ম। পৈত্রিক রাজ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য যুদ্ধ করেন—এটাই তাঁর প্রতি মাতৃ আজ্ঞা। ক্ষত্রিয়ের ধর্মই হচ্ছে বাহুবলের দ্বারা

দুর্বলকে রক্ষা করা ও নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা।

পঞ্চপাণ্ডবের মত বীর সন্তান থাকা সত্ত্বেও, রাজা পাণ্ডুর স্ত্রী ও মহারাজা যুধিষ্ঠিরেও জননীর পরান্নে জীবন ধারণ করার মত দুঃখ আর কিছু হতে পারে না। কুন্তীর জীবনে এটা কেবল দুঃখ নয়, এত বড় অপমান।

পুত্রদের যুদ্ধে প্রেরণা দানের জন্য তিনি বিদুলা নাম্নী ক্ষত্রিয়া নারীর কাহিনী বিবৃত করে পাণ্ডবদের যুদ্ধে উৎসাহিত করে পাঠান।

Victor Hugo বলেছেন—No one knows like a woman how to say things which are at once gentle and deep কুন্তী প্রসঙ্গে কথাটি খুবই প্রযোজ্য। তিনি পুত্রদের বিদুলার কাহিনী শুনিয়ে এক সুন্দর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন—যা তাঁদের মনে গভীর উদ্দীপনা জাগাল।

বিদুলা নামে এক বুদ্ধিমতী বিদুষী তেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া নারী ছিলেন। তার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধু রাজের নিকট পরাজিত হয়ে দুঃখিত চিত্তে কাপুরুষের ন্যায় উদ্যমহীন হয়ে দিনপাত করছিলেন। বিদুলা পুত্রের ক্রোধ শূন্য ক্লীবের ন্যায় জীবনের জন্য তাঁকে তিরস্কৃত করেন এবং বীরের ন্যায় শত্রু কবলিত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে উৎসাহিত করে বললেন লোকে যার মহৎ চরিত্রের আলোচনা করে না সে পুরুষ নয়। স্ত্রীও নয়, সে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মাত্র। যার দান তপস্যা শৌর্য, শিক্ষা বা অর্থের খ্যাতি নেই—তার জীবনের কি মূল্য? কুকুরের ন্যায় ঘৃণ্য জীবন অপেক্ষা সাপের দন্ত উৎপাটন করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করাও শ্রেয়। সর্বদা দীপ্ত অগ্নির মত প্রজ্বলিত থাকো। শত্রুকে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ কর। তেজহীন পুত্র ক্ষত্রিয় বংশ রক্ষা করতে পারে না।

জননীর এই দীপ্ত উক্তিতে সঞ্জয় বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, পুত্রের মৃত্যু ঘটলে সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বরী হয়েও তাঁর কি লাভ? জননী হয়ে সন্তানকে তিনি মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন কেন?

উত্তরে বিদুলা বললেন, যিনি বাহুবল আশ্রয় করে জীবন ধারণ করেন তিনিই কীর্তি ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভ করেন। তিনি পুত্রকে বলেন সিন্ধুরাজের প্রজারা রাজার প্রতি প্রসন্ন নয়। তারা সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। যদি বীরত্ব দেখাও, তবে অন্যান্য রাজারা সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা কর। সিন্ধুরাজ চিরকাল জয়ী হতে পারেন না। অমরও নয়। যুদ্ধের ফলাফল চিন্তা না করেই, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন অথবা শত্রু ক্ষয়—এ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের শান্তি লাভ হয় না।

সঞ্জয় জননীকে বললেন, তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর। তোমার হৃদয় কি কাল ইস্পাতের তৈয়েরী? আমার ধন, সহায় সম্বল নেই। কিরূপে আমি যুদ্ধ জয় করব? তুমি যদি কোন উপায় বলতে পার, তা বল।

বিদুলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বীরত্ব দেখিয়েছ, তা আবার দেখাও। তবেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। সিন্ধুরাজ যেসব নৃপতিদের শক্তিহীন ও অপমানিত করেছেন, যাঁরা তার প্রতি এই কারণে অসন্তুষ্ট তুমি তাদের সঙ্গে মিত্রতা কর। আমাদের রাজকোষে বহু ধনরত্ন আছে। তোমার অনেক সুহৃদ আছে, বিপদে যারা তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

বিদুলার হিতোপদেশ ও বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে, সঞ্জয়ের নৈরাশ্য দূর হলো। যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সিন্ধুরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন।

বিদুলার এই কাহিনীর দ্বারা কুন্তী তাঁর মনোভাব সন্তানদের নিকট প্রকাশ করলেন। তিনিও যে বিদুলার মতই তেজস্বিনী রমনী ছিলেন এই একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে Sir P. Sidney এর—একটি উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলেছেন—To the disgrace of men it is seen, that there

are women both more wise to judge what evil is expected, and more constant bear it when it is happened কুন্তী তাঁর দূরদর্শিতার দ্বারা যুদ্ধ ব্যতিরেকে পাণ্ডবদের চরম দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরিণামে তিনি যে তার যোগ্য নাতী ও অন্যান্য আত্মীয়দের হারালেন তাঁদের জন্য সেই অসহায় দুঃখও তিনি একা সহ্য করেছেন। কারণ তিনি বিধবা।

কৃষ্ণের মুখে জননী কুন্তীর এমন তেজোদীপ্ত আদেশ শুনে পাণ্ডবরা বিস্মিত হলেন ও যুদ্ধের প্রেরণা পেলেন। ভীষ্ম দ্রোণও কুন্তীর উষ্মা জড়িত এমন ধর্ম সম্মত উত্তেজক ভাষণের কথা শুনে উপলব্ধি করে ছিলেন যে পঞ্চ পাণ্ডব অবশ্যি মাতৃ আজ্ঞা রক্ষার্থে রাজ্যের জন্য যুদ্ধ করবেন।

এক্ষেত্রে কুন্তীর দীপ্ত ভাষণ অন্তর্নিহিত বহ্নি শিখার ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবের সুপ্তাচ্ছন্ন বীর্যে অগ্নি সংযোগ করতে সহায়তা করেছিল। যুদ্ধের প্রতি তাঁদের অনীহা মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্নিহিত হলো।

বিদুরের নিকট হতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানতে পেরে কুন্তী বিষন্ন হয়েছিলেন। কারণ একদিকে জ্ঞাতিবধ, অন্যদিকে রাজ্যচ্যুত সন্তানদের চির দারিদ্র্য। এই দ্বন্দ্ব যেন কুন্তীর মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। তবু পুত্রদের ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধ করতে হবে।

বহুদিনের পুঞ্জীভূত গোপন ব্যথা আজ যেন তাঁর মন উদ্বেলিত করে তুলেছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবশতঃ বিশেষ ক্ষতি করবেন না। কিন্তু যৌবনের প্রথম কলঙ্ক কর্ণই আজ তাঁর সমস্ত দুশ্চিন্তার কারণ। এই কর্ণই দুর্যোধনের সমস্ত অপকর্মের সমর্থক ও সহায়ক। কর্ণ সর্বদা পাণ্ডবদের ঈর্ষা করে। তাদের অহিত চিন্তা তার মন জুড়ে আছে। বীর্যেও সে পাণ্ডবদের সমকক্ষ, জননী হয়ে নিজের সন্তানদের মধ্যে আত্ম দ্বন্দ্ব তিনি কোন প্রকারেই চিন্তা করতে পারছিলেন না।

কুন্তী মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—

ধিগস্ত্বর্থং যৎ কৃতেঽয়ং মহান জ্ঞাতিবধঃ কৃতঃ।
বৎস্যতে সুহৃদাং চৈব যুদ্ধেঽস্মিন্ বৈ পরাভবঃ॥

(উঃ) ১৪৪।১১

—এই ধনকে ধিক্। যার জন্য আজ উভয় পক্ষই পরস্পর জঘন্য জ্ঞাতি বধ করতে উদ্যত হয়েছে। এই যুদ্ধে নিজ সুহৃদদেরও পরাজয় ঘটবে।

পশ্যে দোষং ধ্রুবং যুদ্ধে তথাযুদ্ধে পরাভবম্।
অধনস্য মৃতং শ্রেয়ো ন হি জ্ঞাতিক্ষয়ো জয়ঃ॥

(উঃ) ১৪৪-১৩

—যুদ্ধে ভয়ঙ্কর দোষ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ না হলেও আবার (পাণ্ডবদের) পরাভব হবে। যদিও নির্ধন হয়ে থাকা অপেক্ষা মৃত্যু বরণ করাই শ্রেয় তথাপি জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করে বিজয় লাভ করাকেও শ্রেয়স্কর বলে আমার মনে হচ্ছে না।

এই সব চিন্তা করে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হচ্ছে। ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবেন, এতে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে। দ্রোণাচার্য সর্বদা পাণ্ডবদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি কখনও শিষ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। ভীষ্মও নিশ্চয়ই পাণ্ডবদের প্রতি সৌহার্দ্দপূর্ণ ভাব রাখবেন।

মোহানুবর্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্।
মহত্যনর্থে নির্বন্ধী বলবাংশ্চ বিশেষতঃ॥ (উঃ) ১৪৪।১৭

—কিন্তু একমাত্র মিথ্যাদর্শী কর্ণই মোহবশতঃ সর্বদা দুর্মতি (দুর্যোধনের) অনুসরণ করছে। সেই এই পাপাত্মা সর্বদা পাণ্ডবদের দ্বেষ করে থাকে।

কর্ণ সর্বদা পাণ্ডবদের ক্ষতি করবার জন্য উদ্যত। বিশেষতঃ সে বলবান। এই কথা চিন্তা করে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, আজ আমি কর্ণের মনে পাণ্ডবদের প্রতি সৌহার্দ্যভাব জাগাবার জন্য

তার কাছে যাব এবং তার যথার্থ সম্বন্ধের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করব।

পুত্রের নিকট তার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করে কর্ণকে তার ভ্রাতাদের বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত করতে দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন।

সন্তানের মঙ্গলের জন্য মাতৃ হৃদয়ের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা তা এখানে পরিস্ফুট হয়ে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। সন্তানের মঙ্গলের জন্য কুন্তী নিজের কলঙ্কের কথা কেবল শ্বশুরের সামনেই প্রকাশ করেননি, পুত্র কর্ণর নিকটও তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

ভাগীরথী নদীর তীরে যখন কর্ণ সূর্য স্তব করছিলেন, কুন্তী তখন সেখানে গেলেন। সূর্য প্রণামান্তে কর্ণ কুন্তীকে প্রণাম করে ঈষৎ হেসে বললেন, (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য) আমি রাধা ও অধিরথের পুত্র কর্ণ। আমি আপনাকে প্রণাম করছি। আপনি এখানে কেন এসেছেন ? বলুন, আমি আপনার কি সেবা করব ?

কুন্তী বললেন—

কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন তবাধিরথঃ পিতা।
না সি সূতকুলে জাতঃ কর্ণ তদ্ বিদ্ধি মে বচঃ॥ (উঃ)
১৪৫।২

—কর্ণ, তুমি রাধার পুত্র নও, কুন্তীর পুত্র। তোমার পিতা অধিরথ নয় এবং সূতকুলেও তোমার জন্ম নয়। তুমি আমার এই কথা অবগত হও।

তারপর তিনি কর্ণর জন্ম বৃত্তান্ত তাঁকে জানালেন।

কাশীদাসী মহাভারতে কুন্তী বলেছেন—

আমার নন্দন তুমি সূর্যের ঔরসে॥
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে॥
— — — —
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন॥

যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে তুমি করহ মিলন॥
ছয় ভাই মিলি বাছা নাশ মোর দুখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্য সুখ॥ (উঃ)

কুন্তীর উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে সূর্যদেব দৈববাণী করে কুন্তীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করলেন।

কুন্তী বললেন—

স ত্বং ভ্রাতৄনসম্বুদ্ধ্য মোহাদ্ যদুপসেবসে।
ধার্তরাষ্ট্রান্ ন তদ্ যুক্তং ত্বয়ি পুত্র বিশেষতঃ॥ (উঃ)
১৪৫।৬

—পুত্র, তুমি যে নিজের ভ্রাতাদের সঙ্গে অপরিচিত থেকে মোহবশতঃ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের সেবা করছ তা তোমার যোগ্য নয়।

ধর্মশাস্ত্রে মানুষের জন্য এটাই উত্তম ফল বলে কথিত আছে যার দ্বারা তার পিতা প্রভৃতি গুরুজনগণ ও একমাত্র পুত্রের উপরই অধিক স্নেহ দৃষ্টি সম্পন্না জননী তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

অর্জুন পূর্বে যা অর্জন করেছে এবং দুষ্টরা লোভবশতঃ যা হরণ করেছে, যুধিষ্ঠিরের সেই রাজলক্ষ্মীকে তুমি দুর্যোধনদের থেকে কেড়ে নিয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভোগ কর।

কর্ণার্জুনৌ বৈ ভবেতাং যথা রাম-জনার্দনৌ।
অসাধ্যং কিং তু লোকে স্যাদ্ যুবয়োঃ সংহিতাত্মনোঃ॥ (উঃ)
১৪৫।১০

—কর্ণ ও অর্জুন উভয়ে মিলিত হয়ে সেইরূপ বলশালী হোক যে রূপ বলরাম ও কৃষ্ণ। যদি তোমরা উভয়ে প্রেমের সঙ্গে একত্রে মিলিত হও, তবে এই জগতে তোমাদের পক্ষে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকবে?

দীর্ঘকাল পর পরিত্যক্ত সন্তানের নিকট স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মাতৃত্বের দাবী নিয়ে কুন্তীর উপস্থিত হওয়ার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর স্বার্থ-

পরতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে উদ্বেগ ও আশঙ্কায় বিধুর মাতৃ হৃদয়ের কোমলতাও প্রকাশ পাচ্ছে।

পুত্রের অমঙ্গলের ভয়েই তিনি এমনভাবে নিজেকে অনাবৃত করেছেন। এমনভাবে নিজের কুমারী জীবনের কলঙ্ক শ্বশুর ও সন্তানের কাছে জীবন সায়াহ্নে সলজ্জে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সময়কার কুন্তীর মনের অবস্থা কল্পনা করাও দুরূহ।

কিন্তু কর্ণ রাজ্য লোভেও সখা দুর্যোধনকে ছেড়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে রাজী হলেন না।

হতাশায় মোহ্যমান কুন্তী অনন্যোপায় হয়ে কর্ণকে অনুরোধ করলেন—

ভ্রাতৃগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে॥ (উঃ)

কর্ণের থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে কুন্তী দেবী, যার কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, তিনি পুত্র কর্ণকে আলিঙ্গন করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

এবং বৈ ভাব্যমেতেন ক্ষয়ং যাস্যন্তি কৌরবাঃ।
যথা ত্বং ভাষসে কর্ণ দৈবঃ তু বলবত্তরম্॥ (উঃ) ১৪৬।২৫

—কর্ণ দৈবই সর্বত্র অতিশয় বলবান। তুমি যেরূপ বললে, তাই হোক এই যুদ্ধের দ্বারা কৌরবেরা ধ্বংস হোক।

তুমি চার ভ্রাতাকে অভয় দিয়েছো। যুদ্ধে অবশ্যই তাদের ক্ষতি করবে না। তোমার কল্যাণ হোক। উত্তরে কর্ণও তাহাই হোক—এই কথা বলে উভয়ে নিজ নিজ পথে চলে গেলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে পাণ্ডবরা পঞ্চ ভ্রাতা একত্রে বীর জননী কুন্তী দেবীর নিকট এলেন। কুন্তী দীর্ঘকাল পরে নিজের পুত্রদের দেখে তাদের কষ্টের কথা স্মরণ করে দুঃখে আপ্লুত হয়ে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত

করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি অস্ত্রদ্বারা আহত ক্ষত বিক্ষত পুত্রদের দেহের দিকে বারংবার দেখতে থাকেন। তিনি বার বার তাদের শরীরের উপর নানাভাবে হাত বুলিয়ে শোকার্ত হয়ে দ্রৌপদীর জন্য, যিনি সব পুত্রকেই হারিয়েছেন, শোক করতে লাগলেন। তখন তিনি দেখলেন দ্রৌপদী নিকটেই ভূতলে পতিতা রয়েছেন।

শোকাতুরা দ্রৌপদী তাঁকে বললেন আর্য্যে অভিমন্যু সহ আপনার সব পৌত্ররা কোথায় চলে গেছে? তারা দীর্ঘকাল পরে তপস্বিনী আপনাকে দেখে আপনার নিকট আসছে না কেন? নিজের পুত্রদের হারিয়ে এখন এই রাজ্যে আমাদের কোন কার্য সিদ্ধ হবে? (কিং নু রাজ্যেন বৈ কার্য্যং বিহীনানাযাঃ সুতৈর্মম।)

শোকার্ত কুন্তী রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীকে মাটির থেকে তুলে আশ্বস্ত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে নিজেও অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে গান্ধারীর নিকট গেলেন। কারণ গান্ধারীর সমদুঃখী আর কেউ ছিলেন না।

গান্ধারী বধূ দ্রৌপদী সহ কুন্তী দেবীকে বললেন, এভাবে শোকে আকুল হয়ো না। দেখ,আমিও তো শোকার্ত। আমি বুঝছি যে,সময়েরই বৈপরীত্যে প্রেরিত হয়ে এইসমগ্র জগতের বিনাশ হয়েছে,যা স্বভাবতঃই রোমাঞ্চকর। এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, সেজন্য তা ঘটেছে। যখন কৃষ্ণের সন্ধি স্থাপনে নানা অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হল, তখন বুদ্ধিমান বিদুর যা বলেছিল, এখন তাই ঘটেছে। যখন এই বিনাশ কোন রূপেই পরিহার করা সম্ভব হল না, বিশেষতঃ যখন সব কিছু সংঘটিত হয়ে সমাপ্ত হল, তখন আর তোমাদের শোক করা উচিত না। সেই সব বীর সংগ্রামে নিহত হয়েছে, অতএব তারা শোকের যোগ্য নয়। আজ যেমন আমি, তেমনি তুমিও—আমাদের উভয়কে কে আশ্বাস দেবে? আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ কুল ধ্বংস হল।

গান্ধারীর চরিত্রের একটি সুন্দর দিক এই ছত্রে ফুটে উঠেছে। গান্ধারী কত না মহীয়সী! দুর্যোধন যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে গান্ধারীর

আশীর্বাদ চাইলে গান্ধাবী অকুতোভযে বলেছিলেন—ধর্মেব জয় হোক। এখানেও সেই গান্ধাবীকে দেখা যাচ্ছে।

কুন্তী চবিত্রেও একটি সুন্দব ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। বিজযী সন্তানেব জননী হলেও তিনি দুর্দিনে গান্ধাবীকে অবজ্ঞা কবেননি। ববং পঞ্চ পুত্রহাবা পুত্রবধূ ও নিজেব সব পৌত্রকে হাবিয়ে সমবেদনাব প্রলেপে গান্ধাবীব শত পুত্র ও শত শত পৌত্র ও আত্মীয়েব বিনাশ ব্যথা উপশম কবতে এই অত্যন্ত দুঃখেব সময়েও গান্ধাবীব সম্মুখে যেতে ইতঃস্তত কবেননি।

যুধিষ্ঠিবেব নির্দেশে যুদ্ধাবসানে বিদুব যুদ্ধ ক্ষেত্রেব শবদেহগুলি দাহ কবাব ব্যবস্থা কবেন। ধৃতবাষ্টেব অনুগমন কবে, সকলেই গঙ্গায উপস্থিত হযে মৃত আত্মীয বান্ধবদেব তর্পণ কবলেন। তখন পুত্র শোকাতুবা কুন্তীব ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি নিজেব এত গোপন লজ্জা বিসর্জন দিযে অত্যন্ত দুঃখেব সঙ্গে পুত্রদেব বললেন—

যঃ স বীবো মহেষ্বাসো বথযূথপযূথপঃ ॥
অর্জুনেন জিতঃ সংখ্যে বীবলক্ষণলক্ষিতঃ।
যঃ সূতপুত্রং মন্যধ্বং বাধেয়মিতি পাণ্ডবাঃ ॥

— — — — —

স হি বঃ পূর্বজো ভ্রাতা ভাস্কবান্ময্যজায়ত ॥ (স্ত্রী)

২৭।৭-১২

—যে মহাধনুর্ধব বীব বথযূথপতিদেবও যূথপতি এবং বীবোচিত শুভ-লক্ষণ সমূহে সম্পন্ন ছিল, যাকে যুদ্ধে অর্জুন পবাজিত কবেছে। যাকে তোমরা সবাই সূতপুত্র ও বাধাপুত্র বলে জান, যে সৈন্যদেব মধ্য-ভাগে সূর্যেব ন্যায় শোভা পেত, যে পূর্বে সৈন্যদেব সঙ্গে ভাল কবে সূক্ষ্ম সমবে তোমাদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছে, দুর্যোধনেব সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে যে নিজেব পশ্চাদভাগে আকর্ষণ কবে নিযে যেতে যেতে অত্যন্ত শোভা পেত, বল ও পবাক্রমে যাব ন্যায় ভূতলে কেউ ছিল না, যে বীববব নিজেব প্রাণ পণ বেখেও ভূমণ্ডলে সর্বদা যশ উপার্জন কবেছে, সংগ্রামে

যে কখনও পশ্চাদপসরণ করেনি এবং অনায়াসে মহৎ কার্য করতে সমর্থ সেই সত্য প্রতিজ্ঞ কর্ণ তোমাদের ভ্রাতা। তোমরা তার উদ্দেশ্যে তর্পণ কর। এই কর্ণ তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভগবান সূর্যের অংশে এই বীর আমারই গর্ভে জন্মেছিল।

জন্মের সঙ্গেই এই বীরের শরীরে কবচ ও কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল। এই কর্ণ সূর্যেরই ন্যায় তেজস্বী ছিল।

কাশীদাসী মহাভারতে কুন্তী বলেছেন—

কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলে বচন॥
কন্যা কালে জন্ম হৈল আমার উদরে।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম জানাই তোমারে॥
. . . . . .
বলবান বলি দুর্যোধন নিল তারে।
পূর্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম নরপতি॥ (স্ত্রী)

কুন্তীর এই আবেদন পাঠকদের মন কেড়ে নেয়। কি করুণ, কি মর্মন্তুদ। এইভাবে কুন্তী সর্বসমক্ষে নিজেকে প্রকাশ করলেন কেবল মাতৃ হৃদয়ের পবিত্র আবেগে। যে সন্তানকে লোক লজ্জার ভয়ে তিনি নদীতে বিসর্জন দিয়েছিলেন যাকে একটি দিনের জন্য মাতৃস্নেহে স্নিগ্ধ করেননি সমাজের ভয়ে লজ্জায় দীর্ঘকাল চোখের সামনে নিজের পরিত্যক্ত সন্তানের সঙ্গে নিজের অপর সন্তানদের বিবাদ দিনের পর দিন নীরবে সহ্য করে আতঙ্কিত হয়েছেন, এর ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করে বুক কান্নায় ভেঙ্গে গেলেও তাঁর মুখ ফোটেনি। জীবনের পড়ন্ত বেলায় যে পরিত্যক্ত সন্তানের প্রতি তিনি এত অন্যায় আচরণ করেছেন, বিনা অপরাধে যে শিশুকে তিনি তার প্রকৃত মাতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত করেছেন, যে পুত্রের পরিচয় অন্য সন্তানদের

কাছে গোপন রাখায় তাঁরা তাঁকে হত্যা করেছেন—সকল প্রকার গ্লানি ও অনুতাপে দগ্ধ হয়ে এত দিনের যে দুঃসহ ব্যথা তার হৃদয়ে ঢেকে রেখেছিলেন, আজ তা তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতে দ্বিধা করলেন না বা তাঁর মন কোন বাধা মানলো না। এই আত্মগ্লানি প্রকাশে তাঁর কত লজ্জা, কত সঙ্কোচ। কিন্তু মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসে যখন মানুষ এমনিভাবে তার অতি গোপন ব্যথা সবার সামনে প্রকাশ করে হাল্কা হতে চায় এবং প্রকাশ করতে বাধ্য হয় অন্য একটি গুরুতর পরিস্থিতি নিবারণের জন্য। তেমনি নিজ কৃতকর্মের ফলে কুন্তী কর্ণকে হারিয়ে সেই ব্যথায় এমন ভাবে ভাবাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, কোন প্রকারেই তা প্রকাশ না করা পর্যন্ত যেন সোয়াস্তি পাচ্ছিলেন না।

তাঁর এই আত্মপ্রকাশের মধ্যে মাতৃত্বেরই জয় সূচিত হয়েছে। মাতৃত্বের ব্যথার কাছে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ, নিন্দা সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। মা এখানে মহীয়সী রূপে দেখা দিয়েছেন। তাই কুন্তীর এই স্বীকারোক্তিতে কলঙ্কের কালিমার চেয়ে মাতৃত্বের গৌরব উজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটে উঠেছে।

কুন্তীর কর্ণের জন্ম রহস্য গোপন করার কারণে পঞ্চ পাণ্ডবই কৃতকর্মের জন্য খুবই দুঃখিত হলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরিবারদের আনিয়ে তাদের সঙ্গে থেকে তাঁর পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করে বললেন, নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম রহস্য না জেনে তাকে পাপী আমি নিহত করিয়েছি।

অতো মনসি যদ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি॥ (স্ত্রী)

২৭।২৯

—অতএব আজ হতে রমনীদের মনে কোন কথাই গোপন থাকবে না।

এই কথা বলে যুধিষ্ঠির গঙ্গার জল হতে উঠে সমস্ত ভ্রাতাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন।

যুদ্ধান্তে সকলে রাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা করতেন। তিনি নিজের শ্বশ্রূর ন্যায় গান্ধারীর পরিচর্যা করতেন। (তথৈব কুন্তী গান্ধার্য্যাং গুরুবৃত্তিমবর্তত)

এখানেও কুন্তীর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্র দুর্যোধনের সঙ্গে চক্রান্ত করে তাঁদের দগ্ধ করে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তাঁর সেই নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ না নিয়ে, তিনি তাঁদের অনুগত থেকে তাঁদের পরিচর্যা করে তাঁর মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন।

পুত্র পৌত্রাদির শোকে তিনি এত অভিভূত হয়েছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুর যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করে অরণ্যে যাত্রা করলেন, কুন্তীও তাঁদের অনুগমন করলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি গান্ধারীর হাত ধরে যেতে যেতে যুধিষ্ঠিরকে বললেন—

মহারাজ, তুমি কখনও সহদেবের উপরে অপ্রসন্ন হইও না। সে সর্বদা আমার প্রতি ও তোমার প্রতি ভক্তিমান। সংগ্রামে সে কখনো পলায়ন করে নাই। নিজের ভাই কর্ণকেও তুমি সর্বদা মনে রাখবে। কারণ আমার দুর্বুদ্ধি বশতঃ সেই বীর যুদ্ধে নিহত হয়েছে।

আয়সং হৃদয়ং নূনং মন্দায়া মম লুত্রক।
যৎ সূর্য্যজমপশ্যন্ত্যাঃ শতধা ন বিদীর্য্যতে॥ (আশ্র)
১৬।১২

—পুত্র, অভাগিনী আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহের দ্বারা তৈরী। সেজন্যই আজ সূর্য নন্দন কর্ণকে না দেখেও তা শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না।

এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি? এটাই আমার গুরুতর দোষ যে, আমি তোমাদের নিকট সূর্য পুত্র কর্ণের পরিচয় দিইনি। তুমি ভাইদের সঙ্গে সর্বদা কর্ণের উদ্দেশ্যে উত্তম দান করবে।

সর্বদা তুমি দ্রৌপদীরও প্রিয় কাজ করবে। ভীম, অর্জুন ও

নকুলকেও সর্বদা সন্তুষ্ট রাখবে। আজ হতে কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই পড়ল। এখন আমি গান্ধারীর সঙ্গে তপস্বিনী হয়ে বনে বাস করব এবং নিজের এই শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণ সেবায় নিরত থাকব। (শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী বনে ত্বহম্।)

কুন্তীর সিদ্ধান্ত জানতে পেরে যুধিষ্ঠির দুঃখিত চিত্তে উত্তর দিলেন যে তিনি কোন প্রকারে জননীকে বনে যেতে অনুমতি দিতে পারেন না। পূর্বে যখন আমরা নগর হতে বাইরে ছিলাম, তখন আপনি বিদুলার কাহিনী দ্বারা আমায় ক্ষত্রিয় ধর্মে পালনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। অতএব আজ আমাদের ত্যাগ করে বনে গমন করা আপনার উচিত নয়। কৃষ্ণের মুখে আপনার বিচার শুনে আমি বহু রাজাকে নিহত করে এই রাজ্য ফিরে পেয়েছি।

কোথায় আপনার সেই বুদ্ধি, আর কোথায় আপনার এই বর্তমান সিদ্ধান্ত? আমি আপনার যে বিচার শুনেছি, তদনুসারে আমাদের ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করবার উপদেশ দিয়ে আপনি স্বয়ং তা হতে বিচ্যুত হতে ইচ্ছা করছেন।

আপনি আমাদের আপনার বধূদের এবং এই রাজ্য ত্যাগ করে এখন সেই দুর্গম বনে কিভাবে থাকবেন? অতএব আপনি আমাদের সঙ্গে এই রাজ ভবনেই বাস করুন।

যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে কুন্তীর দু নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠল। তবু তিনি চলতে লাগলেন। তখন ভীম বললেন, মা, যখন পুত্রদের দ্বারা বিজিত এই রাজ্য ভোগ করবার সুযোগ এলো এবং রাজধর্ম পালনের সময় এলো, তখন আপনার এইরূপ বুদ্ধি কিভাবে হল? যদি আপনি এরূপ করবেন, তবে কেন আপনি পৃথিবীর রাজাদের নিহত করালেন? আপনি কেন আমাদের ত্যাগ করে বনে যাচ্ছেন? যদি আপনি বনবাসই করবেন, তবে আপনি আমাদের এবং দুঃখ শোক-মগ্ন এই দুই মাদ্রী নন্দনকে বাল্যাবস্থায় বন হতে কেন নগরে এনেছিলেন? আপনি প্রসন্ন হোন। আপনি আমাদের ত্যাগ করে

বনে যাবেন না। বলের দ্বারা অর্জিত যুধিষ্ঠিরের এই রাজলক্ষ্মীকে আপনি উপভোগ করুন।

কুন্তী মাতৃভক্ত পুত্রদের অনুরোধ রক্ষা করলেন না। দ্রৌপদী, সুভদ্রার কান্নাও তাঁকে ফেরাতে পারল না। তিনি স্থির নিশ্চয় হয়েই ক্রন্দনরত পুত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে বনে গেলেন। পুত্ররা নিজেদের সেবকবৃন্দ ও অন্তঃপুরের রমণীদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলে, তিনি পুত্রদের বললেন—

পাণ্ডুনন্দন, তুমি যা বললে তা সত্য। পূর্বে তোমরা নানা রকম কষ্ট ভোগ করে দুর্বল হয়েছিলে, সেজন্য আমি তোমাদের যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছিলাম।

পাশা খেলায় তোমাদের রাজ্য অপহরণ করা হয়েছিল। তোমরা সুখ হতে বঞ্চিত হয়েছিলে এবং তোমারই বন্ধু বান্ধবরা তোমাকে তিরস্কার করছিল, সেজন্য আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিয়েছিলাম।

কথং পাণ্ডোর্ন নশ্যেত সন্ততিঃ পুরুষর্ষভাঃ।
যশশ্চ বো ন নশ্যেত ইতি চোদ্ধর্ষণং কৃতম্॥ (আশ্র) ১৭।৩

—পুরুষ শ্রেষ্ঠগণ, আমি চেয়েছিলাম যে পাণ্ডব সন্তানরা যেন কোন প্রকারেই বিনষ্ট না হয়, এবং তোমাদের যশও যাতে নষ্ট হতে না পারে, সেই কারণে আমি তোমাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলাম।

তোমরা সকলে ইন্দ্রের ন্যায় শক্তিশালী ও দেবতার ন্যায় পরাক্রমশালী হয়েও যাতে তোমাদের জীবিকার জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়, সেজন্য আমি সেই সব করেছিলাম।

তুমি ধর্মাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্যশালী রাজা হয়েও পুনরায় যাতে বনবাসের কষ্ট ভোগ না কর এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছিলাম।

দশহাজার হাতীর ন্যায় পরাক্রমশালী ও বিখ্যাত বলশালী ভীম যেন পরাজিত না হয়, তাই আমি যুদ্ধে উৎসাহ দিয়েছিলাম।

ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী অর্জুন যাতে দুর্বল না হয়ে পড়ে সেজন্য আমি যুদ্ধের উৎসাহ দিয়েছিলাম।

নকুল সহদেব যাতে ক্ষুধায় কষ্টভোগ না করে সেজন্য আমি তোমাকে উৎসাহ দিয়েছিলাম।

দ্রৌপদী যাতে সভামধ্যে পুনরায় বৃথা অপমানিতা না হয়, এই উদ্দেশ্যে সেই কাজ করেছিলাম।

ভীম, তোমাদের সকলের সামনে কম্পিতা পাশা খেলায় পরাজিতা রজস্বলা ও নির্দোষ অঙ্গযুক্ত দ্রৌপদীকে দুঃশাসন মূর্খতা-বশতঃ যখন দাসীর ন্যায় আকর্ষণ করেছিল তখনই আমার মনে হয়েছিল, এই কুলের পরাজয় নিশ্চিত। আমার শ্বশুরাদি সমস্ত কৌরবরা তখন নীরবে বসেছিলেন এবং দ্রৌপদী আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণকে স্মরণ করে বিলাপ করছিল। পাপী দুঃশাসন যখন আমার এই বধূর কেশাকর্ষণ করছিল, তখনই আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি সেই সময় হতে তোমাদের তেজ বৃদ্ধির জন্য বিদুলার নীতিবাক্য দ্বারা উৎসাহিত করেছিলাম। আমার ও পাণ্ডুর পুত্রদের পরই যাতে এই রাজবংশ কোন প্রকারে নষ্ট না হয় সেজন্য আমি তোমার উৎসাহ বৃদ্ধি করছিলাম।

ন তস্য পুত্রাঃ পৌত্রা বা ক্ষতবংশস্য পার্থিব।
লভন্তে সুকৃতাঁল্লোকান্ যস্মাদ্ বংশঃ প্রণশ্যতি॥

(আশ্র) ১৭।১৬

—যার বংশ নষ্ট হয়ে গেছে, সেই বংশের পুত্র বা পৌত্রগণ পুণ্য লোক পায় না। কারণ সেই বংশও নষ্ট হয়ে যায়।

আমি পূর্বে নিজের স্বামী মহারাজ পাণ্ডুর বিশাল রাজ্যের সুখ-ভোগ করেছি, মহাদান করেছি এবং যজ্ঞে বিধি-অনুসারে সোম পানও করেছি।

আমি নিজের লাভের জন্য কৃষ্ণকে পাঠাইনি। বিদুলার কাহিনী আমি তোমাদের সকলের রক্ষার উদ্দেশ্যেই শুনিয়েছিলাম। পুত্রগণ,

আমি পুত্রজিত রাজ্যের ফল ভোগ করতে চাই না। আমি তপস্যার দ্বারা পূণ্যময় পতিলোকে যেতে চাই। (পতিলোকানহং পুণ্যান্ কাময়ে তপসা বিভো।) এখন আমি নিজের এই বনবাসী শ্বশ্রূ-শ্বশুরের সেবা করে তপস্যার দ্বারা এই দেহকে শুষ্ক করব।

তুমি ভীমদের সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন কর। ধর্মে তোমার মতি থাকুক এবং তোমার হৃদয় উদার হোক্।

কুন্তীর কথা শুনে পাণ্ডবরা লজ্জিত হলেন এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে সেস্থান হতে ফিরে গেলেন। কুন্তীকে বনবাসের জন্য উদ্যত দেখে অন্তঃপুরবাসী স্ত্রী পুরুষ সকলেই কাঁদতে লাগলেন। তখন পাণ্ডবরা তাঁদের কান্নায় কুন্তীকে বনবাস হতে নিবৃত্ত করবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও বিদুরকে বললেন তাঁরা যেন কুন্তীকে বনবাস হতে নিবৃত্ত করেন। তিনি বললেন যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছে। পুত্রদের এই বিশাল রাজ ঐশ্বর্য ছেড়ে এবং পুত্রদের ছেড়ে কোন মহিলা মূর্খের মত দুর্গম বনে যায়? ইনি রাজ্যে বাস করেও তপস্যা করতে পারেন এবং মহান দান ব্রতের অনুষ্ঠানও করতে পারেন। কুন্তীর সেবা শুশ্রূষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। অতএব কুন্তী যেন গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে গান্ধারী কুন্তীকে গৃহে ফিরে যেতে বললেন।

কিন্তু ধর্মপরায়ণা কুন্তী বনে বাস করবার জন্য সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। সেইজন্য গান্ধারী তাঁকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করাতে পারলেন না। কুন্তীর এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানতে পেরে পাণ্ডবরা নিরাশ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। কুরুকুলের সমস্ত স্ত্রীরা তাঁর জন্য উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন।

কুন্তীকে যে সকলে কত ভালবাসতো এইটি তার অন্যতম প্রমাণ।

অতঃপর কুন্তী ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও গান্ধারীর সঙ্গে বন গমন করেন। ধৃতরাষ্ট্র, কুশের শয্যায় শয়ন করতেন। তাঁর পার্শ্বেই গান্ধারীর শয্যা। গান্ধারীর নিকটেই ব্রতচারিণী কুন্তী কুশাসনে শয়ন করতেন এবং

তাতেই তিনি আনন্দ পেতেন।

বল্কল ও মৃগচর্ম পরে কুন্তী গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় ব্রত পালন করতেন। গান্ধারী ও কুন্তী ইন্দ্রিয়দের নিজের অধীনে রেখে মন, বাক্য, কর্ম ও নেত্রের দ্বারাও উত্তম তপস্যায় ব্যাপৃত ছিলেন।

সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নারদ, পর্বত, মহাতপস্বী দেবল, শিষ্যদের সঙ্গে মহর্ষি ব্যাসদেব এবং অন্যান্য সিদ্ধ মণীষী ও শ্রেষ্ঠ মুনিরা আসলেন। এঁদের সঙ্গে পরম ধর্মাত্মা বৃদ্ধ রাজর্ষি শতযূপও উপস্থিত ছিলেন।

কুন্তী তাঁদের সকলের যথাযোগ্য পূজো করলেন। সেই সব ঋষি-গণও কুন্তীর সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

নারদ ধৃতরাষ্ট্রাদির তপস্যার ফল সম্বন্ধে জানালেন যে ধৃতরাষ্ট্র তপস্যার শেষে তেজসম্পন্ন হয়ে গান্ধারীর সঙ্গে সেই মহাত্মাদের গতি লাভ করবেন। তিনি কুন্তীর সম্বন্ধে বলেছিলেন—

তব শুশ্রূষয়া চৈব গান্ধার্যাশ্চ যশস্বিনী।
ভর্তুঃ সলোকতামেষা গমিষ্যতি বধূস্তব॥ (আশ্র)
২০।১৮

—তোমার ও গান্ধারীর সেবার দ্বারা তোমার এই যশস্বিনী বধূ যুধিষ্ঠিরের জননী কুন্তী নিজের পতিলোকে গমন করবে।

কুন্তী যে যথার্থ ই ধর্মপরায়ণা, সেবাব্রতী মহিলা ছিলেন উপরি উক্ত অভিমত থেকে তা প্রমাণিত হয়।

কুন্তীর জন্য পাণ্ডবরা চিন্তিত হলেন। তিনি বনে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি কিভাবে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা করছেন? হিংস্র জন্তু পরিবৃত বনে আশ্রয়হীন ও পুত্রহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র পত্নীর সঙ্গে একা কিভাবে বাস করছেন? এইসব চিন্তা করে তাঁরা উদ্বিগ্ন হলেন এবং তাঁদের দেখবার জন্য বনে যাবেন স্থির করলেন।

কুন্তীর প্রিয় সন্তান সহদেব যুধিষ্ঠিরের এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হয়ে

তাঁকে বললেন—আপনি তপোবনে যাবার জন্য উৎসুক হয়েছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমি আপনার গৌরবের কথা স্মরণ করে বনে যাবার কথা স্মরণ করে বনে যাবার কথা স্পষ্ট বলতে পারছিলাম না। আজ সৌভাগ্যবশতঃ সেই সুযোগ এসেছে। সৌভাগ্যবশতঃ আমি তপোরতা মাতা কুন্তীকে দেখতে পাব। তাপস বেশী জননীর মস্তকে জটা এবং কুশ ও কাশের আসনে শয়নে তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। (জটিলাং তাপসীং বৃদ্ধাং কুশ-কাশ পরিক্ষতাম্।) যিনি রাজ-অন্তঃপুর ও প্রাসাদে পালিত হয়েছেন, অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী ছিলেন, সেই মাতা কুন্তী এখন পরিশ্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করছেন। আমি কখন তাঁকে দেখব? মানুষদের গতি নিশ্চয়ই অনিত্য, যার জন্য রাজকন্যা কুন্তী সুখ হতে বঞ্চিত হয়ে বনে বাস করছেন। (অনিত্যাঃ খলু মর্ত্যানাঃ গতয়ো ভরতর্ষভ।)

সহদেবের কথা শুনে মহারাণী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললেন—

আমি কবে শাশুড়ী কুন্তী দেবীকে দেখবো? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তবে তাঁকে আজ দেখে আমি অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করব। তোমার বুদ্ধি সর্বদা এরূপই থাকুক। তোমার মন ধর্মেই রমণ করুক। কারণ আজ তুমি আমাদের মাতা কুন্তীকে দেখিয়ে অত্যন্ত কল্যাণভাগী করবে। অন্তঃপুরের সব বধূই বনে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। তারা সকলেই কুন্তী দেবী, গান্ধারী দেবী ও শ্বশুরকে দেখতে অভিলাষী হয়েছে।

দ্রৌপদীর কথা শুনে যুধিষ্ঠির সব সেনাপতিদের আনিয়ে এই কথা বললেন,—তোমরা সকলে বহু রথ, হস্তী ও অশ্বে সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনীকে গমন করাও। আমি বনবাসী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দেখবার জন্য যাব। এর পর রাজা রমনীদের রক্ষা কার্যে নিযুক্ত অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা দিলেন—তোমরা সকলে আমাদের নানা প্রকার বাহন ও শিবিকা গুলি সহস্র সংখ্যায় সজ্জিত কর।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভাবে পূর্ণ যান, বাজাব, দোকান, ধনাগাব, কাবীগব, ও কোষাধ্যক্ষ—এই সবই কুরুক্ষেত্র আশ্রমেব দিকে গমন করুক।

নগববাসীদেব মধ্যে যাবা মহাবাজকে দেখতে চায়, তাবা অনাবৃত হয়ে সুবক্ষিত ভাবে গমন করুক। পাকশালায় অধ্যক্ষগণ এবং বান্নাব আবশ্যক সামগ্রী সমূহ এবং নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পদার্থ আমাব যানবাহনেব দ্বাবা বহন কবিযে নিযে চল।

নগবে এই ঘোষণা কবিয়ে দাও যে আগামী কাল প্রাতে যাত্রা কবা হবে, সেজন্য যাবা যাবে, তাবা যেন বিলম্ব না কবে। পথে আমাদেব বাস কববাব জন্য আজই নানা প্রকাব গৃহ প্রস্তুত কবিযে বাখ।

এই আদেশ দিযে প্রভাত হতেই নিজেব ভ্রাতা অন্যান্য পাণ্ডবদেব সঙ্গে বাজা যুধিষ্ঠিব স্ত্রী ও বৃদ্ধদেব নিযে নগব হতে বেব হলেন। অতঃপব পাণ্ডববা পুববাসিদেব ও কুরুবংশেব স্ত্রীদেব নিযে আশ্রমেব থেকে দূবেই যানবাহন হতে নেমে পদব্রজে আসলেন। ধৃতবাষ্ট্রেব এই পবিত্র আশ্রম মনুষ্য শূন্য ছিল। এই আশ্রমে সব দিক দিয়ে মৃগয়া বিচবণ কবছিল এবং কলাব সুন্দব উদ্যান এই আশ্রমেব শোভা বর্ধন কবছিল। পাণ্ডববা যেই সেই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন, তখনই সে স্থানে নিয়ম পূর্বক ব্রত পালনকাবী বহু সংখ্যক তপস্বী কৌতূহলবশতঃ সমাগত পাণ্ডবদেব দেখবাব জন্য আসলেন।

যুধিষ্ঠিব তখন তাঁদেব প্রণাম কবে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস কবলেন কুরুবংশেব পালক আমাদেব জ্যেষ্ঠ পিতা এখন কোথায় গেছেন?

তাঁবা উত্তবে বললেন, তাঁবা যমুনায স্নান কববাব জন্য পুষ্প আনবাব জন্য এবং কলসীতে জল আনবাব জন্য গিয়েছেন।

এই খবব পেয়ে পাণ্ডববা সকলে পদব্রজে যমুনাব তীবেব দিকে গেলেন। কিছু দূব যেতেই তাঁবা তাঁদেব সকলকে আসতে দেখলেন।

সহদেব অতি দ্রুত কুন্তী যেখানে ছিলেন, সেখানে গিয়ে তাঁব চরণে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে দেখে কুন্তীব মুখও

চোখ জলে ভরে গেল। তিনি দুই হাতে পুত্রকে তুলে আলিঙ্গন করে গান্ধারীকে বললেন—

দিদি, সহদেব আপনার সেবা করবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। তারপর রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন ও নকুলকে দেখে তাঁদের নিকট গেলেন।

পুত্রহীনা গান্ধারী যাতে পুনরায় পুত্রশোকে ব্যথিত না হন, এই জন্যই তিনি সহদেব গান্ধারীর সেবা করতে এসেছে বলে তাঁর শোকার্ত অন্তরে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন। এখানে কুন্তী দেবীর উপস্থিত বুদ্ধির ও মনের প্রসারতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি পুত্রহীন দম্পতীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই পাণ্ডবরা তাঁর পায়ে পড়লেন। অতঃপর তাঁরা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে প্রণাম করলেন। কুন্তীর সান্ত্বনায় পাণ্ডবরা কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে তাঁদের সকলের হাত হতে জলপূর্ণ কলস নিজেরাই নিলেন।

অতঃপর দ্রৌপদী ও অন্যান্য কুলবধূরা গান্ধারী, কুন্তী ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন এবং তাঁরাও তাঁদের সকলকে আশীর্বাদ করে আনন্দিত হলেন। তারপর সকলে আশ্রমে উপস্থিত হলেন।

যুধিষ্ঠিরা ঋষিদের আশ্রম দেখলেন। সেখানে কলস প্রভৃতি দান করেন। তারপর তাঁরা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এসে বসলেন। তাঁদের সকলের সমীপে ঋষিদের সঙ্গে মহর্ষি বেদব্যাসও আসলেন।

মৃত বান্ধবদের শোকে ধৃতরাষ্ট্র দুঃখিত। তিনি গান্ধারী ও কুন্তী দেবীর সঙ্গে মৃত পুত্রদের দর্শনেচ্ছু হয়ে ব্যাসদেবের সকাশে এ অভিলাষ ব্যক্ত করেন।

মৃত আত্মীয় বন্ধুদের শোকে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ শুনে গান্ধারীর নতুন করে শোক দেখা দিল। কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও কুরুরাজের পুত্র বধূরাও যেন পুনরায় নতুন করে শোকাভিভূত হলেন। গান্ধারী ব্যাসদেবের সামনে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—

মহাবাজেব মৃত পুত্রদেব জন্য শোক কবতে কবতে আমাদেব আজ ষোল বছব কেটে গেল, তবুও আজ পর্যন্ত তাঁব শান্তি লাভ হল না। মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্র পুত্রশোকে সর্বদা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবেন। সাবা বাত্রিতে কখনও নিদ্রা যান না। আপনি নিজেব তপোবলে আজ সর্বপ্রকার লোক সৃষ্টি কবতে পাবেন। সুতবাং এই বাজাব সঙ্গে তাঁর পবলোকগত পুত্রদেব সাক্ষাৎকাব ঘটান।

দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণা যে আমাব সব পুত্রবধূদেব চেয়ে অধিক প্রিয়। সেই দুঃখী বধূব ভ্রাতা ও পুত্রগণ সকলেই নিহত হওয়ায় অত্যন্ত শোকার্ত। সুভদ্রা নিজেব একমাত্র পুত্র অভিমন্যুব বধে দুঃখিত হযে অত্যন্ত শোকমগ্না বয়েছে, ভূবিশ্রবাব পত্নীও স্বামী ভূবিশ্রবা পিতা ও শ্বশুব বাহ্লিক ও সোমদত্তব মৃত্যুতে শোকাপ্লুত।

আপনাব প্রসাদে এই মহাবাজ, আমি ও আপনাব বধূ কুন্তী আমবা সকলে যাতে শোকশূন্য হতে পাবি, এরূপ করুণা করুন।

যখন গান্ধাবী এই কথা বললেন, তখন ব্রত পালনে ক্ষীনা কুন্তী দেবী তাঁব মৃত তেজস্বী পুত্র কর্ণকে স্মবণ কবলেন। ব্যাসদেব কুন্তীকে দেখে দুঃখ ভাবাক্রান্ত কুন্তীকে বললেন, তোমাব যদি কিছু বলবার থাকে তোমার মনে যদি কোন বাসনা থাকে, তবে তুমি তা সবই প্রকাশ কব।

তখন কুন্তী নত মস্তকে শ্বশুব ব্যাদদেবকে প্রণাম কবে লজ্জিত বদনে নিজেব পুবাণো গুপ্ত বহস্য প্রকাশ কবলেন।

কাশীদাসী মহাভাবতে গান্ধাবীব ব্যাসদেবেব নিকট প্রার্থনা শুনে কুন্তীও করযোড়ে শ্বশুবেব কাছে কর্ণব জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত কবে বললেন—

মম মনস্কাম সিদ্ধি কব মুনিবব ॥
কর্ণ পুত্র নযনে দেখিব একবাব।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পৌত্রাদি আর ॥

— — — —

হৃদয়ের গেল মোর তবে দূর হয়॥ (আশ্র)

শ্বশুরের নিকট নিজের লজ্জার কাহিনী প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেননি। তাঁর মাতৃত্বের শোকে সামাজিক ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ সব ডুবে গেল।

কুন্তীর কথা শুনে ব্যাসদেব বললেন, তুমি যা কিছু বললে, তা সমস্তই সত্য এবং তা এরূপই হবার ছিল। (সাধু সর্বমিদং ভাব্যমেবমেতদ্ যথাত্থ মাম্) এতে তোমার কোনও অপরাধ নেই, কারণ সেই সময় তুমিও কুমারী বালিকা ছিলে। দেবতারা অণিমাদি ঐশ্বর্য সম্পন্ন। অতএব তাঁরা অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারেন।

সন্তি দেবনিকায়াশ্চ সঙ্কল্পাজ্জনয়ন্তি যে।
বাচা দৃষ্ট্যা তথা স্পর্শাৎ সংঘর্ষেণেতি পঞ্চধা॥ (আশ্র)
৩০।২২

—এরূপ বহু দেবতা আছেন যাঁরা সঙ্কল্প, বাক্য, দৃষ্টি, স্পর্শ ও সমাগম—এই পাঁচ প্রকারে পুত্র উৎপন্ন করে থাকেন।

কুন্তি, দেবধর্মের দ্বারা মনুষ্য ধর্ম দূষিত হয় না—এটা তুমি জেনো। এখন তোমার মনের চিন্তা দূর কর।

বলবানদের সব কিছুই সত্য। বলবানদের সব কাজই পবিত্র। বলবানদের সমস্ত কাজই পবিত্র। বলবানদের সব কিছুই ধর্ম ও বলবানের সব বস্তুই নিজস্ব।

সর্বং বলবতাং পথ্যং সর্বং বলবতাং শুচি।
সর্বং বলবতাং ধর্মং সর্বং বলবতাং স্বকম্॥ (আশ্র) ৩০।২৪

ব্যাসদেবের কথায় এটাই বোঝা যাচ্ছে যে কর্ণর জন্ম এই ভাবেই হবার ছিল। কুন্তীর মনে এই গোপন লজ্জার কোন কারণ নেই—তা ব্যাসদেব, দেবধর্ম ও মনুষ্য ধর্মের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। যথার্থই কর্ণর এইরূপ জন্ম ব্যতীত—কুন্তী চরিত্রে কোথাও কোন কলঙ্ক নেই। ব্যাসদেব জীবনের শেষ পর্বে কুন্তী দেবীর সারা জীবনের জ্বালা জুড়িয়ে দিলেন।

অতঃপব ব্যাসদেব ধৃতবাষ্ট্র প্রভৃতিব পূর্ব জন্মেব কথা শোনালেন (ধৃতবাষ্ট্র চবিত্র দ্রষ্টব্য) এবং তাঁব কথায় সকলে গঙ্গাতীবে গেলেন। সেখানে তাঁবা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত প্রিযজন ও বান্ধবদেব দেখতে পাবেন বললেন।

পবিত্র ও একাগ্র চিত্ত হয়ে পাণ্ডববা ধৃতবাষ্ট্র ও ঋষিদেব সঙ্গে ব্যাসদেবেব নিকট গিয়ে বসলেন। কুরুকুলেব স্ত্রীবাও একত্রে গান্ধাবীব পাশে বসলেন। নগব ও জনপদবাসী অন্যান্য সকলে বযসানুসাবে যথাযথ স্থানে বসলেন।

তাবপব ব্যাসদেব ভাগীবথীব পবিত্র জলে প্রবেশ কবে পাণ্ডব ও কৌবব পক্ষেব সমস্ত লোককে আহ্বান কবলেন। অতঃপব জলেব মধ্য হতে কৌবব ও পাণ্ডব পক্ষেব সৈন্যদেব পূর্বেব ন্যায ভয়ঙ্কব শব্দ উঠল। তাবপব ভীষ্ম ও দ্রোণাদি সমস্ত বাজাবা নিজ নিজ সৈন্য বাহিনী সহ সহস্র সহস্র সংখ্যায উজ্জল শবীবে সেই জল হতে উঠলেন। যে বীবেব যেরূপ বেশ যেরূপ ধ্বজ ও যেরূপ বাহন ছিল তাঁবা যেভাবে ছিলেন সেভাবে যুক্ত থেকে দেখা দিলেন।

সেই সময় ব্যাসদেব প্রসন্ন হয়ে নিজেব তপোবলে ধৃতবাষ্ট্রকে দিব্য নেত্র দান কবলেন। গান্ধাবীও দিব্য জ্ঞানবলসম্পন্না হলেন। তাঁবা উভযেই যুদ্ধে নিহত পুত্রদেব ও আত্মীয়দেব দেখলেন। উপস্থিত সকলেই সেই অদ্ভুত অচিন্তনীয ও বোমাঞ্চকব দৃশ্য দেখলেন।

পবলোক হতে আগত ব্যক্তিবা বাগ দ্বেষহীন হযে পবস্পবেব সঙ্গে মিলিত হলেন এবং বাত্রি শেষে পুনবায অদৃশ্য হলেন।

মৃত পুত্রদেব ও আত্মীযদেব দেখে ধৃতবাষ্ট্রেব দুঃখ শোক দূব হল। তাবপব তিনি পুনবায় নিজ আশ্রমে ফিবে এলেন। অন্যান্য মহর্ষিবা ও লোকেবা ধৃতবাষ্ট্রেব অনুমতি নিয়ে নিজ নিজ অভিষ্ট স্থানে চলে গেলেন। পাণ্ডববাও সকলে ধৃতবাষ্ট্রেব অনুগমন কবলেন। ব্যাসদেবও আশ্রমে আসলেন। অতঃপব ব্যাসদেবেব আজ্ঞায় ধৃতবাষ্ট্র পাণ্ডবদেব রাজ্যে প্রত্যাগমনেব জন্য বললেন।

যুধিষ্ঠির তখন ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—মহারাজ, আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন না। কারণ আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আমার ভ্রাতারা ও সেবকরা ইচ্ছা হলে রাজ্যে ফিরে যাক। কিন্তু আমি নিয়ম ও ব্রত পালন করতে করতে আপনার এবং দুই মাতার সেবা করব।

এই কথা শুনে গান্ধারী বললেন—পুত্র, এরূপ কথা বলো না। আমি যা বলছি, তা শোন, সমস্ত কুরুবংশ আজ তোমার অধীনে। আমার শ্বশুরের পিণ্ডও তোমারই উপর অর্পিত। অতএব তুমি যাও। তুমি আমাদের জন্য অনেক করেছো। তুমি আমাদের সম্পূর্ণ রূপে সেবা শুশ্রূষা করেছ। এই সময় মহারাজ যা বলেছেন, তা কর। কারণ পিতার বাক্য পালন করা তোমার কর্তব্য।

গান্ধারী এই কথা বললে, যুধিষ্ঠির সাশ্রুনয়নে রোরুদ্যমানা জননী কুন্তীকে বললেন—মা, রাজা ও মাতা গান্ধারী আমাকে রাজধানীতে যেতে আদেশ করেছেন। কিন্তু আমার মন আপনার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। যাবার কথা শুনেই আমি দুঃখিত হয়ে পড়ছি। সুতরাং আমি এই অবস্থায় কিভাবে যাব? আমি আপনার তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাই না। কারণ তপস্যা হতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। তপস্যা করলে পরম ব্রহ্ম পরমাত্মাকেও লাভ করা যায়। আমার মনও এখন পূর্বের ন্যায় রাজকার্যে আসক্ত থাকতে ইচ্ছুক নয়। সর্বতোভাবে তপস্যাতেই সে অনুরক্ত আছে। এই সমগ্র পৃথিবী এখন আমার কাছে শূন্য। আমার বান্ধবরা নিহত হয়েছে, এখন আমার নিকট আর পূর্বের ন্যায় সৈন্য বলও নেই।

আমি এখন ধর্ম সম্পাদন করতে চাই, ধনের জন্য নয়। আপনি আমাদের সকলকে কল্যাণময়ী দৃষ্টিতে দেখুন। কারণ আপনার দর্শন আমাদের এখন দুর্লভ। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত কঠোর ও অসহ্য তপস্যা আরম্ভ করবেন।

একথা শুনে সহদেব অশ্রুপূর্ণ স্বরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমি জননীকে ছেড়ে যেতে চাই না। আপনি শীঘ্র প্রত্যাবর্তন করুন। আমি

এখানে থেকেই তপস্যা করব। আমি মহারাজ ও দুই মাতার চরণ সেবাতেই অনুরক্ত থাকতে ইচ্ছুক।

সহদেবের জননীর প্রতি এই যে আকর্ষণ তার থেকেই উপলব্ধি হয় সপত্নী পুত্রের প্রতি কুন্তীর কতটা অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। যার জন্য সহদেব তাঁকে এতটা ভালবাসতেন।

উত্তরে কুন্তী সহদেবকে আলিঙ্গন করে বললেন, পুত্র, এরূপ কথা বল না। তুমি আমার কথা শোন এবং এখান থেকে গৃহে যাও। পুত্রগণ তোমাদের পথ মঙ্গলময় হোক এবং তোমরা সর্বদা সুস্থ থেকো। (আগমা যঃ শিবাঃ সন্তু স্বস্থা ভবত পুত্রকাঃ)।

তোমরা থাকলে আমাদের সকলের তপস্যার বিঘ্ন হবে। আমি তোমাদের স্নেহপাশে বদ্ধ হয়ে উত্তম তপস্যা হতে বঞ্চিত হব। অতএব পুত্র, তুমি গমন কর। এখন আমাদের আয়ু আর অল্পই অবশিষ্ট আছে।

এইভাবে অনেক কথা বলে বুদ্ধিমতী কুন্তী সহদেবও বিশেষভাবে যুধিষ্ঠিরের মনকে শান্ত করলেন। মাতা কুন্তীর আদেশ পেয়ে তাঁদের প্রণাম করে সকলে বিদায় নিলেন। কুন্তীও সন্তানদেরও পুত্র বধুদের আলিঙ্গন করে তাঁদের মস্তক আঘ্রাণ করলেন। দ্রৌপদীদের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

দুই বছর পর যুধিষ্ঠির মহর্ষি নারদের নিকট হতে জানতে পারলেন হরিদ্বারের নিকট এক গভীর অরণ্যে যোগাসনে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী উপবেশন করে দাবানলে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

মৃত্যুর পূর্বে তাঁরা খুবই কঠোর তপস্যা করতেন। গান্ধারী কেবল জলপান করতেন। কুন্তী একমাস উপবাস অন্তে একদিন ভোজন করতেন। একদিন প্রচণ্ড হাওয়ায় যে অরণ্যে তাঁরা থাকতেন, সেই অরণ্যে দাবাগ্নি জ্বলে উঠে। উপবাসের জন্য তাঁরা শারীরিক দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁদের পক্ষে ঐ বন ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং তাঁরা সকলেই সেই দাবাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন। নারদের নিকট হতে

সাধন করার ব্রত বেছে নিয়েছিলেন।

প্রথম জীবনের মাতৃত্বের গর্ব কুন্তী প্রকাশ্যে উপভোগ করতে না পারার গ্লানিতে আপন সন্তানকে পরিত্যাগ করে ছিলেন। সেই পুত্রের মৃত্যুই তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। এবং এইজন্য তিনি পুত্রদের এত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের সঙ্গে অরণ্যে কৃচ্ছ্র সাধন করে তপস্যা করে দেহত্যাগ করেছিলেন।

কৌশল্যা কুন্তী উভয়েই ধার্মিকা মহিলা ছিলেন। উভয়েই দেব সেবায় জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। কুন্তী জীবনের শেষাংশ তপস্যা করে মৃত্যু বরণ করেছেন।

কৌশল্যার ন্যায় কুন্তীও সপত্নী পুত্রকে নিজের সন্তান তুল্য স্নেহ করতেন। তাই মহাভারতে স্থানে স্থানে কুন্তীকে পাণ্ডবদের বন গমন কালে বা নিজের বানপ্রস্থ যাত্রাকালে দ্রৌপদীর উপর সপত্নী পুত্র সহদেবের সমস্ত দায়িত্ব দিয়েছেন। কৌশল্যার মত কুন্তীও ধৈর্যশীলা তাই নিজের চোখের সামনে ধার্মিক পুত্রদের ও পুত্রবধূকে লাঞ্ছিত হতে দেখেও নীরব দ্রষ্টা হয়েছিলেন।

কুন্তীর প্রসঙ্গে Dublin এর Achbishop Richard Whatelyর উক্তি স্মরণীয়—Woman is like the reed which bends to every breeze, but breaks not in the tempest. জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন দুঃখে ব্যথায় বেদনায়। কিন্তু জীবনের চরম ঝড় যখন উঠলো কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ তখন তিনি নিজেকে অকম্পিত প্রদীপ শিখার মতই নিশ্চল, স্থির, ধীর ছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং সেই মহাবিপদের মুখে নিজেই সন্তানদের এগিয়ে যাবার প্রেরণা জুগিয়ে ছিলেন।

কুম্ভকর্ণ ও ভীম

Oh ! it is excellent to have a giant's strength ; but it is tyranous to use it like a giant—Shakespeare.

অসুর শক্তির অধিকারী হওয়া আশীর্বাদ, কিন্তু অসুরের মত শক্তির অপব্যবহার যথেচ্ছাচার। রামায়ণে কুম্ভকর্ণ ও মহাভারতে ভীম উভয়েই বিক্রমে অসুরের মত। কুম্ভকর্ণ দুরাচারী। কারণ নিরাপরাধ মুনি ঋষিদের হত্যা করে কুম্ভকর্ণ তাঁর ভোগ্য বস্তু জ্ঞানে তাঁদের ভোজন করতেন, কিন্তু ভীমের বিরুদ্ধে এরূপ ঘৃণ্য অভিযোগ কখনো ছিল না।

কুম্ভকর্ণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কৈকসী ও বিশ্রবার দ্বিতীয় সন্তান। ভীম মহাভারতের কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্র, পাণ্ডুর অন্যতম ক্ষেত্রজ সন্তান। ভীমের অন্য পরিচয় পবন নন্দন। কারণ ভীম পবন ও কুন্তীর পুত্র।

আকৃতিতে উভয়েই ভীষণকায়। উভয়েই শুধু ভোজন বিলাসীই ছিলেন না। উভয়ের ক্ষিদে ছিল উদ্ভট। বৃক নামক অগ্নি ভীমের জঠরে ছিল বলে ভীমের অপর নাম বৃকোদর। বীরত্বেও দুজন কম ছিলেন না।

কুম্ভকর্ণ ধার্মিক মহর্ষিদের ভক্ষণ করতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে একদা তাঁকে বর দিতে উদ্যত হলে, তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে সাবধান করে বললেন, এই রাক্ষস সাতজন অপ্সরা, ইন্দ্রের দশজন অনুচর ও বহু ঋষি ও মনুষ্যকে ভক্ষণ করেছে। রাক্ষসকে বর দিলে সে ত্রিভুবন প্রাণী শূন্য করবে। আপনি এই রাক্ষসকে বর দানের ছলে তাকে মোহাবিষ্ট করুন। তখন ব্রহ্মা সরস্বতী দেবীকে নির্দেশ দিলেন—তিনি যেন কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হয়ে কুম্ভকর্ণকে দিয়ে জন কল্যাণকর বর প্রার্থনা করান।

সরস্বতী দেবীও ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে কুম্ভকর্ণের জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হলেন। তখন ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। কুম্ভকর্ণও অনেক বৎসর ব্যাপী নিদ্রাচ্ছন্ন থাকার বর প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা বললেন, তথাস্তু।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত হতেই কুম্ভকর্ণ তাঁর অমিত বিক্রম কিরূপে ব্যবহার করতেন তার আভাস পাওয়া যায়। ভীমকে এরূপ কোন দুরাচারের জন্য অভিযুক্ত করা যায় না। তাঁর কীচক বধ সময় ও অবস্থা উপযোগী ও সমর্থন যোগ্য।

আসুরিক শক্তির অধিকারী ব্যতীত কুম্ভকর্ণ ও ভীমের মধ্যে তেমন কোন সাদৃশ্য নেই। ভ্রাতৃ প্রীতিও দুজনের সমান ছিল। উভয়ের পরাক্রমের উপরই তাঁদের আত্মীয়রা অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন।

কুম্ভকর্ণ নিজের ইন্দ্রিয় সংযম করে প্রতিদিন ধর্মমার্গে অবস্থান করতেন। তিনি গ্রীষ্মকালে অগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে পঞ্চঅগ্নিসাধ্য তপস্যা করতেন। আবার বর্ষাকালে অনাবৃত স্থানে বীরাসনে বর্ষা ধারায় স্নাত হতেন এবং শীতকালে নিত্য জলমধ্যে আশ্রয় নিতেন। এইরূপে সৎপথে থেকে এবং ধর্মাচরণে যত্নশীল কুম্ভকর্ণ দশ হাজার বছর অতিক্রম করেন।

বিরাটাকৃতি কুম্ভকর্ণের কখনও আহারে তৃপ্তি আসত না। তিনি এক সঙ্গে রাশি রাশি মৃগ মহিষ বরাহের মাংস খেতেন। বহু শোণিত পূর্ণ কলস পান করতেন। তিনি অত্যন্ত প্রমত্ত ছিলেন। ধার্মিক মহর্ষিদের ভোগ করে তিনি ত্রিলোক বিচরণ করতেন। তাঁর আকৃতি প্রকৃতি বিচার করলে ইংরেজ ব্যঙ্গ লেখক সুইপটের লিখিত গালিভারের গল্প মনে পড়ে। গালিভারের বিরাট আকৃতি যেমন লিলিপুটদের প্রকাণ্ড বিস্ময় জাগিয়েছিল, কুম্ভকর্ণ কি তেমনি তাঁর সমকালীন সব নীচতা, হীনতা, দীনতার উর্দ্ধে এক বিরাটকায় রাক্ষস। গালিভারের ন্যায় কুম্ভকর্ণের আকৃতি সকলকে বিস্মিত করেছিল।

এ প্রসঙ্গে কুম্ভকর্ণের ব্রহ্মার নিকট অনেক বছর নিদ্রাচ্ছন্ন থাকার

এক অদ্ভুত বর প্রার্থনা করা বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। তিনি কি তাঁর সময়কার সব পাপ তাপ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন বা তার থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকতে চেয়েছিলেন? কারণ ক্ষুধার দাবী মিটাতে কুম্ভকর্ণ খাদ্যের কোন বাছ বিচার করেনি—মুনি, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব, নিজ পক্ষের বা শত্রু পক্ষের যোদ্ধাদের ধরে ধরে খেয়েছেন। অর্থাৎ যারে পাই—তারে খাই এই স্বৈরাচার তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু দশাননের মত নষ্টামি দুষ্টামি স্বৈরতা উশৃঙ্খলতা তাঁর চরিত্রে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মা তাঁকে প্রার্থিত বর দিলেন এবং কুম্ভকর্ণের সম্বিত ফিরে আসলে তিনি এই বরের জন্য অনুতপ্ত হন। রাবণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা পরে বলেছিলেন যে কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রাচ্ছন্ন থেকে মাত্র একদিন জাগ্রত থাকবেন।

বাল্মীকি রামায়ণে কবি বলেছেন—কুম্ভকর্ণ অগ্রজ রাবণকে বললেন, রাজন, আমি নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর। আমার শয়নের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দিন।

রাজা রাবণ বিশ্বকর্মার মত এক দক্ষ শিল্পীকে দিয়ে আয়তনে দু যোজন ও বিস্তারে এক যোজন এক মনোরম গৃহ নির্মাণ করে দিলেন। সেই গৃহের সিঁড়িগুলি বৈদূর্যমণির, চারদিক কিঙ্কিণীজালে সুশোভিত, প্রবেশ তোরণ হাতীর দাঁতে নির্মিত এবং বজ্র ও স্ফটিক মণি নির্মিত বেদী ঐ গৃহের শোভা বর্দ্ধন করছিল। মেরুপর্বতের গুহার ন্যায় অনিত্য সুখদায়ক ও মনোরম। কুম্ভকর্ণ সেই গৃহমধ্যে বহু সহস্র বৎসর নিদ্রাভিভূত হয়ে রইলেন। কুম্ভকর্ণ এইরূপ নিদ্রাবিষ্ট হলে দশানন বাধাহীন হয়ে দেবতা, ঋষি ও যক্ষ গন্ধর্বদের নিপীড়ন ও বধ করতে লাগলেন। দেবতাদের নন্দনকানন প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন।

কুম্ভকর্ণের প্রগাঢ় নিদ্রাচ্ছন্নতা দশাননের স্বৈরাচার উশৃঙ্খলতার সুযোগ করে দিয়েছিল। তিনি নিরঙ্কুশ হয়ে তাঁর দানবীয় উশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন এবং কুম্ভকর্ণ দশাননের এ ঘৃণ্য জীবন সম্বন্ধে

অজ্ঞ থেকে গেলেন। কবি কুম্ভকর্ণকে এভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন কেন? রাবণের পাপের ভরাডুবি ঘটাবার জন্য কি?

বিরোচনপুত্র বলীর দ্রৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সঙ্গে কুম্ভকর্ণের বিয়ে হয়েছিল। কুম্ভকর্ণের দুটি পুত্র ছিল—কুম্ভ ও নিকুম্ভ। উভয়েই লঙ্কা যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

লঙ্কায় রাম—রাবণের যুদ্ধের পূর্বে কুম্ভকর্ণকে কয়েকটি যুদ্ধে আত্মীয়দের সাহায্য করতে দেখা যায়। কুম্ভকর্ণদের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবানের কন্যা কুম্ভনসীকে মহাবলী রাক্ষস মধু লঙ্কায় এসে মন্ত্রীদের নিহত করে হরণ করে। বিভীষণ তখন জলে তপস্যারত ছিলেন। কুম্ভকর্ণ তখন নিদ্রামগ্ন ও মেঘনাদ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যস্ত। রাবণও তখন পরদার হরণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বিভীষণের নিকট এই সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে মধু রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন—আমার রথ শীঘ্র প্রস্তুত কর। অন্যান্য বীররা যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হও। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ এবং যে সব প্রধান রাক্ষস আছে তারা বিবিধ অস্ত্রধারণ করে স্ব স্ব বাহন আরোহণ করুক। ইন্দ্রজিৎ সমস্ত সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তাদের আগে। রাবণ সেই সৈন্যদের মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ তাদের পিছনে পিছনে গেলেন। বিভীষণ ধর্মকর্ম করতে লঙ্কাতেই রইলেন। ভগ্নী কুম্ভীনসীর অনুরোধে তাঁরা তার পতি রাক্ষস মধুকে ক্ষমা করলেন।

রাবণ পুত্র মেঘনাদের সঙ্গে ইন্দ্র পুত্র জয়ন্তর যখন যুদ্ধ হয় কুম্ভকর্ণ নানারির অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তখন তিনি কার পক্ষে কার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তা বুঝা যাচ্ছিল না। (নাজ্ঞায়ত তদা রাজন যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত।) অর্থাৎ মদ্য পানে মত্ত অবস্থায় শত্রু মিত্র উভয় সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ঐ রাক্ষস (কুম্ভকর্ণ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দন্তদ্বারা, পদদ্বারা হস্ত ও ভুজদ্বারা (অর্থাৎ হাতের চড় দিয়ে কিংবা ঠেলা দিয়ে বা কনুই এ গুঁতো দিয়ে) এবং শক্তি, তোমর ও মুদ্গর যখন যা সম্ভব তা দিয়েই

দেবতাদের প্রহার করতে লাগলেন।

কুম্ভকর্ণ মহা ভয়ঙ্কর রুদ্রদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই যুদ্ধে রুদ্ররা তাঁর সর্বাঙ্গ এমন ক্ষত বিক্ষত করে দিলেন যে একটু স্থানও অক্ষত রইল না।

বভৌ শস্ত্রাচিততনুঃ কুম্ভকর্ণঃ ক্ষরন্নসৃক্।
বিদ্যুৎস্তনিতনির্ঘোষো ধারাবানিব তোয়দঃ॥ (উঃ) ২৮।৩৭

—কুম্ভকর্ণের শরীর অস্ত্রে পরিব্যাপ্ত হলে শোণিত ধারা প্রবাহিত হল। ঐ সময় তাঁকে বিদ্যুৎ ও গর্জনযুক্ত জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

বীর কুম্ভকর্ণের আর কোন গাথা রামায়ণে পাওয়া যায় না। শেষ গাথা রাম রাবণের যুদ্ধে রাবণের পক্ষে কুম্ভকর্ণের প্রচণ্ড যুদ্ধ।

সীতাকে হরণ করে আনার পর রাম যখন সেতু বন্ধন করে, বানর সেনা নিয়ে সীতা উদ্ধারের জন্য আসছেন খবর পেলেন, তখন রাবণ নগর রক্ষার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করতে, সীতার প্রতি তাঁর আসক্তির এবং এজন্য সীতাকে হরণের কথা তাঁর সভাসদদের জানালেন। এবং কার্য্য নির্দ্ধারণের জন্য তাদের পরামর্শ চাইলেন। সেই সভায় কুম্ভকর্ণও ছিলেন।

রাবণ বলেছিলেন, আমি যে কাজ করি প্রথমে তোমাদের সমর্থন নিয়ে থাকি। কারণ কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত থাকে বলে তাকে কোন কিছু বলতে পারি না।

অয়ং হি সুপ্তঃ ষন্মাসান্ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
সর্বশাস্ত্রভৃতাং মুখ্যঃ স ইদানীং সমুত্থিতঃ॥ (যু ১২-১১)

—সমস্ত শাস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবলবান এই কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রিত থাকে, অধুনা সে জাগরিত হয়েছে।

অতঃপর তিনি সীতা হরণ, সীতার প্রতি তাঁর আসক্তি, রাম লক্ষ্মণ বহু জলজন্তু ও মৎস্যাদি সমাকুল অলঙ্ঘ্য সাগর কি ভাবে অতিক্রম করবে? এ সন্দেহ প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে বললেন—কিন্তু একটি

রানর লঙ্কার প্রভূত ক্ষতি করে গেছে। কর্মের গতি দুর্জ্ঞেয় ইত্যাদি সভাসদ ও কুম্ভকর্ণের সামনে ব্যক্ত করে তাদের পরামর্শ চাইলেন। যদিও মানুষ হতে তাঁদের কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই—একথাও জানান।

কামাতুর রাবণের খোদোক্তি শুনে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন—

যদা তু রামস্য সলক্ষ্মণস্য
প্রসহ্য সীতা খলু সাইহাহৃতা।
সকৃৎ সমীক্ষ্যৈব সুনিশ্চিতং তদা
ভজেত চিত্তং যমুনেব যামুনম্॥ (যুঃ) ১২।২৮

—যখন তুমি সলক্ষ্মণ রামের আশ্রম হতে সীতাকে বঞ্চনা করে এনেছিলে সেই সময় আমাদের সঙ্গে সুনিশ্চিত বিচার করা উচিত ছিল। যমুনার যামুন পূর্ণের ইচ্ছার ন্যায় এখন আর পরামর্শ ফলবতী হবে না।

মহারাজ, তুমি যে বলপূর্বক পর স্ত্রী হরণ করেছ, তা তোমার পক্ষে অনুচিত হচ্ছে। এই কর্মের প্রথমেই আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্তব্য ছিল।

ন্যায়েন রাজকার্য্যাণি যঃ করোতি দশানন।
ন স সন্তপ্যতে পশ্চান্নিশ্চিতার্থমতির্নৃপঃ॥ (যুঃ) ১২।৩০

—দশানন, যে রাজা ন্যায় পূর্বক সমস্ত রাজকর্ম করেন, সেই নিশ্চিতার্থমতি রাজা পরে আর অনুতাপ করেন না।

যে কাজ করা অনুচিত এবং যা লোক ও শাস্ত্রের বিপরীত সেই পাপ কর্ম অপবিত্র যজ্ঞের হবিষ্যের ন্যায় দূষিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ব কার্য পশ্চাতে করে পশ্চাতের কাজ অগ্রেই করতে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি নীতি অনীতি জানে না।

শত্রুরা নিজের বিপক্ষের বল অধিক দেখেও যদি সমস্ত কর্মে চপল হয়, তাহলে পক্ষী যেমন দুর্লঙ্ঘ্য ক্রৌঞ্চ পর্বতের ছিদ্র অন্বেষণ করে

সেইরূপ তার দমনের জন্য ছিদ্র অনুসন্ধান করে থাকে।

ত্বয়েদং মহদারব্ধং কার্যমপ্রতিচিন্তিতম্।
দিষ্ট্যা ত্বাং নাবধীদ্ রামো বিষমিশ্রমিবামিষম্॥ (যুঃ)
১২।৩৪

—রাজন, তুমি ভাবী পরিণাম বিচার না করে অত্যন্ত দুষ্কর্ম আরব্ধ করেছো, যেমন বিষ মিশ্রিত আমিষ ভোজনকারীর প্রাণ হরণ করে তেমনি রাম তোমাকে সংহার করতেন, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে রাম তোমার প্রাণ এখনও হরণ করেননি।

যদিও তুমি শত্রুর সঙ্গে অন্যায় কাজ আরম্ভ করেছ, তথাপি আমি তোমার শত্রুদের সংহার করে সব ঠিক করে দেব। নিশাচর তোমার শত্রু যদি ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের ও বরুণ হয়, তথাপি আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব এবং তোমার শত্রুদের নিঃশেষ করব।

কুম্ভকর্ণের উপরোক্তি হতে তাঁর মধ্যে যে বিবেক বুদ্ধি আছে, তিনি যে রাবণের ন্যায় ধর্মজ্ঞান শূন্য নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়। রাবণের এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে দেশ যে সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, কুম্ভকর্ণ তাঁর সব শক্তি দিয়ে তার মোকাবিলা করবার জন্য প্রস্তুত। এতে একদিকে তাঁর ভ্রাতৃপ্রেম, অন্যদিকে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি আরও বললেন—পর্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড শরীরধারী আমি তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট হয়ে মহাপরিঘ হাতে নিয়ে যখন সমরাঙ্গনে গর্জন করব, তখন আমাকে দেখে ইন্দ্রও ভীত হবে। রাম যখন আমার প্রতি একটি বাণ ছেড়ে দ্বিতীয় বাণের সন্ধান করতে উদ্যত হবে, ঐ মাত্র অবসরে আমি তার রক্ত পান করব। তুমি ইচ্ছামত নিশ্চিন্ত হও।

আমি দশরথের পুত্র রামকে বধ করে তোমার জয় ঘটাবার ব্যবস্থা করব। লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে বিনাশ করে আমি সমস্ত বানরযূথ পতিদের ভোজন করব।

তুমি আনন্দিত চিত্তে বিহার কর, উত্তম বারুণী পান কর এবং নিশ্চিন্তে নিজের হিতকর কাজ কর। আমার দ্বারা রাম যমলোকে যাবে, তখন সীতা চিরকালের জন্য তোমার বশীভূত হবে।

এই আশ্বাস দিয়ে কুম্ভকর্ণ পুনরায় নিদ্রামগ্ন হলেন। এদিকে রামের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণ পরাভূত হয়ে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে মন্ত্রিগণকে নিয়ে এক মন্ত্রণা সভায় বসলেন। রাবণ অকপটে সেই সভায় বললেন—ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন, মানুষ হতে তাঁর ভয়। তাঁর কথা এখন সত্য হতে চলেছে। রাবণ এক এক করে তাঁর শাপগ্রস্ত জীবন কাহিনী সভাসদ্‌দের কাছে তুলে ধরলেন। ইক্ষ্বাকুকুলের রাজা অনরণ্য তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশের জনৈক মহাপুরুষ তাঁকে সবংশে নিধন করবে। এই দশরথনন্দন রামই সেই পুরুষ। রাবণের প্রতি বেদবতীর শাপের কথা তিনি সভায় প্রকাশ করলেন। জনক নন্দিনী সীতা সেই বেদবতী। জগজ্জননী উমা ভীতা হয়ে শাপ দিয়েছিলেন স্ত্রীলোকের জন্যেই তাঁর মৃত্যু হবে। তারপর নন্দীশ্বরের বানর রূপ দেখে তিনি হেসেছিলেন। সে জন্য নন্দীশ্বর শাপ দিয়েছিলেন তাঁর রূপ ধারী কোন পরাক্রম প্রাণী তাঁর কুল ধ্বংস করবে। নলকুবরের স্ত্রী রম্ভা ও বরুণ কন্যা পুঞ্জিকাস্থলীর জন্য ব্রহ্মা শাপ দিয়েছিলেন কোন নারীর সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্ভোগ করলে তাঁর মৃত্যু হবে। এ সমস্ত শাপ কখনো ব্যর্থ হয় না। অতএব রাম লক্ষণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য অন্য এক মহাবীরের শীগগির প্রয়োজন। নতুবা আসন্ন সঙ্কট মোচন হবে না। তিনি আরও বললেন, তোমরা নগরের দ্বারে অবস্থান করে তা রক্ষা কর ও প্রাকারে আরোহণ কর। এখন নিদ্রাচ্ছন্ন কুম্ভকর্ণকে জাগান দরকার।

নিদ্রাবশসমাবিষ্টঃ কুম্ভকর্ণো বিবোধ্যতাম্। (যুঃ) ৬০।১৬

—নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত কর।

কামোপভোগে হতচেতন সে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে নিদ্রিত আছে।

নব সপ্ত দশাষ্টৌ চ মাসান্ স্বপিতি রাক্ষসঃ।

মন্ত্রং কৃত্বা প্রসুপ্তোঽয়মিতস্তু নবমোঽহনি ॥ (যুঃ) ৬০।১৭

—সেই রাক্ষস কখন নয়, কখনও সাত, কখন দশ, কখন বা আট মাস নিদ্রা যায়। সে আজ হতে নয় দিন পূর্বে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে ঘুমাচ্ছে।

মহাশক্তিমান মহাবল কুম্ভকর্ণ সমস্ত রাক্ষসের শিরোমণি। তোমরা তাকে দ্রুত জাগাও। সে নিশ্চয়ই সমরে রামদেব ও রাজপুত্র দুজনকে শীঘ্রই বিনাশ করবে।

এষ কেতুঃ পরং সংখ্যে মুখ্যো বৈ সর্বরক্ষসাম্।

কুম্ভকর্ণঃ সদা শেতে মূঢ়ো গ্রাম্যসুখে রতঃ ॥ (যুঃ) ৬০।১৯

—এই কুম্ভকর্ণ সংগ্রামে সমস্ত রাক্ষসের প্রধান এবং যুদ্ধে বিজয় পতাকা স্বরূপ। কিন্তু গ্রাম্য সুখে রত সেই মূঢ় কুম্ভকর্ণ সর্বদা নিদ্রিত থাকে।

কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হলে এই অতি ভয়ঙ্কর সমরে রামের দ্বারা পরাজিত হবার দুঃখ আমার হবে না।

রাবণ নিজে নানা ভয়ঙ্কর শাপগ্রস্ত। তাঁর সব বীরত্ব, শক্তি শাপের কাছে পরাভূত বা অতি তুচ্ছ। এজন্য তাঁর একমাত্র পরিত্রাতা এই কুম্ভকর্ণ—যাকে কবি বাল্মীকি সব দীনতা হীনতার উর্দ্ধে সৃষ্টি করেছেন।

এই মহাশক্তির জন্য ভীম ও কুম্ভকর্ণ আত্মীয়দের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুরুষ।

রাক্ষসরাজ রাবণের কথা শুনে রাক্ষসরা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কুম্ভকর্ণের আবাসে গমন করল। এবং তাঁর আদেশ মত নানা গন্ধ মাল্য ও বহু আহার্য সামগ্রী নিয়ে সহসা কুম্ভকর্ণের নিকট গেল। সেই গুহায় প্রবেশ করা মাত্র মহাবল রাক্ষসরা কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে পশ্চাদপদ হল। পুনরায় অতি কষ্টে বিশেষ যত্ন সহকারে গুহায় প্রবেশ করল। যার মেঝ পর্যন্ত সুবর্ণ ও রত্নে ভূষিত, সেই রমনীয় গুহায় প্রবেশ করে শ্রেষ্ঠ নিশাচররা ভীষণ পরাক্রমশালী শায়িত

কুম্ভকর্ণকে দেখল। কুম্ভকর্ণ বিকীর্ণ পর্বতের ন্যায় বিবশ হয়ে নিদ্রাভি-ভূত ছিলেন. সকলে সমবেত হয়ে তাঁকে জাগাবার চেষ্টা করল। মহাসর্পের ন্যায় নিঃশ্বাসের দ্বারা সকলকে ঘুড়াচ্ছিল। নাসিকার ছিদ্র দ্বার ভয়ানক, পাতালের ন্যায় বিশাল বদন, শয্যায় তাঁর সমস্ত শরীর শায়িত এবং তা মেদ শোণিত গন্ধ যুক্ত। সুবর্ণ অঙ্গদে অলঙ্কৃত শরীর সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান কিরীট শোভিত শত্রুসূদ রাক্ষস শ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে রাক্ষসরা দেখল। রাক্ষসরা কুম্ভকর্ণের সামনে মেরু পর্বতের ন্যায় বিপুল প্রাণীরাশি স্তূপীকৃত করল।

মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ বরাহাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্।
চক্রুর্নৈর্ঋত শার্দুলা রাশিমন্নস্য চাদ্ভুতম্॥ (যুঃ) ৬০।৫১

—সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসরা সেখানে মৃগ, মহিষ, বরাহগুলি রাখলো ও অদ্ভুত অন্নের স্তূপ করল।

অতঃপর কুম্ভকর্ণের সামনে রক্ত কলসগুলি ও বিবিধ মাংস রাখল। তারপর তারা কুম্ভকর্ণের শরীরে বহুমূল্য চন্দন লেপন, দিব্য সুগন্ধ পুষ্প মাল্যের দ্বারা উৎসাহ দিতে থাকে, ধূপের গন্ধের দ্বারা আমোদিত, রিপু নাশন বীরের স্তব করে রাক্ষসরা মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জন করতে লাগল। এতেও যখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হল না, তখন রাক্ষসরা ক্রুদ্ধ হয়ে বহু শ্বেতবর্ণের শঙ্খ বাজাতে লাগল। এবং ঐ রকম ধ্বনিতে গর্জন করতে লাগল, আস্ফালন করতে লাগল এবং বিভিন্ন অঙ্গকে আন্দোলিত করতে লাগল। তারা কুম্ভকর্ণকে জাগাবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করতে লাগল। রাক্ষসদের গর্জন ও সিংহনাদে পাখীরা দিকে দিকে পলায়ন করে আকাশে উড়তে লাগল, উড়তে উড়তে তারা পড়ে গেল।

যখন ঐ ভীষণ কোলাহলেও নিদ্রিত বিরাট বপু কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হলেন না, তখন সমস্ত রাক্ষস হাতে মুষল, ভূষণ্ডী ও গদা নিল। নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বুকে রাক্ষসরা পর্বত শিখর, মুষল, গদা মুদগার ও ও মুষ্টি প্রহার করতে লাগল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের নিঃশ্বাসের প্রভাবে

রাক্ষসরা সামনে টিকতে পারলো না। তারপর ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষসরা দৃঢ় ভাবে কটি বন্ধন করে দশ সহস্র রাক্ষস মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ এবং দুন্দুভিগুলি বাজাতে লাগল। প্রকাণ্ড কণ্টক যুক্ত যষ্টি, মুদ্গর, মুষলের দ্বারা সমস্ত শক্তি একত্রিত করে প্রহার করতে লাগল। সেই শব্দে পর্বত ও বনের সঙ্গে সমস্ত লঙ্কা পরিপূর্ণ হল, তথাপি কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হল না। তারপর কষিত কাঞ্চন নির্মিত দণ্ডের দ্বারা চতুর্দ্দিকে সহস্র ভেরীতে আঘাত করতে লাগল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও শাপগ্রস্ত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ সম্ভব হল না—তখন রাক্ষসরা খুবই কষ্ট হল। তারপর অপর এক দল রাক্ষস পরাক্রম প্রকাশ করল।

অন্যে ভেরীঃ সমাজঘ্নুরন্যে চক্রুর্মহাস্বনম্।
কেশানন্যে প্রলুলুপু র্দশনান্যে দশন্তি চ॥ (যুঃ) ৬০।৫১

—কেউ সজোরে ভেরী বাজাল, কেউ মহা চীৎকার করতে লাগল, কয়েকজন কুম্ভকর্ণের চুল টানলো, আর কেউ কেউ দাঁত দিয়ে কান কামড়াতে লাগল।

কতকগুলি রাক্ষস তার কান দুটিতে শত কলস জল ঢেলে দিল। কিন্তু গাঢ় নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণের কোন স্পন্দন দেখা গেল না। আরও কিছু শক্তিশালী রাক্ষস কণ্টকাকীর্ণ মুদ্গর দ্বারা কুম্ভকর্ণের মস্তকে, বক্ষে ও সর্বাঙ্গে আঘাত করতে লাগল।

রজ্জুবন্ধনবদ্ধাভিঃ শতঘ্নীভিশ্চ সর্বশঃ।
বধ্যমানো মহাকায়ো ন প্রাবুধ্যত রাক্ষসঃ॥ (যুঃ) ৬০।৫৪

—অতঃপর রজ্জু দ্বারা বদ্ধ শতঘ্নী অস্ত্রের দ্বারা সর্বতোভাবে প্রহৃত হয়েও সেই মহাকায় রাক্ষস জাগ্রত হল না।

তারপর তার শরীরের উপর সহস্র হাতী প্রধাবিত করা হল। (বারণানাং সহস্রঞ্চ শরীরেঽস্য প্রধাবিতম্) তখন কুম্ভকর্ণ জাগ্রত হয়ে কিছু স্পর্শ সুখ অনুভব করল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের বিশদ বর্ণনা সুন্দর

রূপে বর্ণিত হয়েছে।

এত যদি আজ্ঞা দিলে রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রাক্ষস চলে কুম্ভকর্ণ ঘর॥
ভক্ষ্য খাদ্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার॥
পালে পালে মহিষ হরিণ আনে কত।
ছাগল গবির নাহি হয় পরিমিত॥

— — — —

রত্ন খাটে কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
নাকের নিশ্বাস যেন প্রলয় পবন॥
দুয়ারের নিকটেতে যে রাক্ষস আসে।
উড়াইয়া ফেলে তারে নাকের নিশ্বাসে॥
টানিয়া নিশ্বাস যবে তুলে নিশাচর।
রাক্ষস কতেক ঢোকে নাকের ভিতর॥

— — — —

মদ্য তোলে সাত তাল বৃক্ষের সমান।
মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ॥

— — — —

কি রূপেতে কুম্ভকর্ণের হবে নিদ্রাভঙ্গ।

— — — —

বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিক বেড়ে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে॥
ঘড়া ঘড়া চন্দন ঢালিয়া দিল বুকে।
সুগন্ধি শীতলে আরো নিদ্রা যায় সুখে॥
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥

— — — —

পালে পালে আনিল ছাগল গাভব।
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর॥

— — — —

রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসেরা চারিভিতে মারে॥
রাজার ভাই বলি কেহ নাহি করে ডর।
বুকের উপরে মারে বৃক্ষ আর পাথর॥
মুষল মুদ্গর কেহ অঙ্গে মারে তেজে।
সাঁড়াসিতে মাংস টানে শেল শূল গোঁজে॥
কেহ কামড়ায় কেহ চুলে ধরি টানে। (লঃ)

বাল্মীকি রামায়ণে আছে দেহে মুদ্গলের আঘাতেও তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। পর্বত শিখর ও বৃক্ষরাজির আঘাতে এবং অনেকগুলি হাতীর পায়ের চাপে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে।

এই নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনা হতেই কুম্ভকর্ণের আকৃতি ও প্রকৃতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে নিদ্রাভঙ্গের পর ঃ—

শয্যা হৈতে উঠি বীর চক্ষে দিল পানি।
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থরে আনি॥
মদ্য পান করিলেক সাতাশ কলসী।
পর্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
হরিণ মহিষ বরা সাপটিয়া ধরে।
বারো তের শত পশু খায় একেবারে॥
কুম্ভকর্ণ বলে বুঝিলাম অনুমানে।
অকালে জাগায় মোরে যাহার কারণে॥
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে এলো হানা।
বারে বারে হেরে যায় না ভাবে ভাবনা॥
ইন্দ্রের আছুক কাজ যম যদি আইসে।
যম হয়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে॥ (লঃ)

কুম্ভকর্ণের বিপুল দেহের মত তাঁর ক্ষিদেও তেমনি। ভীমের ক্ষিদেও সাধারণ মানুষের তুলনায় অত্যধিক ছিল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ক্ষিদের সঙ্গে তুলনা চলে না।

বাল্মীকি রামায়ণে লিখেছে—সেই ভীষণ প্রহার গ্রাহ্য না করে হাতীর স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হেতু কুম্ভকর্ণ ক্ষুধা ও ভয়ে পীড়িত হয়ে জৃম্ভণ করতে করতে দাঁড়াল। নাগের শরীর ও পর্বত শিখরের ন্যায়, বজ্রশক্তি পরাজয়কারী বাহুদ্বয় নিক্ষেপ করে বড়বানলের ন্যায় মুখ বিস্তৃত করে সেই রাক্ষস ভীষণ বিকৃত জৃম্ভণ করল।

সেই জৃম্ভমান অতি শক্তিশালী রাক্ষস জাগ্রত হলে পর্বত হতে যেমন পবন প্রবাহিত হয়, তেমনি তার নিঃশ্বাস বইতে লাগল।

রূপমুত্তিষ্ঠতস্তস্য কুম্ভকর্ণস্য তদ্ বভৌ।
যুগান্তে সর্বভূতানি কালস্যেব দিধক্ষতঃ॥ (যুঃ) ৬০।৬০

—নিদ্রা হইতে জাগ্রত সেই কুম্ভকর্ণের রূপ প্রলয় কালে সর্বভূত সংহারকারী কালের ন্যায় মনে হচ্ছিল।

তার প্রজ্বলিত অনল তুল্য বিদ্যুতের ন্যায় মহানেত্রদ্বয় তেজময় মহাগ্রহ যুগলের ন্যায় দেখাচ্ছিল। তারপর রাক্ষসরা সেখানে অনেক প্রকার ভক্ষ্য বরাহ ও মহিষ দেখালো। তখন সেই মহাশক্তি সম্পন্ন রাক্ষস সেগুলি ভোজন করতে লাগলেন। ক্ষুধার্ত কুম্ভকর্ণ মাংস ভোজন করল এবং তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলপান করল, মেদ কলস-গুলি এবং প্রচুর মদ পান করল।

কুম্ভকর্ণকে আহারান্তে তৃপ্ত দেখে রাক্ষসরা তাকে প্রণাম করল। কুম্ভকর্ণ তাদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা আমাকে প্রহার করে কেন ঘুম হতে জাগালে? রাক্ষসরাজ কুশলে আছেন তো?

অথবা ধ্রুবমন্যোভ্যো ভয়ং পরমুপস্থিতম্।
যদর্থমেবং ত্বরিতৈর্ভবদ্ভিঃ প্রতিবোধিতঃ॥ (যুঃ) ৬০।৬৮

—এখানে ভয়ের কোন কারণ ঘটেনি তো? হয়ত এখানে ভয়ের কোন কারণ ঘটেছে যার জন্য তোমরা আমাকে প্রবুদ্ধ করেছ।

আজ আমি রাক্ষসরাজ রাবণের ভয় নির্মূল করব। মহেন্দ্রকে বিদারিত করব বা অনলকে শীতল করব। অল্প কারণে তোমরা আমার মত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করনি। তোমরা যথার্থ ভাবে আমাকে জাগাবার কারণ বল।

তখন রাবণের মন্ত্রী যূপাক্ষ বলল, দেবতাদের থেকে আমাদের কোন ভয় নেই। একজন মানুষ হতেই আমরা ভীত। দৈত্য বা দানব হতে আমাদের কখনও এ রকম ভয় হয়নি যেমন একজন মানুষের জন্য হয়েছে। পর্বতাকার বানরেরা লঙ্কাকে চারিদিকে বেষ্টন করেছে। সীতার জন্য রামের থেকে ঘোরতর ভয় হচ্ছে। পূর্বে একটা বানর লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেছিল এবং সঙ্গীসহ রাজকুমার অক্ষরাজ নিহত হয়েছে। রাম রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে লঙ্কায় যাও বলে মুক্ত করেছে (ব্রজেতি সংযুগে মুক্তো রামেণাদিতাবর্চসা।) যা সুররা, দৈত্যরা অথবা দানবরাও করতে সমর্থ হয় নাই, এখন রাম তা করছে। প্রাণসঙ্কট হতে বিমুক্ত করেছে।

যুদ্ধে ভ্রাতার পরাজয়ের কথা শুনে কুম্ভকর্ণ নয়ন বিস্ফারিত করে বলল—যূপাক্ষ, আজই আমি বানর সেনা ও রাঘব লক্ষ্মণের সঙ্গে রামকে পরাজিত করে তারপর রাবণকে দেখবো। আমি আজ বানরদের মাংস ও রক্তে রাক্ষসদের তৃপ্ত করব এবং স্বয়ং রাম লক্ষ্মণের শোণিত পান করব।

ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণের এই অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনে যূপাক্ষ বললে, প্রথমে রাবণের কথা শুনে দোষগুণ বিচার করে শত্রুদের জয় করবেন। মহোদরের কথা শুনে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে কুম্ভকর্ণ রাবণের প্রাসাদ অভিমুখে রওনা হলেন।

রাক্ষসরা রাবণের নিকট গিয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে জানাল এবং জানতে চাইল তিনি (কুম্ভকর্ণ) কি সেখান হতেই যুদ্ধে যাবেন অথবা এখানে এসে আপনার সাক্ষাৎ করবেন।

রাবণ এই খবরে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আমি কুম্ভকর্ণকে এখানে

দেখতে ও সমাদর জানাতে চাই। রাক্ষসরা এই সংবাদ কুম্ভকর্ণকে দিল।

ভ্রাতার এই আদেশ শুনে কুম্ভকর্ণ উত্তম বলে, শয্যা ত্যাগ করে মুখ ধুয়ে পরমানন্দে স্নান করেন। এবং শক্তি সঞ্চারক পানীয় আনবার জন্য আদেশ করলেন। তখন রাবণের অনুমতি অনুসারে সেই রাক্ষসবৃন্দ বিবিধ মদ্য এবং ভক্ষ্যবস্তু অতি সত্বর আনলো।

পীত্বা ঘটসহস্রে দ্বে গমনায়োপচক্রমে।
ঈষৎ সমুৎকটো মত্তস্তেজোবলসমন্বিতঃ॥ (যুঃ) ৬০।৯৩

—দুই সহস্র কলস মদ্য পান করে ঈষৎ উত্তেজিত, মত্ত এবং তেজ বল সম্পন্ন কুম্ভকর্ণ যাত্রার আয়োজন করলেন।

নিদ্রা হতে উঠে কুম্ভকর্ণর খাবারের যে বিবরণ বাল্মিকী রামায়ণে পাওয়া যায়, তদুপরি বল সঞ্চয়ের জন্য তাকে দুই সহস্র কলস মদ পান করতে হয়েছে—এটা আশ্চর্য্যের বিষয়।

কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা রাবণের প্রাসাদে আসবার সময় প্রলয়কালে যমের ন্যায় মনে হচ্ছিল। কুম্ভকর্ণের পদক্ষেপে পৃথিবী প্রকম্পিত হচ্ছিল। রাজপথে বিপুলাকায় কুম্ভকর্ণকে দেখে বানরা ভয়ে পলায়ন করতে থাকে। রামও বিস্মিত হয়ে বিভীষণকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে বিভীষণ বললেন—যিনি যুদ্ধে আদিত্য এবং দেবেন্দ্রকে পরাজিত করেছেন ইনিই সেই বিশ্রবার পুত্র মহাশক্তিশালী কুম্ভকর্ণ। এঁর মত বিরাট শরীরের অন্য কোন রাক্ষস নেই। এঁর দ্বারা যুদ্ধে দানব, যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নরা সহস্রবার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে।

শূলপাণিং বিরূপাক্ষং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
হন্তুং ন শেকুস্ত্রিদশাঃ কালোঽয়মিতি মোহিতাঃ॥ (যুঃ)
৬১।১১

শূলপাণি, বিরূপাক্ষ ও মহাবলবান্ কুম্ভকর্ণকে হনন করতে

অমরবৃন্দ সমর্থ হলেন না। ইনি স্বয়ং কাল—এই মনে করে বিমোহিত হন।

এই বিরাটকায় রাক্ষস জন্মাবামাত্র ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে বহু সহস্র প্রজাদের ভক্ষণ করেছিল। ভীত নিপীড়িত প্রজাবৃন্দ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয়ে ব্যাপারটি নিবেদন করল। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র নিশিতে বজ্রের দ্বারা তাকে আঘাত করল। সেই বিশাল দেহ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা আহত হয়ে বিচলিত হল এবং ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল। তার সিংহনাদ শুনে প্রজারা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হল। তারপর মহাশক্তিশালী ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ সুরেন্দ্রের ঐরাবত গজের দন্ত উৎপাটন করে তা দ্বারা ইন্দ্রের বক্ষে আঘাত করল। কুম্ভকর্ণের প্রহারে পীড়িত ইন্দ্র জ্বলতে লাগলেন। অতঃপর দেবতা, ব্রহ্মর্ষি ও দানবরা অকস্মাৎ বিষাদগ্রস্ত হলো। তারপর ইন্দ্র প্রজাদের সঙ্গে ব্রহ্মার নিকট গেলেন এবং প্রজাদের ভক্ষণ, দেবতাদের পীড়ন, ঋষিদের আশ্রমনাশ ও পুনঃ পুনঃ পরস্ত্রী হরণ কুম্ভকর্ণের এইসব অত্যাচারের বিষয় জানালেন। তিনি বললেন, যদি কুম্ভকর্ণ প্রতিনিয়ত প্রজাদের ভোজন করে তবে অচির কালের মধ্যে ত্রিলোক শূণ্য হবে। ইন্দ্রের কথা শুনে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা রাক্ষসদের আহ্বান করলেন ও কুম্ভকর্ণকে দেখলেন।

কুম্ভকর্ণকে দেখবামাত্র ব্রহ্মা অত্যন্ত ভীত হলেন। তারপর তিনি কুম্ভকর্ণকে বললেন,—কুম্ভকর্ণ, নিশ্চয়ই ত্রিলোক বিনাশ করবার জন্য বিশ্রবা তোমাকে জন্ম দিয়েছেন, সেজন্য তুমি আজ হতে মৃতকল্প হয়ে শায়িত থাকবে।

ব্রহ্মার শাপে কুম্ভকর্ণ অভিভূত হয়ে ব্রহ্মার সামনে পড়ে গেল। তখন রাবণ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তাঁকে অনুনয় করে বললেন আপনার কথা মিথ্যা হতে পারে না, নিশ্চয়ই সে নিদ্রিত থাকবে। তবে তার নিদ্রা ও জাগরণের সময় স্থির করুন। রাবণের কথা শুনে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বললেন, কুম্ভকর্ণ ছয়মাস নিদ্রিত থাকবে ও একদিন জেগে

থাকবে। (শয়িতা হ্যেষ ষন্মাসেমেকাহং জাগরিষ্যতি) একদিনই এই বীর ক্ষুধিত হয়ে ধরা তলে বিচরণ করে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় লোকদের ভক্ষণ করবে। এই বিপদে পড়ে এবং আপনার পরাক্রমে ভীত রাজা রাবণ সম্প্রতি কুম্ভকর্ণকে জাগিয়েছেন।

কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধে বিভীষণের উপরোক্তি কুম্ভকর্ণের বীর্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সঠিক ধারণা জন্মায়। কুম্ভকর্ণের এত পরাক্রম ছিল বলেই রাবণ তার উপর বিশেষ রূপে নির্ভরশীল ছিলেন যেমন যুধিষ্ঠির ছিলেন ভীমের উপর।

কুম্ভকর্ণ রাবণের প্রাসাদে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করল। এবং কি কাজ করবে জিজ্ঞেস করল। রাবণ খুশী হয়ে আসন হতে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর আসনে উপবেশন করে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে রাবণকে বলল, রাজা কিজন্য তুমি আমাকে জাগিয়েছ? কে আজ ভয়ের কারণ? কাকে যমালয়ে পাঠাতে হবে?

তখন রাবণ বললেন, নিদ্রিত অবস্থায় তোমার অনেক কাল অতীত হয়েছে; গাঢ় নিদ্রিত তুমি রামের জন্য আমার ভয়ের কথা জান না। দশরথের পুত্র রাম সুগ্রীবের সঙ্গে সমুদ্র লঙ্ঘন করে আমার কুল বিনাশ করতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্র সেতু বন্ধন করে অনায়াসে লঙ্কায় প্রবেশ করে তার বন উপবন বানর দ্বারা সমাচ্ছন্ন করেছে। আমার প্রধান প্রধান বীর রাক্ষসদের বানররা নিহত করেছে। বানরদের কেউ জয় করতে পারছে না। মহাবল বীর, তুমি এদের হত্যা করে আমার ভয় দূর কর, এজন্য তোমাকে জাগিয়েছি। আমার সমস্ত কোষ ক্ষয় হয়ে গেছে। তুমি অনুগ্রহ করে লঙ্কাপুরীতে সকলকে রক্ষা কর। তুমি ভাই এর জন্য এই কাজটা কর। পূর্বে কখনও কোন ভ্রাতাকে আমি এ কথা বলি নাই। (ময়ৈবং নোক্তপূর্বা হি ভ্রাতা কশ্চিৎ পরন্তপ।) তোমার উপর আমার স্নেহ ও অত্যন্ত আশা আছে। দেবাসুরের যুদ্ধে বহুবার তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী স্থান গ্রহণ করেছ এবং পূর্বে

দেবতা ও অসুরদের পরাজিত করেছো। তুমি সমস্ত বিক্রমের কাজ কর। প্রাণীদের মধ্যে তোমার মত বলবান আর দেখা যায় না।

রাবণের উপরি উক্তি হতে বোঝা যাচ্ছে রাবণের মত মহাপরাক্রমশালী বীরকে রাম কাবু করেছিলেন তাঁর বানর সেনা দিয়ে। তাই অগতির গতি কুম্ভকর্ণের শক্তির উপর নির্ভর করে রাবণ কুম্ভকর্ণকে অসময়ে নিদ্রার থেকে জাগিয়েছিলেন।

উত্তরে কুম্ভকর্ণ রাবণকে বললেন, পূর্বে মন্ত্রণাকালে আমরা যে দোষ দেখেছিলাম, এখনও সেই তোমাতে আছে। কেননা, তুমি হিতৈষী পুরুষ এবং তাঁদের বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারনি। (হিতেষ্বনভিযুক্তেন সোঽয়মাসাদিতস্ত্বয়া।)

শীঘ্রং খল্বভ্যুপেতং ত্বাং ফলং পাপস্য কর্মণঃ।
নিরয়েষ্বব পতনং যথা দুষ্কৃতকর্মণঃ॥ (যুঃ)৬৩।৩

—যেমন পাপী পুরুষেরা নরকেই পতিত হয়। তেমনি তোমার পাপ কর্মের ফল শীঘ্র উপস্থিত হয়েছে।

মহারাজ প্রথমে এই কাজের পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করনি, কেবল বীর দর্পে চলেছো।

যঃ পশ্চাৎ পূর্বকার্য্যানি কুর্য্যাদৈশ্বর্য্যমাস্থিতঃ।
পূর্বঞ্চোত্তরকার্যাণি ন স বেদ নয়ানয়ৌ॥ (যুঃ) ৬৩।৫

—যে ব্যক্তি ঐশ্চর্যের অভিমানে পূর্ব কাজ পরে করে এবং পরের কাজ পূর্বে করে, সে নীতি ও অনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

দেশ-কালবিহীনানি কর্মাণি বিপরীতবৎ।
ক্রিয়মাণানি দুষ্যন্তি হবীংষ্যপ্রযতোষ্বব॥ (যুঃ) ৬৩।৬

—যেমন সংস্কারহীন অগ্নিতে হোম করলে দুঃখেরই কারণ হয়। সেইরূপ দেশকালবিহীন কর্ম বিপরীতের ন্যায় হয়ে থাকে।

যে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে বিচার করে ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং স্থান রূপে উপলক্ষিত সাম দান ও দণ্ড—এই তিন প্রকার কর্মানুষ্ঠান পাঁচ প্রকারে প্রয়োগ করেন, তিনি উত্তম মার্গে বিদ্যমান।

যে রাজা নীতি শাস্ত্র অনুসারে মন্ত্রিদের সঙ্গে ক্ষয় আদির জন্য উপযুক্ত সমাচার বিচার করে এবং নিজের বুদ্ধি দ্বারা বন্ধুদেরও বিদিত হন, তিনি কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হন।

নীতিজ্ঞ পুরুষ ধর্ম, অর্থ এবং কাম—সমস্ত নিজের সময় অনুসারে করে। ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই তিনের মধ্যে ধর্মই শ্রেষ্ঠ, সেজন্য অর্থ এবং কামকে উপেক্ষা করে ধর্মের সেবা করা কর্তব্য—এই কথা বিশ্বস্ত পুরুষের নিকট শুনেও যে রাজা বা রাজপুরুষ বুঝেন না অথবা বুঝেও স্বীকার করেন না, তার অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা।

যে রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে ভালরূপে মন্ত্রণা করে সময় অনুসারে দান ভেদ এবং পরাক্রমাদি পাঁচ প্রকার যোগ, নয়, এবং অনয় ও উপযুক্ত সময়ে ধর্ম, অর্থ এবং কামের সেবা করেন, তিনি ইহলোকে কখনো দুঃখ পান না।

যে রাজা চঞ্চল আপাত রমণীয় বচন শুনে সন্তুষ্ট হয় এবং সহসা বিচার না করে কোন কাজের দিকে ছুটে, তার এই দুর্বলতাকে যেমন পক্ষী ক্রৌঞ্চ পর্বতকে ছেদন করে, তেমনি শত্রু তাকে ছেদন করে।

যে রাজা শত্রুকে অবজ্ঞা করে নিজেকে রক্ষা করে না। সে অনর্থকে পায় এবং নিজের স্থান হতে ভ্রষ্ট হয়।

পূর্বে তোমার পত্নী মন্দোদরী এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণ যা বলেছিলেন, তাই আমাদের পক্ষে হিতকর। অধুনা যা ইচ্ছা তাই কর।

কুম্ভকর্ণের উপরোক্ত তিরস্কার ও রাজধর্ম গর্হিত পরস্ত্রী হরণের জন্য কঠোর সমালোচনা ও ধিক্কার মাধ্যমে এটাই উপলব্ধি করা যায় যে কুম্ভকর্ণ রাবণের চেয়েও অধিক পরাক্রমশালী হলেও রাবণের ন্যায় ভ্রষ্ট চরিত্রের ছিল না। কুম্ভকর্ণের ধর্মজ্ঞান, রাবণের চেয়েও প্রখর ছিল। তাই পরস্ত্রী হরণ পাপ কর্মকে কুম্ভকর্ণ সর্বান্তকরণে সমর্থন করেননি। বরং কঠোর ধিক্কার দিয়েছেন।

এই ক্ষেত্রে ভীমের সঙ্গে কুম্ভকর্ণর কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

কারণ দ্রৌপদীর প্রতি মৎস্যরাজের শ্যালক কীচক দুর্ব্যবহার করলে প্রবল পরাক্রমশালী ভীম তাকে সমুচিত শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনিও তাঁর অন্যান্য বীর ভ্রাতাদের মত নীরবে স্ত্রীর এই অপমান সহ্য করতে পারেন নি।

যদিও কুম্ভকর্ণের ক্ষেত্রে দোষী তাঁর সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রবল পরাক্রান্ত লঙ্কাধিপতি তথাপি কুম্ভকর্ণ এই অন্যায়ের জন্য তার বিরূপ সমালোচনা করতে একটুও ইতস্ততঃ করেননি।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের নিকট রাম-রাবণের যুদ্ধের বৃত্তান্ত শুনে

কুম্ভকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন।
শুনালে আশ্চর্য কথা এ আর কেমন॥
রাম লক্ষ্মণ যদি সে সামান্য হৈত নর।
জলের উপরে কেন ভাসিছে পাথর॥
বনের বানর বদ্ধ যে রামের গুণে।
সামান্য মনুষ্য তাঁরা না ভাবিহ মনে॥
কুম্ভকর্ণ বলে হেন লয় মম মনে।
মায়াতে মনুষ্য রূপ দেব নারায়ণ॥ . (লঃ)

রাম যে সাধারণ মানুষ ছিলেন না, বিপুলাকৃতি মহাপরাক্রমশালী কুম্ভকর্ণ তাঁকে না দেখেই, তাঁর পরাক্রম সম্বন্ধে অবগত হয়ে রামের সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তার দ্বারা কুম্ভকর্ণের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুম্ভকর্ণর নির্ভীক সমালোচনার ধিক্কারে রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুমি মাননীয় গুরু এবং আচার্যের ন্যায় কেন উপদেশ দিচ্ছ? এখন যা করা দরকার তাই কর। আমি ভুল বশতঃ চিত্ত মোহে অথবা নিজের বল বীর্য আশ্রয়ে প্রথমে যে তোমাদের কথা শুনিনি তা পুনরায় বলা বৃথা। যা গেছে, তাতো গেছেই। তার জন্য বারংবার দুঃখ কর না। বর্তমানে যা কর্তব্য, তা চিন্তা কর। তোমার শক্তির

দ্বারা আমার ভ্রম বশতঃ ত্রুটি দূর কর। আমার প্রতি তোমার কিছু মাত্র স্নেহ থাকে, যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে কর, যদি এ কাজকে কর্তব্য বলে মনে কর, তাহলে যুদ্ধ কর।

তিনিই প্রকৃত বন্ধু, যিনি সমস্ত কাজ নষ্ট হয়ে যাবার পর স্বজন-গণের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তিনিই বন্ধু, যিনি বিপথগামী বন্ধুকে রক্ষা করেন।

স সুহৃদ্ যো বিপন্নার্থং দীনমভ্যুপপদ্যতে।
স বন্ধুর্যোঽপণীতেষু সাহায্যায়োপকল্পতে॥

(যুঃ) ৬৩। ২৭—২৮

রাবণের কথা হতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন বুঝতে পেরে কুম্ভকর্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো আমি জীবিত থাকতে তোমার এ রকম মনে করা উচিত না। তুমি যে জন্য পরিতাপ করছো তা আমি নাশ করব। অবশ্য সব অবস্থাতেই তোমাকে হিতবাক্য বলা আমার কর্তব্য। সেজন্য আমি বন্ধু ভাবে ও ভ্রাতৃ স্নেহে এই কথা বলছি। এ সময়ে যা করা কর্তব্য আমি তা করব।

আজ যুদ্ধে রাম ভ্রাতার সঙ্গে নিহত হলে বানর বাহিনী কি করে পলায়ন করে তা দেখ। আজ আমি সমর ক্ষেত্র হতে রামের মস্তক আনবো। তা দেখে তুমি সুখী হবে এবং সীতা দুঃখ পাবে। লঙ্কায় যাদের আত্মীয় বন্ধু নিহত হয়েছে তারা রামের হত্যা কাণ্ড দেখুক রাম প্রথম আমাকে হত্যা করে তবে তোমাকে হত্যা করতে সমর্থ হবে। আমি নিজের বিষয়ে ভয় করছি না।

অহমুৎসাদয়িষ্যামি শত্রুংস্তব মহাবলান্।
যদি শক্রো যদি যমো যদি পাবক-মারুতৌ॥ (যুঃ) ৬৩।৪৩

—তোমার মহাবলবান শত্রু যদি ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ হলেও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ও তাদের ধ্বংস করব!

আমাকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হয়। যদি আমি অস্ত্র ত্যাগ করে রণভূমিতে বিচরণ করি, তাহলে ও কেউ আমার সামনে দাঁড়াতে

পাববে না। শক্তি, গদা, অসি অথবা শাণিত শর সমূহেব দ্বাবা শত্রু সংহাব কবব না। এই হাত দুটি দ্বাবাই যুদ্ধ কবে ইন্দ্রেব ন্যায শত্রুকেও হনন কবব। যদি বঘুনাথ আজ আমাব মুষ্টিব বেগ সহ্য কবতে পারে, তাহলে আমাব শবগুলি নিশ্চযই বামেব বক্ত পান কববে। আমি থাকতে কেন চিন্তা কবে দুঃখ পাচ্ছ ?

আমি তোমাব শত্রু বিনাশ কববাব জন্য সমরে যাবাব জন্য উদ্যত হযেছি। বামেব ভয ত্যাগ কব। আমি যুদ্ধে বাম লক্ষ্মণ ও মহা-মহাশক্তিমান সুগ্রীবকে নিহত কবব। যুদ্ধ সুরু হলে আমি বাক্ষসঘাতী লঙ্কা দগ্ধকাবী হনুমানকে ও বানবদেব ভক্ষণ কবব। আমি তোমাকে মহাযশেব অধিকাবী কবব।

অতঃপব কুম্ভকর্ণ বলল, যদি তোমাব ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভু হতেও ভয় উপস্থিত হয় তাহলে সূর্য যেমন বাত্রিব অন্ধকাবকে নাশ কবে তেমনি আমি ঐ ভয় দূব কববো। আমি ক্রুদ্ধ হলে দেবতাবাও পৃথিবীতে শাযিত হয। তখন আমি যমকে শান্ত কবব এবং অনলকে ভক্ষণ কববো। এইভাবে কুম্ভকর্ণ আত্মশক্তিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কাকে কি ভাবে ধ্বংস কববে তাব বিস্তৃত বিববণ দিয়ে বলল, আজ সকলে প্রসুপ্ত কুম্ভকর্ণেব পবাক্রম দেখবে। এই সমগ্র ত্রিলোক ভক্ষণ কবলেও আমাব উদব পূর্ণ হবে না। লক্ষ্মণেব সঙ্গে বামকে নিহত কবে সমস্ত প্রধান প্রধান যুথপতিদেব ভক্ষণ কবব।

মযাদ্য বামে গমিতে যমক্ষয়ং
চিরায় সীতা বশগা ভবিষ্যতি ॥ (যুঃ) ৬৩। ৫৮

—বামকে আজ যমালয়ে পাঠালে সীতা চিবকালেব জন্য তোমাব বশীভূত হবে।

কৃত্তিবাসী বামাযণে কুম্ভকর্ণেব দম্ভেব একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

আমি হেন ভাই ভব-কাবে কব শঙ্কা।
বৈবী মাবি বাখিব কণক পুবী লঙ্কা ॥

শ্রীরামের মাথা কাটি তোমারে দিব ডালি।
স্থির হৈয়া বৈস তুমি কেন দাও গালি॥
আগে লঙ্কা অরামা ও অবানরা করি।
সুগ্রীবেরে মারিয়া পাঠাব যমপুরী॥
বাধিব কুমুদ আদি যত কপিগণ।
মারিব তোমার বৈরী ভাই বিভীষণ॥
হনুমারে মারি আজি লঙ্কাপুরীর বৈরী।
মারিব তাহার পরে বানর কেশরী॥
চলিল যে কুম্ভকর্ণ যুঝিবারে সাধে। (লঃ)

রাবণকে আশ্বস্ত করে কুম্ভকর্ণ রণাঙ্গনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে মহোদর তাকে বললো—

বহুদিন নিদ্রাগত ছিলে অচেতন॥
দেখিতে করয়ে সাধ পুরবাসী নারী।
একবার দেখা দিতে চল অন্তঃপুরী॥ (লঃ)

উত্তরে— কুম্ভকর্ণ বলে কি কহিস মহোদর।

সম্মুখে বিপক্ষ বসে যমের দোসর॥
চারি দ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ।
তবে অন্তঃপুরে হবে আমার গমন॥

কুম্ভকর্ণের এই উক্তিতে তার কর্তব্য জ্ঞান যে কত প্রখর ছিল তাই প্রকাশ পেয়েছে। রাক্ষস হলেও কত কর্তব্যনিষ্ঠ তার নিদর্শন রেখে গেছে উপরের কয়টি ছত্রে।

প্রবল পরাক্রান্ত রামের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের একা যুদ্ধ করতে যাওয়া উচিত হবে না এবং কুম্ভকর্ণের উক্তিও নিতান্ত বালকের স্পর্দ্ধা বলে মহোদয় কুম্ভকর্ণকে ব্যঙ্গ করে রাবণকে বলল যে রামের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করলে সীতা অবশ্যি রাবণের বশীভূত হবেন।

মহোদয়ের এই উক্তির জন্য কুম্ভকর্ণ তাকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে বলল—যে রাজা অক্ষম ও নির্বোধ তার কাছেই তোমার প্রস্তাব

গ্রহণ যোগ্য হবে। তোমাদের মত যুদ্ধ বিমুখ কাপুরুষরা রাজার সব কাজ পণ্ড করে। লঙ্কায় বহু সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে, রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়েছে, তোমরা রাজাকে আশ্রয় করে মিত্র রূপে তাঁর শত্রুতা করছ।

এষ নির্যামাহং যুদ্ধমুদ্যতঃ শত্রুনির্জয়ে।
দুর্নয়ং ভবতামদ্য সমীকর্তুং মহাহবে॥ (যুঃ) ৬৫।৮

—আমি তোমাদের এই দুর্নীতিকে দূর করবার জন্য মহাযুদ্ধে শত্রুকে জয় করতে কৃত সঙ্কল্প হয়ে যাত্রা করছি।

সরল কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে ছলনা ও চতুরতা পছন্দ করতো না। মিথ্যের বা ছলনার দ্বারা শত্রু পক্ষকে ছলনার প্রস্তাবের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে সে মহোদরকে ভর্ৎসনা করছিল। এখানেও তার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তার মতে সম্মুখ সমরে শত্রুকে আপন শক্তিতে পরাজিত করাই বীরধর্ম।

এ ক্ষেত্রে ভীম চরিত্রও কুম্ভকর্ণের পাশে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কারণ দ্রোণাচার্যকে বধ করবার জন্য ভীমই সর্বাগ্রে 'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁকে নিরস্ত্র করেছিলেন। দ্রোণাচার্য যদি সেদিন নিরস্ত্র না হতেন তবে পাণ্ডবদের প্রভূত ক্ষতি হত। এই জন্য ভীম কেবল নিজেই এই কথা বলেননি, যুধিষ্ঠিরকেও এরূপ মিথ্যা ভাষণে প্ররোচিত করেছিলেন। কিন্তু কুম্ভকর্ণ রাক্ষস হয়েও, এ ধরণের কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিতে ঘৃণা বোধ করেছেন।

কুম্ভকর্ণ একাই যুদ্ধের উদ্যোগী হলে, রাবণ তাকে সতর্ক করে বললেন, তুমি শূল মুদ্গর পাণি সৈন্য পরিবৃত হয়ে যাও। কারণ সেই বানররা মহাশক্তিশালী, বীর ও সর্বদা যুদ্ধ ব্যবসায়ী। তোমাকে প্রমত্ত বা একাকী দেখলে তৎক্ষণাৎ তারা দন্তাঘাতে তোমাকে বিনাশ করবে। তারপর রাবণ কুম্ভকর্ণের গলায় মণিময় মালা এবং যথাস্থানে কেয়ুর অঙ্গুরীয় এবং চন্দ্রহার প্রভৃতি দ্বারা তাকে সজ্জিত করলেন। কর্ণদ্বয়ে দুটি কুণ্ডল পরিয়ে সুগন্ধ দিব্য মাল্যদানে তার দেহ শোভিত করলেন।

অতঃপর কুম্ভকর্ণ রাবণকে প্রণাম করে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। কুম্ভকর্ণ রাজপুরী হতে বের হতেই চারদিক হতে ঘোরতর অমঙ্গল সূচক সঙ্কেত দেখা গেল। উল্কা শনিযুক্ত মেঘপুঞ্জ গদর্ভের ন্যায় অরুণ-বর্ণ ধারণ করল এবং সাগর ও কানন শুদ্ধ পৃথিবী কাঁপতে লাগল। ঘোরতর দর্শনের শৃগাল মুখে জ্বলন্ত অঙ্গার উদ্গীরণ করতে করতে অশুভ ধ্বনি করল এবং পক্ষী প্রতিকূল ভাবে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করতে লাগল। পথে যাবার সময় তার শূলোপরি শকুনি পড়ল এবং তার বাম চক্ষু স্ফুরিত ও বাম হস্ত কম্পিত হতে লাগল। সামনে ভীষণ শব্দে প্রজ্বলিত উল্কাপাত হল। সূর্য নিষ্প্রভ হল আরামদায়ক বায়ুও প্রবাহিত হল না। এই সব অমঙ্গল চিহ্ন ভ্রূক্ষেপ না করেই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে যাত্রা করলেন।

বিশালকায় কুম্ভকর্ণকে দেখে বানরবৃন্দ ভয়ে পলায়ন করতে থাকে। অঙ্গদ পলায়মান বানরদের আশ্বাস দিলে বানররা পুনরায় যুদ্ধে প্রত্যাবর্তন করল।

যুদ্ধক্ষেত্রে বানররা কুম্ভকর্ণের প্রতি বৃক্ষ ও শিলার আঘাত করল। কুম্ভকর্ণ ক্রোধে গদা উদ্যত করে শত্রু বানরদের আঘাত করে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। এই ভাবে আট হাজার সাতশত বানর কুম্ভকর্ণ হাতে নিহত হল। কুম্ভকর্ণ এক এক বারে ষোড়শ অষ্টাদশ, বিংশতি এবং ত্রিংশৎ পরিমিত বানর গ্রাস করতে লাগলো। হনুমান আকাশে উঠে কুম্ভকর্ণের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ, শিলা এবং বিবিধ বৃক্ষরাজি বর্ষণে প্রবৃত্ত হলে অত্যন্ত বলশালী কুম্ভকর্ণও নিজের শূলাগ্রভাগ দ্বারা সেই গিরিশৃঙ্গকে ভঙ্গ ও বৃক্ষ খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগল। তখন হনুমান একটি পর্বতশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের উপর নিক্ষেপ করায় রক্ত ও মেদে তাঁর দেহ প্লাবিত হয়ে গেল। কুম্ভকর্ণ ক্ষুব্ধ ও অভিভূত হলেন। কুম্ভকর্ণও শূলের আঘাতে হনুমানের বক্ষ বিদীর্ণ করলো। হনুমান কুম্ভকর্ণের শূল ভেঙ্গে দিয়েছিল। তারপর নীল কুম্ভকর্ণের উদ্দেশ্যে পর্বতশৃঙ্গ নিক্ষেপ করল। সেই শৃঙ্গকে সামনে আসতে দেখেই কুম্ভকর্ণ

তার উপর মুষ্টি দ্বারা-আঘাত করলে সেই গিরিশৃঙ্গ মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণ হয়ে ভূমিতে পতিত হল। অতঃপর খনরভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ ও গন্ধমাদন এই পাঁচজন মহাবল বানর শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ স্থলে মহাকায় কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হয়ে শৈল, তল, পাদ ও মুষ্টিদ্বারা তাকে আঘাত করতে লাগলে কুম্ভকর্ণ সেই আঘাতকে সুখস্পর্শ বোধ করে কিছুমাত্র ব্যথিত হ'ল না। অধিকন্তু মহাবেগবান খনরভকে বাহুতে বেষ্টন করে ধরে ফেলল। কুম্ভকর্ণের বাহু যুগলদ্বয়ে পিষ্ট হয়ে বানররা মুখে রক্তবমি করে ভূতলশায়ী হল। অতঃপর কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে মুষ্টি দ্বারা শরভকে জানু দ্বারা নীলকে ও তল ও পদ দ্বারা গন্ধমাদনকে আঘাত করলে সেই বীররা ব্যথিত ও রক্তাক্ত হয়ে ভূমিতে পতিত হল। বানর নেতারা পতিত হলে সহস্র সহস্র বানর কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবিত হল। বানর শ্রেষ্ঠরা কুম্ভকর্ণের উপর উঠে তাকে দংশন করতে লাগল। তারা নখ, দন্ত, মুষ্টি ও বাহু দ্বারা কুম্ভকর্ণকে আঘাত করল। কুম্ভকর্ণ বানরদের ভক্ষণে প্রবৃত্ত হলে, বানররা কুম্ভকর্ণের পাতালের ন্যায় মুখ বিবরে নিক্ষিপ্ত হয়ে নাসিকা-ও কর্ণ দিয়ে বহির্গত হতে লাগল। তা দেখে কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বানরদের চিবিয়ে সমস্ত বানর সেনা ভক্ষণ করল।এইভাবে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র মাংস ও শোণিতে ক্লেদাক্ত করলেন।

বানরদের এই প্রকার ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা দেখে অঙ্গদ এক গিরিশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের মস্তকে নিক্ষেপ করে। তাতে মস্তকে আঘাত পেয়ে সে ক্রুদ্ধ হয়ে বেগে অঙ্গদের প্রতি ধাবিত হলো। কুম্ভকর্ণ তার প্রতি শূল নিক্ষেপ করে। অঙ্গদ দ্রুত সরে গিয়ে সেই আঘাত হতে নিজেকে মুক্ত করে তল দিয়ে কুম্ভকর্ণের বুকে আঘাত করলে পর্বতের ন্যায় কুম্ভকর্ণ সেই আঘাতে অচৈতন্য হলো। জ্ঞান ফিরে আসলে কুম্ভকর্ণ অঙ্গদের বুকে মুষ্টাঘাত করলে অঙ্গদও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। অঙ্গদ ভূপতিত হলে কুম্ভকর্ণ শূল নিয়ে সুগ্রীবের প্রতি ধাবিত হলো। সুগ্রীবও কুম্ভকর্ণকে আসতে দেখে লাফ দিয়ে উপরে উঠে একটা

পর্বতাগ্র উপড়িয়ে কুম্ভকর্ণের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে পরে বেগে সেই অভিমুখে ধাবিত হল। বানররাজকে আসতে দেখে কুম্ভকর্ণ তার দেহকে পরিবর্দ্ধিত করে তার সামনে আসল। তখন সুগ্রীব তাকে বলল,—

তুমি বানরবাহিনী ভক্ষণ এবং বীরদের পতিত করে দুষ্কর্ম সম্পন্ন করেছো এবং সুযশ লাভ করেছো। ইতর বানরদের মেরে কি হবে? তাদের ত্যাগ করে আমার এই গিরির আঘাত সহ্য কর।

কুম্ভকর্ণ উত্তরে বললে, বানররাজ, তুমি প্রজাপতির পৌত্র এবং ঋক্ষরাজের পুত্র। বিশেষতঃ তোমার ধৈর্য ও পুরুষ আছে বলেই এরূপ গর্জন করছ।

কুম্ভকর্ণের কথা শুনে সুগ্রীব গিরি শিখর উঠিয়ে তা দিয়ে কুম্ভকর্ণের বুকে আঘাত করল। ঐ শৈলশৃঙ্গ কুম্ভকর্ণের বিশাল বক্ষঃস্থলে পতিত হয়েই ভেঙ্গে গেল। তা দেখে বানররা বিষন্ন ও রাক্ষসরা আনন্দিত হল। কুম্ভকর্ণ ঐ গিরিশৃঙ্গ দ্বারা আহত হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহনাদ করতে করতে বানররাজকে বধ করবার অভিপ্রায়ে শূল নিক্ষেপ করল।

হনুমান বায়ু বেগে এসে হাত দিয়ে সেই শূল ধরে তা ভেঙ্গে ফেলল। ভগ্ন শূল দেখে কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং লঙ্কার নিকটে মলয়াচলের একটা শৃঙ্গ উৎপাটন করে সুগ্রীবের নিকট গিয়ে তা দিয়ে তাকে আঘাত করল।

সেই পর্বতশৃঙ্গে সুগ্রীব আহত হয়ে ভূমিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তখন কুম্ভকর্ণ বায়ুবেগে উপস্থিত হয়ে সুগ্রীবকে বক্ষপুটে গ্রহণ করে প্রস্থান করল। কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে গেলে সেখানে পুষ্প বৃষ্টি দ্বারা তাকে অভিষিক্ত করা হয়। সুগ্রীব ধীরে ধীরে জ্ঞান লাভ করে দেখলো সে কুম্ভকর্ণের বাহুমধ্যে। তখন সুগ্রীব তীক্ষ্ণ নখের দ্বারা কুম্ভকর্ণের কর্ণদ্বয় ও দাঁতের দ্বারা নাসিকা ছিন্নকরে পায়ের নখের দ্বারা তার উভয় পার্শ্বদ্বয় বিদীর্ণ করে দিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে

কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে পিষ্ট করতে থাকলে সুগ্রীব হঠাৎ আকাশে বলের মত ঊর্ধে উঠে পুনরায় রামের নিকট ফিরে গেল।

সেই সময় নাসাকর্ণ বিহীন কুম্ভকর্ণর সর্বাঙ্গ শোণিত স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে ক্ষুধার্ত কুম্ভকর্ণ বানরসেনার মধ্যে প্রবেশ করে মোহবশতঃ বানর, রাক্ষস, পিশাচ বা যক্ষদের মধ্যে যাকে পেলো, তাকেই ভক্ষণ করতে লাগলেন।

যথৈব মৃত্যুর্হরতে যুগান্তে
স ভক্ষযামাস হরীংশ্চ মুখ্যান॥ (যুঃ) ৬৭।৯৪

—যেমন যম যুগাবসানে প্রাণীকে গ্রাস করেন, কুম্ভকর্ণও তেমনি মহাকায় বানরদের ভক্ষণ করতে লাগল।

ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ বানরদের খাচ্ছে দেখে বানররা রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হল। সাত, আট, বিশ, ত্রিশ এবং কোনও কোনও বারে একশত পর্যন্ত বানরকে হাত দিয়ে আক্রমণ করে কুম্ভকর্ণ ভক্ষণ করতে করতে ধাবিত হল। তারপর কুম্ভকর্ণ বানরদের প্রতি শূল নিক্ষেপ করতে লাগল। সেই সময় লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। লক্ষ্মণ সপ্ত শরে কুম্ভকর্ণের দেহ বিদ্ধ করে পুনরায় অন্য বাণ ক্ষেপণ করলে কুম্ভকর্ণ অন্যান্য অস্ত্র দ্বারা তা বিফল করল। এটা দেখে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণের সুবর্ণময় শুভ্র কবচ বাণ দিয়ে ঢেকে ফেললেন।

তখন কুম্ভকর্ণ অবজ্ঞাভরে বললেন, যমকেও যে যুদ্ধক্ষেত্রে অনায়াসে জয় করেছে, সেই কুম্ভকর্ণের সঙ্গে যে নির্ভয়ে তুমি যুদ্ধ করলে তাতে তোমার বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অস্ত্র ধারণ করে সাক্ষাৎ যমের ন্যায় আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করি, তখন আমার সঙ্গে যুদ্ধকরা দূরে থাকুক, যে আমার সামনে আসে, সেও পূজনীয়। কারণ—

ঐরাবতং সমারূঢ়া বৃতঃ সর্বামরৈঃ প্রভুঃ।

নৈব শক্রোঽপি সমরে স্থিতপূর্বঃ কদাচনঃ ॥ (যুঃ)

৬৭।১০৮

—অমর পরিবেষ্টিত ঐরাবত সমারূঢ় ইন্দ্রও পূর্বে রণস্থলে কখনও আমার সামনে অবস্থান করতে পারে না।

অদ্য ত্বয়াঽহং সৌমিত্রে বালেনাপি পরাক্রমৈঃ ॥ (যুঃ)

৬৭।১০৯

—হে সুমিত্রানন্দ, বালক হলেও তুমি আজ আমাকে পরিতুষ্ট করেছ।

শত্রুর বীরত্বের প্রশংসা করার মত উদারতা খুব কম লোকেরই থাকে। এ ক্ষেত্রে রাক্ষস কুম্ভকর্ণের এই সরল উদারতা প্রশংসার্হ।

তোমার আজ্ঞা নিয়ে রামের কাছে যেতে চাই। তোমার বীর্য, বল ও উৎসাহ দ্বারা আমি পরম পরিতোষ লাভ করেছি। রামকেই সংহার করতে আমি ইচ্ছুক। কারণ সে নিহত হলে সকলেই হত হবে। রাম নিহত হলে অবশিষ্টের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করব।

লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, হে বীর, ইন্দ্রাদি দেবতারা যে প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়েও যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার পরাক্রম সহ্য করতে পারেন না, তা সত্য, মিথ্যা নয়। আজ তোমার সেই শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখলাম। ঐ দাশরথি রাম দাঁড়িয়ে আছেন।

লক্ষ্মণের এই কথা শুনে কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে ত্যাগ করে রামের নিকট গেল। রাম রৌদ্র অস্ত্র প্রয়োগে তার বক্ষ লক্ষ্য করে শাণিত বাণ নিক্ষেপ করলেন। রামের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ ক্রোধে তাঁর দিকে ধাবিত হলে তাঁর মুখ হতে অঙ্গার মিশ্রিত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। কুম্ভকর্ণ রামের অস্ত্রে বিদ্ধ হয়ে ক্রোধে বানরদের বিধ্বস্ত করতে করতে ধাবিত হল। রামের অস্ত্র কুম্ভকর্ণের বক্ষে প্রবেশ করায় তাঁর হাত হতে গদা মাটিতে পড়ে গেল এবং অন্যান্য অস্ত্রও মাটিতে বিক্ষিপ্ত হল। যখন সেই মহাবল কুম্ভকর্ণ নিজেকে অসহায় মনে করল, তখন মুষ্টি ও

কব দিয়ে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করল। পর্বত হতে নির্গত প্রস্রবণেব ন্যায় বাণ বিদ্ধ বাক্ষস কুম্ভকর্ণেব দেহ হতে রক্তধাবা বহির্গত হতে লাগল। ভীষণ ক্রোধে ও বক্তগন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞানহীন সেই বাক্ষস বানবসেনা, রাক্ষস ও খক্ষসদের ভক্ষণ কবতে কবতে ধাবিত হল।

তাবপব কুম্ভকর্ণ বৃহৎ পর্বত শৃঙ্গ উঠিয়ে রামেব উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। কিন্তু পথিমধ্যে বাম সাতটি বাণ দ্বাবা সেই বিশাল শৃঙ্গ খণ্ড খণ্ড কবলেন। সেই শৃঙ্গ দুই শত বানবকে ভূপাতিত কবল।

এই সময় লক্ষ্মণ বামকে বললেন, এই বাক্ষসেব বানব ও বাক্ষসে ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। এই রাক্ষস বক্তগন্ধে উন্মত্ত হযে নিজেব এবং শত্রুব উভয় পক্ষেব সৈন্যদেব ভক্ষণ করছে।

নৈবায়ং বানরান্ রাজন্ ন বিজানাতি বাক্ষসান্।
মত্তঃ শোণিতগন্ধেন স্বান্ পবাংশ্চৈব খাদতি॥ (যুঃ)
৬৭।১২৮

লক্ষ্মণের উক্তি হতে কুম্ভকর্ণ কি রকম ভয়াবহ রাক্ষস ছিলেন তা উপলব্ধি করা যায় যার জন্য তাঁর শত্রু মিত্র ভেদাভেদ ছিল না। রক্ত মাংসেব গন্ধে সে উন্মত্ত।

লক্ষ্মণ বললেন, বানর নেতাবা কুম্ভকর্ণের উপব আরোহন করুক এবং যূথপতিগণ তাব উপর আবোহন কবে চাব দিকে অবস্থান করুক। এতে সে বানরদেব গুরুভাবে পীড়িত হয়ে মাটিতে ঢলে অন্য বানরদেব হত্যা করতে পারবে না।

লক্ষ্মণেব কথা শুনে বানরবা আনন্দে কুম্ভকর্ণের উপব চড়ে বসল। ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণ বানবদেব ফেলে দিল। বানবদের পড়ে যেতে দেখে ক্রুদ্ধ কুম্ভকর্ণকে দেখে বাম সবেগে ধনু ধাবণ কবল। রামেব সঙ্গে লক্ষ্মণও গেলেন। বানরবা তাঁদেব চতুর্দিকে বেষ্টন কবতে লাগল।

বাম কুম্ভকর্ণব প্রতি ধনু বিস্ফারিত কবলে, বাক্ষস সেই শব্দ সহ্য করতে না পেবে ক্রোধে বামেব প্রতি ধাবিত হল। তখন বাম বললেন হে বাক্ষসাধিপ, তুমি দুঃখ কবনা। আমি ধনু গ্রহণ করে এখানে অবস্থান

করছি। আমাকেই রাক্ষস কুলনাশক রামচন্দ্র বলে জেনো। হে বীর, তুমি মুহূর্ত মধ্যে, প্রাণহীন হবে।

তখন কুম্ভকর্ণ তাঁকেই রাম বলে চিনতে পেরে বিকৃত স্বরে হেসে ক্রোধে বানরসেনা বিধ্বস্ত করে রামের দিকে অগ্রসর হল। বিকৃত স্বরে অট্টহাস্য করে রামকে বলল—

নাহং বিরাধো বিজ্ঞেয়ো ন কবন্ধঃ খরো ন চ।
ন বালী ন চ মারীচঃ কুম্ভকর্ণঃ সমাগতঃ॥ (যুঃ)

৬৭।১৪৭

—আমি বিরাধ, কবন্ধ, খর, বালী বা মারীচ নই, আমি স্বয়ং কুম্ভকর্ণ উপস্থিত।

কুম্ভকর্ণের এই উক্তিতে তাঁর আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পেয়েছে। সে রামকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—আমার এই কৃষ্ণবর্ণ লৌহ নির্মিত বিশাল মুদ্গর দেখ। এর দ্বারা আমি পূর্বে দেব ও দানবদের জয় করেছি। নাসাকর্ণ হীন হওয়ায় তুমি আমাকে অবজ্ঞা করতে পার না। কর্ণ ও নাসিকা কর্তিত হওয়ার জন্য আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। আগে আমার দেহে তুমি স্বীয় বীর্য দেখাও, পরে তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দেখে তোমাকে ভক্ষণ করব।

রাম কুম্ভকর্ণের কথা শুনে তার প্রতি সুপুঙ্খ বাণগুলি নিক্ষেপ করলেন। বজ্রের ন্যায় বেগবান সেই বাণে আহত হয়েও দেবশত্রু কুম্ভকর্ণ ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হল না। যে সব বাণে শাল বৃক্ষ কাটা হয়েছে, বালীকে হত করা হয়েছে সেই বজ্রের ন্যায় বাণে কুম্ভকর্ণকে দুর্বল করতে পারল না। কুম্ভকর্ণ বারিধারার ন্যায় সেই বাণগুলি দেহে ধারণ করে উগ্র বেগবান মুদ্গর ঘুরিয়ে রামের বাণের বেগ রোধ করল। তা দেখে রাম বায়ব্য অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং তা নিয়ে মুদ্গর সহ কুম্ভকর্ণের বাহু ছেদন করলেন। তখন রাক্ষস ছিন্ন বাহু হয়ে তুমুল শব্দ করতে লাগলেন। সেই বাহু পিষ্ট হয়ে বহু বানর সেনা নিহত হল।

তখন বানররা এক পাশে আশ্রয় নিয়ে রামের সঙ্গে কুম্ভকর্ণের ভয়ানক যুদ্ধ দেখতে লাগল। কুম্ভকর্ণ অপর হাতে একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে রামের প্রতি ধাবিত হল। তখন রাম সুবর্ণ চিত্রিত ঐন্দ্রাস্ত্র যুক্ত বাণে শাল বৃক্ষ সহ কুম্ভকর্ণের অপর বাহুও কেটে ফেললেন। কুম্ভকর্ণের পর্বতের ন্যায় সেই ছিন্ন বাহু ভূতলে পতিত হয়ে অনেক বৃক্ষ, শৈল, বানর ও রাক্ষসদের বিনষ্ট করল।

তারপর রামচন্দ্র ছিন্নবাহু সেই রাক্ষসকে সহসা শব্দ করতে করতে আসতে দেখে দুটি শাণিত অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করে তার পদদ্বয় কেটে ফেললেন। তার সেই পদদ্বয়ও দিক বিদিক, গিরি গহ্বর, মহার্নব, লঙ্কা বানর ও রাক্ষস সেনাদের উপর পতিত হল।

তখন ছিন্ন বাহু ছিন্ন পদ কুম্ভকর্ণ মুখ ব্যাদান করে গর্জন করে রামের প্রতি ধাবিত হল। তা দেখে রাম তীক্ষ্ণাগ্র বাণে রাক্ষসের মুখবিবর পূর্ণ করলেন। তখন বাণ সমূহে মুখ বিবর পূর্ণ হলে কুম্ভকর্ণ কথা বলতে অসমর্থ হয়ে অস্ফুট শব্দ করে মূর্চ্ছিত হল। রাম কুম্ভকর্ণের শির লক্ষ্য করে ভীষণ একটা বাণ নিক্ষেপ করে তার মস্তক ছিন্ন করেন। পর্বতের ন্যায় ঐ ছিন্ন মস্তকটি লঙ্কায় পতিত হয়ে চর্যাগৃহ, গোপুর ও প্রাচীরকে ভগ্ন করে এবং কুম্ভকর্ণের মস্তকহীন দেহ সমুদ্রে পতিত হয়ে অনেক জলজ প্রাণীর প্রাণ হরণ করে।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে দেব ও ব্রাহ্মণগণ হর্ষ ধ্বনি করতে লাগলেন। তারপর দেবতা, দেবর্ষি, মহর্ষি, পন্নগ, সুপর্ণ, গুহ্যক, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বরা সকলে রামকে দেখে বিশেষ আনন্দিত হলেন। বানরাও অত্যন্ত হৃষ্ট হল।

কুম্ভকর্ণ নিজে ধার্মিক হয়ে দুরাত্মা রাবণের অন্যায় কাজে সহায়তা করা কুম্ভকর্ণ চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক। এখানে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কাছে অন্য সব নৈতিক বিচার পরাজয় স্বীকার করেছে।

কুম্ভকর্ণ কেবল পরাক্রান্তই ছিল না, কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মার আশীর্বাদও লাভ করেছিল। রাক্ষসকুলে জন্ম গ্রহণ করেও

সে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মাচরণ করত।

পরস্ত্রী হরণের জন্য কুম্ভকর্ণ অগ্রজ রাবণকে ভর্ৎসনা করতে দ্বিধা করেনি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন প্রকার মিথ্যা বা ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করাকে সে ঘৃণা করত। রাজনীতি বিষয়েও যে সে বিশেষ দক্ষ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাবণের প্রতি কুম্ভকর্ণের উপদেশাবলী হতে। অগ্রজ অন্যায় করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কুম্ভকর্ণের সাহায্য প্রার্থী, সেই জন্য কুম্ভকর্ণ তার জীবন দিয়ে অগ্রজের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরের মৃত্যু বরণ করে।

মহাভারত কাব্যে ভীম কুন্তীর দ্বিতীয় পুত্র, পাণ্ডুর অন্যতম ক্ষেত্রজ সন্তান। ভীমের অন্য পরিচয় পবন নন্দন। কারণ পবনের ঔরসে ভীমের জন্ম।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর পুত্র দুর্যোধন ও কুন্তীর পুত্র ভীম একই দিনে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ভীমসেনের জন্ম দিবা ভাগে আর দুর্যোধনের জন্ম রাত্রিতে। ভীমের জন্ম লগ্নে দৈববাণী হয়েছিল—

সর্বেষাং বলিনাং শ্রেষ্ঠো জাতোঽযমিত ভারত। (আদি) ১২২।১৫
— সমস্ত বলবানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই ভারত জন্ম গ্রহণ করল।

ভীমের অন্য নাম বৃকোদর। জন্মাবার অল্প দিন পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ভীমের জন্মের দশম দিনে বাঘের ভয়ে ভীত হয়ে কুন্তী উঠে দাঁড়াতে তাঁর কোলে যে ভীম ছিল তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ভীম মাতার কোল থেকে এক শিলার উপর পড়লেন, তাঁর শরীরের চাপে শিলাটি চূর্ণ হয়ে গেল। পরাক্রম ও মহাবাহুর গৌরবে তাঁর নাম ভীমসেন রাখা হয়েছিল।

শৈশবকাল হতেই ভীম নানা প্রকার ক্রীড়ায় সর্বাধিক শক্তির ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। দৌড়ে, সাঁতারে, বেগে চলা, ব্যায়াম অভ্যাসে ইত্যাদি নানা প্রকার খেলা ধূলায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। এই সব খেলার সময় ভীম খেলাচ্ছলে কৌরব ভ্রাতাদের নানা ভাবে বিব্রত করতেন, যদিও তাঁর মনে কোন প্রকার বিদ্বেষ বা হিংসার ভাব ছিল না। নিছক বালক সুলভ চপলতা ও চঞ্চলতা মাত্র, তথাপি তাঁর শক্তির জন্য তিনি দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতাদের ঈর্ষার কারণ হয়েছিলেন।

একদিন দুর্যোধন খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ভীমকে খাওয়ালেন। কিন্তু বৃকোদর সেই খাবার স্বচ্ছন্দে পরিপাক করে ফেললেন। পুনরায় দুর্যোধন গঙ্গাতীরে নানা প্রকার খাদ্যের আয়োজন করে পাণ্ডবদের

জলক্রীড়া করার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। দুর্যোধনের অভিপ্রায় ছিল ঘুমন্ত অবস্থায় ভীমকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে তিনিই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করবেন। কৌরব ও পাণ্ডবরা সেখানে নানা প্রকার ভোগ্য দ্রব্য উপভোগ করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা খেলতে খেলতে একজন অপরের মুখে খাবার ছুড়ে দিতে লাগলেন। দুর্যোধন সেই সুযোগে ভীমকে বধ করবার ইচ্ছায় কালকূট মিশ্রিত কিছু খাবার ভীমের মুখে ছুড়ে দিলেন। অন্যান্য পাণ্ডবরা প্রমাণকোটির গৃহে যখন শুয়েছিলেন, তখন ভীম ঠাণ্ডা বাতাসে শ্রান্তি ও বিষক্রিয়ায় গভীর নিদ্রাভিভূত হলেন। এ সুযোগে দুর্যোধন ভীমের হাত পা শক্ত করে বেঁধে জলে ফেলে দিলেন।

ভীমসেন অচেতন অবস্থায় জলে ডুবে নাগ লোকে গিয়ে পড়লেন এবং সেখানে বহু নাগের উপর চেপে পড়লেন। নাগরা তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ফণা বিস্তার করে ছোবল মারতে ও কাটতে লাগল। তাদের দংশনে ভীমের শরীরের কালকূট বিষের ক্রিয়া নষ্ট হল। চেতনা ফিরে পেয়ে ভীম সাপ মারতে শুরু করেন। তখন সর্পরা নাগরাজ বাসুকির শরণাপন্ন হলো।

বাসুকি তাঁর দৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলে ভীমকে চিনতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে প্রচুর ঐশ্বর্য ও প্রভূত রসায়ন পান করতে দেন।

ভীম স্বস্ত্যয়ন করে শুচি হয়ে পূর্ব মুখ হয়ে—
একোচ্ছ্বাসাৎ ততঃ কুণ্ডং পিবতি স্ম মহাবলঃ।
এবমষ্টৌ স কুণ্ডানি হ্যপিবৎ পাণ্ডু নন্দনঃ॥ (আঃ)
১২৭।৭১

—মহাবল ভীম, এক নিঃশ্বাসে এক এক কুণ্ড রস পান করলেন। এইরূপে তিনি আট কুণ্ড রস পান করলেন।

রসায়ন পানের পর ভীম সাতদিন নাগলোকে উত্তম শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন। অষ্টম দিনে নিদ্রা ভঙ্গের পর রসায়ন পান করার ফলে

অযুত হস্তীর বল লাভ করে ভীম গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গৃহে ফিরে সমস্ত ঘটনা তিনি অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের নিকট প্রকাশ করেন ঃ—

যে প্রকারে দুর্যোধন করিল বন্ধন ॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে ॥
নাগের দংশনে মোর চেতন হইল।
কৃপায় বাসুকি—নাগ বহুধন দিল ॥
এত বলি রত্ন সব দিল মাতৃ স্থানে। (আদি)

যুধিষ্ঠির এই প্রসঙ্গে নীরব থাকতে ভীমকে পরামর্শ দিলেন। অতঃপর দুর্যোধন স্বহস্তে গলা টিপে ভীমের সারথিকে হত্যা করলেন। দুর্যোধন পুনরায় ভীমের খাবারের সাথে তীব্র কালকূট মেশালেন। বৈশ্যপুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবদের হিতার্থে সেই খবর তাঁদের কাছে প্রকাশ করেন। ভীম তা গ্রাহ্য না করে সেই বিষ পরিপাক করে ফেললেন। যদিও ঐ বিষ খুব তীব্র ছিল, তথাপি ভীমের কোন বিকার দেখা গেল না। কারণ ভয়ঙ্কর শরীরধারী ভীম সেনের উদরে বৃক নামে অগ্নি ছিলেন তিনিই ঐ বিষ পরিপাক করলেন।

ভীম কৌরব ও অন্যান্য পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র বিদ্যা শিখেছিলেন। ভীম ও দুর্যোধন বলরামের নিকট গদা যুদ্ধও শিখেছিলেন। ভীম গদা যুদ্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, তদপুরি তাঁর শারীরিক বিক্রমের জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ভয় ও সন্ত্রাসের কারণ হয়েছিলেন।

একদিন কৌরব ভ্রাতা ও পাণ্ডব ভ্রাতাদের অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শনীর সময় কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তখন গুরু কৃপাচার্য বলেছিলেন রাজা বা রাজপুত্র ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গে অর্জুন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করতে পারেন না। কৃপাচার্য কর্ণকে আত্ম পরিচয় দিতে আহ্বান করলেন। কর্ণ লজ্জায় নীরব রইলেন। ঐ সঙ্কট

মুহূর্তে দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করলেন। এই সংবাদ পেয়ে সারথি অধিরথ ঘর্মাক্ত ও কম্পিত দেহে লাঠির সাহায্যে প্রদর্শনীতে প্রবেশ করলেন। কর্ণ সকলের সামনে তাঁকে প্রণাম করলেন। তা দেখে ভীম বেশ কঠিন উপহাস করে কর্ণকে বললেন—

তুমি সূতপুত্র। অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করে মরবার অধিকারও তোমার নেই। তুমি তোমার যোগ্য কাজ কর গে। অর্থাৎ তোমার কুলধর্ম মতে ঘোড়ার চাবুক হাতে নাও। ভীম উপহাস করে আরও বললেন, কুকুর যেমন যজ্ঞের ঘি বা পশুমাংস হজম করতে পারে না, অঙ্গরাজ্য তোমার কাছে ঐরূপ হবে। (কর্ণ চরিত্র দ্রষ্টব্য।)
ভীম খুবই স্পষ্টবাদী ছিলেন। অপ্রিয় সত্য বলতে যদিও পণ্ডিতেরা নিষেধ করেছেন ভীম তা গ্রাহ্যই করতেন না। ভীমের ঐ ব্যঙ্গ কর্ণের রাগ, দ্বেষ ও হিংসার আগুনে ইন্ধন যোগালো মাত্র।

অর্জুন দ্রুপদরাজকে জয় করলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র শঙ্কিত হলেন। অন্যদিকে পাণ্ডবদের প্রতি প্রজাপুঞ্জের গভীর অনুরাগ দুর্যোধনকে ভাবান্বিত করল।

অতঃপর দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ পুত্রদের সঙ্গে কুন্তীকে পুড়িয়ে মারবার এক ষড়যন্ত্র করলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র গোড়ার থেকে পাণ্ডবদের সুনজরে দেখছিলেন না। কিন্তু ধর্মের ভয়ে খোলাখুলি কোন বিরূপ পথ নিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। দুর্যোধন সামান্য কুট কৌশলে কুন্তীসহ তাঁর পুত্রদের বারণাবতে নির্বাসন দেবার ষড়যন্ত্রে তাঁর সম্মতি আদায় করলেন। (যুধিষ্ঠির চরিত্র দষ্টব্য)

পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীসহ বারণাবতে যেতে বাধ্য হলেন। বিদুর পূর্বাহ্নেই যুধিষ্ঠিরকে তাঁদের বারণাবতে পাঠাবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন। বিদুর তাঁদের সেখান থেকে পালাবার সব ব্যবস্থা করেছেন সে খবরও যুধিষ্ঠিরকে জানালেন।

জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় ও সুযোগ উপস্থিত হয়েছে যুধিষ্ঠির

বুঝতে পারলেন। তখন ভীমসেনকে জতুগৃহে আগুন দিতে বললেন। ভীমসেন প্রথমে পুরোচনের ঘরে সঙ্গে স ঙ্গ জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে বিদুরের লোক যে গুপ্ত সুরঙ্গ পথ খনন করে রেখেছিল সেই সুরঙ্গ পথ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। ঐরূপ সঙ্কট মুহূর্তে পাণ্ডব ভ্রাতারা ও মাতা কুন্তী ভয়ে ও নিদ্রালু হয়ে পথ চলতে পারছিলেন না। এ অবস্থায় ভীম

স্কন্ধমারোপ্য জননীং যমাবঙ্কেন বীর্যবান্।
পার্থৌ গৃহীত্বা পানিভ্যাং ভ্রাতরৌ সুমহাবলঃ॥
উরসা পাদপান ভঞ্জন মহীং পদ্ভ্যাং বিদারয়ন্।
স জগামাশু তেজস্বী বাতরংহা বৃকোদরঃ॥ (আঃ)
১৪৭।১১-১১

—বীর্যবান ও মহাবলশালী বৃকোদর মাতাকে কাঁধে করে যমজ দুই ভাই নকুল সহদেবকে দু কোলে এবং অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের হাত ধরে বক্ষাঘাতে গাছগুলিকে ও পায়ের আঘাতে মেদিনী বিদীর্ণ করে বায়ু বেগে পথ চলতে লাগলেন।

ভীমের সিংহ স্কন্ধ, বাহুদ্বয় অতীব দীর্ঘ, কুম্বকণ্ঠ মত্ত হস্তীর মত বেগবান ও দেহ তাঁর অতীব সুদৃঢ় ছিল।

কবি উপরের শ্লোকে ভীম সেনের তিনটি অপূর্ব গুণবত্তার বর্ণনা করেছেন—ভীমের অতুল পরাক্রম, কর্তব্যবোধ ও আত্মজনের প্রতি একনিষ্ঠতা। অতঃপর গঙ্গা পার হয়ে পাণ্ডবরা বন মধ্যে প্রবেশ করলেন। হিংস্র জন্তু সংকুল সেই বনে ভীম প্রত্যেক রাতে অতন্দ্র থেকে অন্যান্য ভ্রাতাদের ও মাতার নির্বিঘ্ন নিদ্রার ব্যবস্থা করেন। সেই অরণ্যে রাক্ষস হিড়িম্ব তাঁদের হত্যা করবার জন্য তার ভগ্নী হিড়িম্বাকে পাঠিয়ে ছিল। রাক্ষসী হিড়িম্বা ভীমের রূপে মুগ্ধ হয়ে মানবী রূপ নিয়ে এসে তাঁকে পতি রূপে কামনা করলে উত্তরে ভীম বলেন—

দেখি তোরে সুলক্ষণী, কহিস্ অনীতি বাণী,

এই কথা না সম্ভবে লোকে।
কেন হেন দুরাচারী, ভ্রাতৃ-মাতৃ পরিহারি।
স্ত্রী লইয়া যাইব কৌতুকে॥
সবারে রাক্ষস-মুখে, দিয়া আমি যাব সুখে,
তোমারে লইয়া অন্য স্থানে।
করিতে এমন কাজ, মুখে তোর নাহি লাজ
কামনারে হইলি অজ্ঞান। (আদি)
ন হি মে রাক্ষসা ভীরু সোঢ়ুং শক্তাঃ পরাক্রমম্।
ন মনুষ্যা ন গন্ধর্বা ন যক্ষাশ্চারুলোচনে॥ (আঃ)

১৫১।৩৫

—হে ভীরু চারুলোচনে, তুমি জান না যে আমার পরাক্রম সহ্য করবার মত কোন মানুষ, যক্ষ রাক্ষস বা গন্ধর্ব নেই।

তোমার দুরাত্মা ভাইয়ের ভয়ে আমি সুখে নিদ্রিত এই ভাইদের ও মাকে জাগাতে পারবো না।

ভীমের স্নেহ কত প্রবল ও কর্তব্য জ্ঞান কত প্রখর ছিল তাঁর এই উক্তি তা প্রমাণ করে। আপন শক্তি নিয়ে দম্ভ করা তাঁর পক্ষে শোভনীয়।

ভগ্নীর বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব রাক্ষস স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ভগ্নীর মানবী রূপ দেখে সে ক্রুদ্ধ হয়। ভীমের গর্জনে ক্রুদ্ধ হয়ে হিড়িম্ব ভীমের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। ভীম তাকে বধ করল। ভ্রাতাকে বধ করার পর ভীম হিড়িম্বাকে বধ করতে উদ্যত হলে যুধিষ্ঠিরের নিষেধে তিনি বিরত হন।

হিড়িম্বা ভীমকে বিয়ে করতে চাইলে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম এক সর্তে বিয়ে করতে সম্মত হন যে যতদিন হিড়িম্বার কোন পুত্র না হয়, ততদিন কেবল ভীম তার সঙ্গে থাকবেন। যুধিষ্ঠির হিড়িম্বাকে বললেন ভীম স্নান আহ্নিক করে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং সূর্যাস্ত হলেই সে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

ভীমের এই প্রকার আচরণ তাঁর ভ্রাতৃভক্তির এক নিদর্শন। কিছুকাল পর হিড়িম্বা একটি ভীষণাকার পুত্রের জননী হল। হিড়িম্বার পুত্র জন্মাবার পরক্ষণেই যৌবন প্রাপ্ত হলো। তার মাথা ঘটের মত ও চুল খাড়া ছিল বলে হিড়িম্বা পুত্রের নাম দিল ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ কুন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাতা হিড়িম্বার সঙ্গে চলে গেল। (যুধিষ্ঠির ও কুন্তী চরিত্র দ্রষ্টব্য।)

ঐ অরণ্য ছেড়ে পাণ্ডবেরা নানা দেশ পরিক্রম করে অবশেষে ব্যাসদেবের নির্দেশে একচক্র নগরে এক ব্রাহ্মণ গৃহে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবরা জটা ও বল্কল পরে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতেন।

অর্ধং তে ভুঞ্জতে বীরাঃ সহ মাত্রা পরন্তপাঃ।
অর্ধং সর্বস্য ভৈক্ষস্য ভীমো ভুঙ্‌ক্তে মহাবলঃ॥ (আ) ১৫৬।৬

—শত্রুনাশক বীর ভ্রাতারা মাতার সঙ্গে ভিক্ষালব্ধ অর্ধেক অন্ন ভোজন করতেন এবং অপর অর্ধেক মহাবল ভীমই খেতেন।

আহারের এই পরিমাণ হতেও বোঝা যায় তিনি অত্যাহারী ছিলেন এবং তাঁর বৃকোদর নাম সার্থক।

একদিন তাঁদের আশ্রয়দাতার গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠল। করুণার প্রতিচ্ছবি কুন্তী তা সহ্য করতে না পেরে ভীমসেনকে বললেন, এ ব্রাহ্মণের গৃহে নিশ্চয় কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে। যদি আমাদের দ্বারা কিছু উপকার করা সম্ভব, তা করা খুবই উচিত। ভীম বললেন, ইহাদের কি দুঃখ আপনি তা অনুসন্ধান করুন। তা কঠিন কাজ হলেও সাধিত হবে। (ব্যবসিষ্যামি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্) অনুসন্ধানে মাতা কুন্তী জানলেন ঐ নগরের নিকট বক নামে এক রাক্ষস বাস করে। সেই ঐ দেশের প্রভু। ঐ দেশের রাজা তাঁর রাজধানী বেত্রকীয় গৃহ নামক স্থানে থাকেন। তিনি নির্বোধ ও দুর্বল। প্রজা রক্ষার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বক রাক্ষস এই দেশ রক্ষা করে এবং তার নজরানা

স্বরূপ নগরবাসীদের প্রতিদিন একজন লোক পাঠাতে হয়। প্রচুর অন্ন ও দুইটি মহিষ সহ। বক রাক্ষস ঐ মানুষ, মহিষদ্বয় ও অন্ন ভোগ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

সেই দিনই গৃহস্বামীর বাড়ীর পালা। পরিবারে এক পুত্র, এক কন্যা ও স্বামী স্ত্রী। তাঁদের মধ্যে বক রাক্ষসের বলি হবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। তাঁদের অর্থাভাব। সুতরাং অর্থ দিয়ে অন্য কোন লোক কিনে রাক্ষসের কাছে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁদের নেই। এই জন্যে এ পরিবার বিষাদমগ্ন ও ক্রন্দনের রোল।

সব শুনে মাতা কুন্তীর মন দয়ায় গলে গেল। তিনি ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর পঞ্চ পুত্রের মধ্যে একজন রাক্ষসের কাছে খাবার নিয়ে যাবে।

রাক্ষসায় চ তৎ সর্বং প্রাপয়িষ্যতি ভোজনম্।
মোক্ষয়িষ্যতি চাত্মানমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥

(আঃ) ১৬০।১৫

—আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে—আমার এই পুত্র সেই রাক্ষসের কাছে ভোজনও পৌঁছিয়ে দেবে এবং নিজেকেও রক্ষা করবে।

আমার এই পুত্র ইতিপূর্বে বহুবার বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বহু বলবান বিশাল শরীর রাক্ষস দেখেছে ও বধ করেছে।

অতঃপর ভীমসেন খাদ্য নিয়ে সেই রাক্ষস যেখানে থাকে সেখানে গেলেন। ভীম আনিত খাদ্য নিজেই খেতে খেতে রাক্ষসের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তাতে বক রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যেখানে ভীম তার জন্য আনীত খাদ্য খাচ্ছিলেন, সেখানে গিয়ে হাজির হল। দীর্ঘ দেহধারী রক্তচক্ষু এক বিরাটকায় রাক্ষস চোখ বিস্ফারিত করে ক্রোধের সঙ্গে বলল—আমার জন্য প্রেরিত এ অন্ন তুমি কে খাচ্চ? (কোহ্ যমন্নদিং তুঙ্ক্তে মদর্থসুপকল্পিতম) ভীমসেন তার কথায় কান না দিয়ে উল্টো মুখ হয়ে খাবার খেতে লাগলেন। তখন সেই নরখাদক দু বাহু তুলে ভীমসেনকে বধ করবার জন্য ধাবিত

হলো। ভীমসেন তাকে অগ্রাহ্য করে কখনো কখনো তার দিকে তাকিয়ে খাদ্যদ্রব্য খেতে লাগলেন। রাক্ষস ভীমের এই প্রকার তাচ্ছিল্য সহ্য করতে না পেরে ভীমসেনের পিঠে বসে দু হাতে আঘাত করতে লাগলো। ভীম ঐ আঘাত অগ্রাহ্য করে খেয়েই চললেন। রাক্ষস অত্যন্ত রেগে গিয়ে একটি গাছ উপড়ে নিয়ে ভীমের দিকে ধেয়ে গেল। ইত্যবসরে ভীমসেন রাক্ষসের জন্য আনীত সমস্ত খাবার শেষ করে মুখ হাত ধুয়ে রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দাঁড়ালেন। রাক্ষস সেই গাছটি ভীমের দিকে ছুঁড়ে মারলে, ভীম বাঁ হাতে তা ধরে ফেললেন। তখন দুই বীরের মধ্যে গাছ ছোঁড়াছুঁড়ি হতে লাগল। রাক্ষস যখন ভীমসেনকে দুই হাতে ধরে ফেললো, ভীমসেন তাকে বুকে চেপে ধরে তাকে আকর্ষণ ও নিক্ষেপ করতে লাগলেন। দুই বীরের প্রচণ্ড দাপটে মেদিনী কাঁপছিল ও বৃক্ষাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হলো। তারপর ভীমসেন জানুর আঘাতে এক হাতে তার মাথা অন্য হাতে কটিদেশ ধরে তাকে দুমড়িয়ে ফেললেন। রাক্ষসের মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ায় সে প্রচণ্ড চিৎকার করে প্রাণ ত্যাগ করল।

ভীমের বক রাক্ষস বধে শঙ্কিত হয়ে রাক্ষসের জ্ঞাতিবর্গ সে দেশ ছেড়ে চলে গেল।

মহাভারতের এই আখ্যায়িকার সঙ্গে "বিউলফ" ইংলিশ মহাকাব্যের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য দেখা যায়।

হ্রথগার নামে ডেনমার্ক দেশীয় রাজার রাজপ্রাসাদ গ্রেণ্ডেল নামে এক রাক্ষসের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। রাত্রে যখন এই প্রাসাদ আনন্দ উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠত, তখন কোথা হতে এই রাক্ষস হঠাৎ এসে রাজার অনুচর বর্গের মাধ্য একজনকে নিয়ে উধাও হতো এবং তার রক্ত মাংসে নিজের ক্ষুধা মিটাত। এই রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বীর পুরুষ সে দেশে ছিল না। অগত্যা রাজাকে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করতে হত। এই সংবাদ চারদিকে

ছড়িয়ে পড়ল।

এক প্রতিবেশী রাজ্যের বিউলফ নামে এক রাজপুত্র এই রাক্ষস দমনের জন্য সমুদ্র যাত্রা করতে প্রস্তুত হলেন। একদিন তিনি হ্রথগার প্রাসাদে এসে রাক্ষসের নৈশ অভিযানের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। তারপর রাক্ষস আসলেই দুজনের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল। মহাভারতে ভীমের বক রাক্ষস, কির্মীর, হিড়ম্ব প্রভৃতি রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধের যেমন বর্ণনা আছে, এখানেও তেমনি যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত বিউলফ রাক্ষসের একটা বাহু কেটে ফেললে রাক্ষস আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে সমুদ্রের তলায় গুহায় আশ্রয় নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। পরদিন রাত্রে আবার রাক্ষস জননী পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে রাজপ্রাসাদে হানা দিল। আবার হলো বিউলফের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের বিক্রম সহ্য করতে না পেরে রাক্ষসী জলের নীচে দুর্গে আশ্রয় নিল। এবার বিউলফ শত্রুকে নিঃশেষ করবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এবং শত্রুকেও নিঃশেষ করে বহু বিলম্বে ফিরলেন।

সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণ অতিথির নিকট রাজা দ্রুপদ কন্যার স্বয়ংবরের খবর পাণ্ডব পরিবার জানতে পারলেন। ব্যাসদেবও এসে পাণ্ডবদের দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত শোনালেন। এবং বললেন সেই রাজকন্যা পঞ্চপাণ্ডবের পত্নী রূপে নির্দিষ্ট। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের খবর দিয়ে সেই সভায় উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করতে পরামর্শ দিলেন।

দক্ষিণ পাঞ্চালে এসে পাণ্ডবেরা ভার্গব নামক এক কুম্ভকারের অতিথি হলেন এবং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করে বাস করতে থাকেন। লোক মুখে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সংবাদ শুনে পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণবেশে সেই সভায় উপস্থিত হলেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। অর্জুনকে ব্রাহ্মণ মনে করে দ্রুপদ রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যা সম্প্রদান করছেন দেখে সমাগত পাণিপ্রার্থী

ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ দ্রুপদ রাজাকে আক্রমণ করলেন।

ভীম ও অর্জুনের বীরত্বের কাছে সকলেই পরাভূত হলেন। এমন কি কর্ণ এবং শল্যও পরাজিত হলেন। ভীমার্জুন দ্রৌপদীকে নিয়ে তাঁদের আবাসে কুম্ভকারের গৃহে এসে হৃষ্ট মনে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে বললেন—মা, আমরা ভিক্ষা নিয়ে এসেছি।" (অর্জুন চরিত্র দ্রষ্টব্য)

কুন্তী ঘরের ভিতর বললেন পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও। তাঁরা নিকটে গেলেন। কুন্তী সকলকে স্নেহ চুম্বন করলেন। সকলের পিছনে কৃষ্ণাকে দেখে জিজ্ঞেস করেন ঃ—

কেবা এ সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে ॥

উত্তরে—ভীম বলে জননী এ দ্রুপদ দুহিতা।

এক চক্রা নগরে শুনিলা যার কথা ॥

ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।

তোমার প্রসাদে জয় সর্বত্র জন্মিল ॥

এই ভিক্ষা হেতু মাতা হইল রজনী।

অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্নপানী ॥ (আদি)

মাতৃ আজ্ঞায় ও ব্যাসদেবের নির্দেশে পঞ্চ ভ্রাতা কৃষ্ণাকে বিয়ে করলেন। এক নারীর পাঁচ স্বামী। এ জন্য ভবিষ্যৎ কলহ নিবারণের জন্য দেবর্ষি নারদের উপদেশ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। (যুধিষ্ঠির চরিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মেছিল। তাঁর নাম সুতসোম।

কাশীদাসী মহাভারতে দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ংবর সভা হতে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব লক্ষ্মণাকে সব নৃপতিদের সামনে হরণ করে নিয়ে গেলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে—

দুর্যোধন বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।

তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ ॥

ভাই ভাই বলি যাবে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক—দুহিতা।
পুত্র-কাম কৈল চুরি বজ্রনাভ-সুতা॥
পৌত্র চুরি করলেন বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী॥ (আঃ)

যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে কৃষ্ণ নিন্দা হতে বিরত থাকতে বললেন; এবং সতর্ক করে দিয়ে বললেন, কৃষ্ণ নন্দনকে বধ করলে কুরুকুলে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। প্রত্যুত্তরে দুর্যোধন তাঁকে বলেন—

.. ..যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লৈয়া এই কালে॥
এখনি শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব দুষ্টেরে আমি না ডরাই॥ (আঃ)

যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা পেয়ে ভীম শাম্বকে রক্ষা করতে ছুটলেন। তিনি দুঃশাসনকে দেখে—

বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাত হৈতে খড়্গ চর্ম লইল কাড়িয়া॥
তাহাকে বলিল তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥
ধর্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাছুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি।
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বোরে।
— — — —
ভীম বলে দুর্যোধন ছন্ন হৈল মতি॥
কি দেখিয়া এত গর্ব হইল তোমার॥
কৃষ্ণ পুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার॥
কে আসে আসুক দেখি তাহার বদন।

গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
চক্রি চক্র প্রায় ফিরে মস্তক উপর ॥ (আঃ)

পাণ্ডব সখা ও পাণ্ডবদের মামাতো ভাই কৃষ্ণের পুত্র শাম্বকে ভীমই সেবার দুর্যোধনের রোষবহ্নি হতে রক্ষা করেন।

নিয়মভঙ্গ জনিত অপরাধে অর্জুন বার বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য পালনার্থে বনে গমন করেন। তখন তিনি প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হন এবং সেখানে কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করেন। কিন্তু সুভদ্রার সহোদর ভ্রাতা বলরাম অর্জুন অপেক্ষা দুর্যোধনকে সুপাত্র মনে করে দুর্যোধনকে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠালেন। এদিকে পূর্বেই অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার গান্ধর্ব মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়।

দুর্যোধন বরবেশে যাত্রার ব্যবস্থা করলেন এবং যুধিষ্ঠিরকেও দূত পাঠিয়ে তাঁর বিবাহে যোগদান করতে বলেন।

দুর্যোধন—বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন তোরা সবাই অবোধ ॥
হেথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূর দেশ।
এইখানে কি হেতু করিলা বরবেশ ॥
দুঃশাসন বলে কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পাব যদি আইস পশ্চাতে ॥
ভীম বলে ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে ॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা— বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল ॥
অকারণে সভা-মধ্যে গিয়ে পাবে লাজ।
তেই ত বলিনু বরবেশে নাহি কাজ।
পাছু কেন যাব আমি যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে ॥ (আঃ)

রসিক ভীম দুর্যোধনকে সভাস্থলে লাঞ্ছিত হতে দেখতে ইচ্ছা করেন না। তাই পূর্বাহ্নেই, তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। এখানেও তাঁর সরলতা প্রকাশ পেয়েছে। যদিও দুর্যোধনের হাতে লাঞ্ছনা ব্যতীত অন্য কোন রূপ ব্যবহার ভীমের ভাগ্যে জোটেনি। তবুও স্বাভাবিক সরলতার দরুণ ভীম দুর্যোধনকে পূর্বাহ্নেই হুঁসিয়ার করে দিতে ভুল করলেন না।

বেদব্যাসের মহাভারতে এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ নেই।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের উদ্যোগ করলে, কৃষ্ণ তাঁকে পরামর্শ দিলেন, মগাধিপতি জরাসন্ধকে বধ না করলে যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে না। জরাসন্ধ ছিয়াশিজন নৃপতিকে বন্দী করে রেখেছেন। আরও চৌদ্দ জনকে বন্দী করতে পারলে পাশুপত যজ্ঞে তাঁদের বলি দেবেন। সেই রাজাদের মুক্ত করতে না পারলে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে না।

জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের থেকে বিস্তৃত শুনে যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলে ভীম তাঁকে উৎসাহিত করে বললেন, কৃষ্ণ, অর্জুন, ও আমি—আমরা এই তিনি জনই জরাসন্ধকে বধ করতে সমর্থ।

কৃষ্ণে নয়ো ময়ি বলং জয়ঃ পার্থে ধনঞ্জয়।

(সভা) ১৫।১৩

—কৃষ্ণের বুদ্ধি, অর্জুনের কৌশল ও আমার শক্তিতে অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধ হবে।

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণের বেশে মগধ যাত্রা করেন। তাঁরা জরাসন্ধর অর্ঘাদি উপহার প্রত্যাখ্যান করলে, জরাসন্ধ তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। তখন কৃষ্ণ তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন এবং তাঁদের তিনজনের যে কোন একজনের সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

তখন জরাসন্ধ ভীমকে সম্বোধন করে বললেন—হে ভীম, আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব। কারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে যুদ্ধে হেরে যাওয়া বরং ভাল। (সার্দ্ধং শ্রেয়সা নির্জিতং বরম্।)

জরাসন্ধর মত মহাবীর ভীমকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে অভিহিত করার মধ্যে ভীমের বাহুবলের স্বীকৃতির প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর ভীমের সঙ্গে জরাসন্ধ বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

কিন্নু স্যাদ্ধিমবান্ ভিন্নঃ কিন্নু স্বিদ্ দীর্য্যতে মহী।
ইতি বৈ মাগধা জজ্ঞুর্ভীমসেনস্য নিঃস্বনাৎ॥ (সঃ) ২৪।১০

—মগধবাসীগণ ভীমের হুঙ্কার শুনে ভাবতে লাগল—এ কি হিমালয় ধ্বসে পড়ল না পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে গেল।

ভীম জরাসন্ধকে শতবার ঘুরিয়ে জানু দ্বারা আকুঞ্চন পূর্বক তার পিঠ নিষ্পেষণ করে ভেঙ্গে ফেললেন এবং সিংহনাদ করতে লাগলেন। এর পর ভীম তাঁর দুই পা ধরে টান দিয়ে তাঁর দেহ দ্বিধা বিভক্ত করলেন। এই ভাবে ভীম জরাসন্ধকে বধ করলেন।

তারপর বন্দী রাজাদের মুক্ত করে জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন। ভীমের পরাক্রমেই জরাসন্ধের মত এমন দুর্বৃত্তকে বধ সম্ভব হয়েছিল।

প্রবল পরাক্রমের এক কঠোর পরীক্ষায় জয়ী হয়ে ভীম যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সহায়তা করলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে অন্য চার পাণ্ডব দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন। ভীম বিশাল সৈন্য নিয়ে পূর্ব দিকে গিয়েছিলেন। তিনি পাঞ্চাল, গণ্ডকীয়, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দনগর প্রভৃতি দেশ জয় করে চেদি, কোশল, অযোধ্যা, কাশী, মৎস্য, তাম্রলিপ্ত, কর্বট, সুহ্ম এবং ব্রহ্মপুত্র নদ ও পূর্ব সাগরের তীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছ দেশ জয় করে বহু ধনরত্ন আহরণ করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে গেলেন।

কাশীদাসী মহাভারতে যজ্ঞকালে ভীমের নির্দেশে চারজন নৃপতিকে তাঁর অনুচরেরা বন্দী করে রাখেন। যেহেতু তাঁরা দুজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে উপহাস করেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে নির্দেশ দিলেন রাজাদের মুক্ত করে দিতে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের এভাবে অনাদর করা যুক্তি

সঙ্গত নয়। ক্রিয়া কর্মে বহু দুর্জন ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে থাকে, তাদের ক্ষমা না করলে ক্রিয়া কর্মে বিঘ্ন হয়।

বৃকোদর বলে শুন দেবকী নন্দন।
দোষ মত শাস্তি যদি না পায় দুর্জন॥
আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ ইথে কর্ম পূর্ণ কোন মতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী নাহি ছাড়ে নিজ দুষ্ট পণ॥
দুষ্ট জনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম ধ্বংস হয়॥ (সঃ)

ভীমের এই উক্তিতে প্রখর নীতি জ্ঞানের ও বাস্তব বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের রক্ষণ—এই নীতি অবলম্বন করেই তিনি চলতেন। দুর্জন রাজা, উজীর—যেই হোক্ ভীমের নিকট কারো পরিত্রাণ ছিল না।

তখন কৃষ্ণ তাঁকে ভয় দেখিয়ে বললেন এক লক্ষ রাজা এই যজ্ঞে এসেছেন। তাঁরা যদি একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করেন, তবে ভীমকে একা যুদ্ধ করতে হবে। কারণ অর্জুন তখন পাতালে রয়েছেন। উত্তরে ভীম বললেন ঃ—

তব যোগ্য কথা নহে দেব দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্বজন॥
অজাযূথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেই মত রাজগণ লাগে মম মনে॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে এক দিকে হয়।
মম ভাগে বৈল সব নাহি কার ভয়॥
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥

মনুষ্য কি গণি যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবাবে করিবে পবাজয়॥
যাব জন্য ইচ্ছে দেব তোমা হেন জনে।
তাবে পরাজয় কবে নাহি ত্রিভুবনে॥ (সঃ)

কৃষ্ণেব ভয় প্রদর্শন ভীমকে বশীভূত কবতে ব্যর্থ হলো। কাবণ ভীম নিজের পরাক্রম সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ ছিলেন। তাঁর এই রূপ স্পর্দ্ধাব মধ্যে অত্যুক্তি ছিল না। তিনি যা বলেছেন, তা যথার্থই সত্য। গর্ব করবাব মত শক্তি তাঁর ছিল।

বাজসূয যজ্ঞ সভায় ভীষ্মেব নির্দেশে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করায শিশুপাল ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে অকথ্য ভাষায নানা গালিগালাজ করেন। জবাসন্ধকে অন্যায় ভাবে হত্যা কববাব জন্য তিনি ভীম ও অর্জুনকেও তিবস্কাব কবেন। ভীম শিশুপালের উক্তিতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলে ভীষ্ম ভীমকে শান্ত করে তা হতে নিবৃত্ত কবেন। ভীষ্মের কথায় ভীম ক্রোধ সংববণ করেন।

সবল প্রকৃতিব ভীম সর্বদা গুরুজনদেব নির্দেশেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কবতেন।

যুধিষ্ঠিব ধৃতবাষ্ট্রেব পাশা খেলাব আহ্বান গ্রহণ করে ভ্রাতাদেব সঙ্গে হস্তিনাপুবে এসে শকুনিব সঙ্গে দ্যূতক্রীডায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কপট শকুনিব নিকট হেবে গিয়ে এক এক কবে সমস্ত ধনবত্ন হারালেন। অবশেষে চাব ভ্রাতাকে নিজেকে ও দ্রৌপদীকেও পণে হাবালেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিবের উপব ভীমের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। পাপ দ্যূতক্রীডায সর্বস্ব হাবালেও তিনি যুধিষ্ঠিবেব উপর ক্রুদ্ধ হননি। কিন্তু বাজসভায দ্রৌপদীব লাঞ্ছনা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং তিনি যুধিষ্ঠিবকে উদ্দেশ্য কবে বললেন—

ভবন্তি গেহে বন্ধক্যঃ কিতবানাঃ যুধিষ্ঠির।
ন তাভিকৃত দীব্যন্তি দয়া চৈবাস্তি তাস্বপি॥ (সঃ) ৬৫।১

—হে যুধিষ্ঠিব, শঠ জুয়াডী ব্যক্তিদের গৃহে বহু অসতী নারী

আছে। তারা সেই অসতী নারীকেও পণ রাখে না। তাদেরও উহাদের প্রতি দয়া আছে।

ন চ মে তত্র কোপোঽভূৎ সর্বস্যেশো হি নো ভবান্।
ইমং ত্বতিক্রমং মন্যে দ্রৌপদী যত্র পণ্যতে॥
এষা হ্যনর্হতী বালা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কৌরবৈঃ।
ত্বৎকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ॥
অস্যাঃ কৃতে মন্যুরয়ং ত্বয়ি রাজন্ নিপাত্যতে।
বাহূ তে সম্প্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানয়॥ (সঃ) ৬৮।৪৬

—(শত্রুরা শঠতার দ্বারা ধন রাজ্য ও আমাদের হরণ করেছে) তাতেও আমার ক্রোধ হয়নি। যেহেতু আপনি আমাদের প্রভু। কিন্তু দ্রৌপদীকে পণ রাখা অসঙ্গত হয়েছে বলে মনে করি। পাণ্ডব ভার্যা দ্রৌপদী এই অপমানের যোগ্যা নন। আপনারই দোষে নৃশংস, নীচ, দুষ্টমতি কৌরবদের দ্বারা তিনি এই রকম লাঞ্ছিতা হয়েছেন। হে রাজন, দ্রৌপদীর এই লাঞ্ছনার জন্য আপনার উপরই আমার ক্রোধ হচ্ছে। আমি আপনার বাহুদ্বয় দগ্ধ করব। সহদেব আগুন নিয়ে এসো।

এখানে ভীমের পৌরুষ ও রোষ উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে। সভা মধ্যে নিজের স্ত্রীর লাঞ্ছনা দেখে, ধৈর্য্য হারা হয়ে যিনি স্ত্রীর এই লাঞ্ছনার কারণ তিনি পূজনীয় হলেও ভর্ৎসনা করার সাহস ভীম চরিত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে। স্ত্রীর লাঞ্ছনা চোখের সামনে অন্য চার স্বামী নীরবে সহ্য করলেও, ভীম তা কখনও করেননি। স্থির মতি অর্জুন নানা প্রকারে ভীমের ক্রোধ প্রশমিত করলেন।

কর্ণের নির্দেশে দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করবার চেষ্টা করলেন। বীরেন্দ্র বীর নারী দ্রৌপদী আত্মশক্তিতে দুঃশাসনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে অসমর্থ হয়ে নিরুপায় হয়ে অগতির গতি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরিকে স্মরণ করলেন কৃষ্ণ তাঁর লজ্জা নিবারণ করেন। সভাস্থ সকলেই দুঃশাসনের নিন্দা ও দ্রৌপদীর প্রশংসা করতে লাগলেন। যদিও পঞ্চপাণ্ডব ধর্ম রক্ষার্থে সভায় স্ত্রীর অপমান দেখেও অসহায়

দ্রষ্টা মাত্র হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু সেই সময় ক্রোধে ভীম এক হাতে অন্য হাত নিষ্পেষণ করে প্রতিজ্ঞা করে বললেন—ক্ষত্রিয়রা, আমার প্রতিজ্ঞা আপনারা শুনুন—

অস্য পাপস্য দুর্বুদ্ধের্ভারতাপসদস্য চ।

ন পিবেয়ং বলাদ্ বক্ষো ভিত্ত্বা চেদ্ রুধিরং যুধি॥ (সঃ) ৬৮।৫৩

—যদি এই ভরতবংশের কুলাঙ্গার স্বরূপ দুঃশাসনের বক্ষ ভেদ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার রক্ত পান না করি, তবে আমি যেন পূর্বোক্ত গতি প্রাপ্ত না হই।

ভীমের এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শুনে সভাস্থ সকলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিন্দা করল এবং ভীমের বহু প্রশংসা করল।

কিন্তু ভীমের এরূপ লোমহর্ষণ প্রতিজ্ঞাও দুঃশাসনকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রের এক পর্বত সৃষ্টি করেও দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে ব্যর্থ হয়ে ক্লান্তি ও লজ্জায় দুঃশাসন বসে পড়লেন। তখন সাধারণ জনতা ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দ্রৌপদী বিজিতা কি বিজিতা নন"—এ প্রশ্নের উত্তর দিন। এবং বললেন দ্রৌপদী ঐ প্রশ্ন আপনাদের জিজ্ঞেস করে অনাথার ন্যায় কাঁদছেন। আপনারা কেউ এ প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় ধর্মই লজ্জিত হচ্ছে।

কিন্তু দুর্যোধনের ভয়ে কেউ এ প্রশ্নের জবাব দিতে সাহস পেলেন না। তখন দুর্যোধন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির মত যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্য চার পাণ্ডবকে উদ্দেশ করে বললেন, যাজ্ঞসেনি, ভীম অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিন। ইহারা যদি বলেন যে যুধিষ্ঠিরের তোমাকে পণ রাখার কোন অধিকার নেই। অতএব তাঁর পণ রাখা অবৈধ ও মিথ্যা তবে তুমি দাসত্ব হতে মুক্তি পাবে। অথবা ধর্মপুত্র স্বয়ং স্বীকার করুন যে তিনি তোমার ঈশ্বর বা ঈশ্বর নন, তাঁর কথার উপরে তুমি তৎক্ষণাৎ এক পক্ষ গ্রহণ কর।

দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি দ্রৌপদীকে সভাস্থলে উপহাস করতে থাকলে

ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলেছিলেন—

যদ্যেষ গুরুরস্মাকং ধর্মরাজো মহামনাঃ।
ন প্রভুঃ স্যাৎ কুলস্যাস্য ন বয়ং মর্ষয়েমহি॥
ইশো নঃ পুণ্যতপসাং প্রাণানামপি চেশ্বর।
মন্যতেঽজিতমাত্মা যদ্যেষ বিজিতা বয়ম্॥
ন হি মুচ্যতে মে জীবন্ পদা ভূমিমুপস্পৃশন্।
মর্ত্যধর্মা পরামৃশ্য পাঞ্চাল্যা মূর্ধজানিমান॥
পশ্যধ্বং হ্যায়তৌ বৃত্তৌ চূর্জৌ মে পরিঘাবিব।
নেতয়োরন্তরং প্রাপ্য মুচ্যেতাপি শতক্রতুঃ॥
ধর্মপাশসিতত্বেবং নার্হিগচ্ছামি সঙ্কটম্।
গৌরবেণ বিরুদ্ধশ্চ নিগ্রাহাদর্জুনস্যব॥
ধর্মরাজনিসৃষ্টস্তু সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব।
ধর্তেরাষ্ট্রনিমান পাপান্ নিষ্পিষেয়ং তলাসিভিঃ॥ (সঃ)
৭০।১২-১৭

—মহামান্য এ ধর্মরাজ যদি গুরুস্থানীয় এবং আমাদের কুলের প্রভু না হতেন তবে আমরা এ পাপাচরণকে সহ্য করতাম না। ইনি আমাদের ঈশ্বর পুণ্য তপস্যা ও প্রাণের প্রভু। তিনি যদি নিজেকে বিজিত মনে করেন, তবে পৃথিবীর উপর পদচারণকারী এমন কোন্ মরণশীল মানুষ আছে যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে আমার হাত হতে মুক্তি লাভ করতে পারে? হে নৃপবৃন্দ, আমার পেশী পুষ্ট গোলাকার বাহুদ্বয় দেখুন। এই বাহুদ্বয়ের মধ্যে পড়লে স্বয়ং ইন্দ্রও মুক্ত হতে সক্ষম নন। ধর্মপাশে বদ্ধ আমরা। তা লঙ্ঘন করলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গৌরব হানি হবে এবং অর্জুনও আমাকে নিবৃত্ত করছে। এই জন্যই সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারছি না। নতুবা ধর্মরাজ যদি একবার অনুমতি দেন, তাহলে ক্ষুদ্র মৃগদের সিংহ যেমন বিনাশ করে, আমিও তেমনি পাপিষ্ঠ এই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের অসির ন্যায় হাতের তালু দিয়ে পিষে ফেলতাম।

। উপস্থিত রাজন্যবৃন্দ ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর ভীমকে বললেন-

তোমাব কথাব্ মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই। তোমাব পক্ষে সব সম্ভব। তবে তুমি এখন ক্ষমা কব।

ভীমেব উপবোক্ত উক্তিতে তাঁব চবিত্রেব কয়েকটি বিশেষ গুণ সকলকে আকৃষ্ট কবে। ভীমসেন এক দুর্ধর্ষ বীর। অন্য সমস্ত বীর তা স্বীকাব কবতে একটুও দ্বিধা বোধ করেননি। এমন এক বীর পত্নীকে লজ্জিত হতে দেখেও দুবৃর্ত্তদেব উচিত সাজা না দিয়ে এ ক্ষেত্রে প্রভূত সংযমেব পরিচয় দিযেছেন। ধৈর্য, সহিষ্ণুতাব এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ বেখে গেছেন ভীম। তাঁর এ অপবিসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার উৎস তাঁব অকৃত্রিম ও অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁর অগ্রজেব প্রতি, কুলপতির প্রতি।

ভীমেব পূর্বোক্ত বীবোক্তি কর্ণ ও দুর্যোধনকে কদর্য ভাষন হতে নিবৃত্ত কবতে পাবল না। দ্রৌপদীকে লক্ষ্য কবে কর্ণ বললেন, হে ভদ্র তোমাব স্বামী এখন ঐশ্বর্য হাবিযেছে এবং তুমি ধনহীন দাসেব পত্নী এবং ঐ দাসেব প্রভু দুর্যোধনেব অধীন। এখন ধৃতবাষ্ট্র পবিবারেব সেবা কবা তোমার কাজ এবং ধৃতবাষ্ট্র পুত্রগণ তোমাব প্রভু। ভাবিনি তুমি যদি কাউকে পতিরূপে বরণ কব, তবে তোমার দাসত্বের মোচন হবে। দাসীব পক্ষে নানা পতিব সেবা করা নিন্দনীয় নয়।

সূতপুত্রেব এ রকম কথা শুনে ভীম আর্তের মত ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। যুধিষ্ঠিবের বিশেষ অনুগত বলে এবং ধর্মপাশে আবদ্ধ থাকাব দরুণ কোন প্রকাব প্রতিকাব সম্ভব নয বলে তাঁব বোষাগ্নিতে কর্ণকে দগ্ধ কবছিলেন।

অনন্যোপায় ভীম যুধিষ্ঠিবকে দোষাবোপ কবে বললেন তিনি যদি দ্রৌপদীকে পণ না রাখতেন, তবে শত্রুরা মুখেব উপব এরূপ কথা বলতে পাবতো না। কিন্তু তিনি বলবান হয়েও অগ্রজেব গৌবব রক্ষার জন্য দুর্বলেব ন্যায় অসহায বোধ কবছিলেন।

ভীমেব অভিযোগে যুধিষ্ঠিব নিরুত্তব ছিলেন। তখন দুর্যোধন তাঁকে ব্যঙ্গ কবে বললেন, আপনি এখন দ্রৌপদীব প্রশ্নের উত্তব

দিন বলে ঈষৎ হেসে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে জয় মদে মত্ত হয়ে তাঁর বাম উরুর কাপড় সরিয়ে কর্ণকে খুসী করে ভীমকে ক্রুদ্ধ করবার কুমতলবে দ্রৌপদীকে সেই উরু দেখালেন।

এই দৃশ্য দেখে ভীমের চোখ দুটো ক্রোধে বিস্ফারিত হলো। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন—

পিতৃভিঃ সহ সালোক্যং মা স্ম গচ্ছেদ্ বৃকোদরঃ।
যদ্যেতমুরুং গদয়া ন ভিন্দ্যাং তে মহাহবে ॥ (সঃ) ৭১।১৪

—মহাযুদ্ধে তোমার ঐ উরু যদি গদাঘাতে না ভাঙ্গি তবে যেন বৃকোদরের পিতৃলোকে গতি না হয়।

এখানেও ভীমের পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। ক্ষোভে ও ক্রোধে তাঁর লোমকূপ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছিল।

ক্রোধান্বিত ভীমের চেহারা দেখে বিদুর কৌরবদের সাবধান করে বলেছিলেন—ভীমসেন হতে তোমাদের মহাবিপদ হবে জেনে রাখ। (পরং ভয়ং পশ্যত ভীমসেনাৎ।) (বিদুর চরিত্র দ্রষ্টব্য)

দ্রৌপদীর বর প্রাপ্তির পর পঞ্চপাণ্ডব ধন রত্ন সহ রাজত্ব ফিরে পেলেন এবং দাসত্ব মুক্ত হলেন। কর্ণ এই জন্য পাণ্ডবদের বিদ্রূপ করলেন। তা শুনে ভীম দুঃখিত হয়ে বললেন—

মহর্ষি দেবলের মতে পুরুষের তেজ তিনটি—অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নীর অপমানে আমাদের সন্তানরাও কলঙ্কিত হল।

ভীমের এ অনুতাপের জন্য অর্জুন বললেন, হীন লোকেরা যা বলুক না কেন উত্তম পুরুষ কখনো তার প্রতিবাদ করে না। মহৎ ব্যক্তি উপকারের কথা মনে রাখে শত্রু তা মনে রাখে না।

ভীম এই অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমি আজই সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করব, তারপর আপনি পৃথিবী শাসন করবেন।

যুধিষ্ঠির তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নিরস্ত করেন।

এখানে ভীম ও যুধিষ্ঠিবেব চরিত্রের পার্থক্য প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিব ধীব স্থিব শান্ত প্রকৃতির। ভীমেব মধ্যে যুধিষ্ঠিবেব ধৈর্য ছিল না। যদিও তাঁব কোন উক্তি বা প্রতিবাদ বা আচবণ অন্যায় বা অসঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়বাব দ্যূতক্রীডায় পবাজিত হয়ে পাণ্ডবগণ মৃগচর্মেব বস্ত্র ও উত্তবীয় পবে বন যাত্রাব উদ্যোগ কবলে দুঃশাসন নানা ব্যাঙ্গোক্তি ও কটূক্তি কবে তাঁদের অপদস্থ কবছিলেন। তাতে ভীম সিংহের মত গর্জন করে বলেছিলেন—

যথা তুদসি মর্মাণি বাক্‌শবৈরিহ নো ভৃশম্।
তথা স্মারয়িতা তেঽহং কৃন্তন্ মর্মাণি সংযুগে ॥ (সঃ) ৭৭।১৭

—বাক্যবাণেব দ্বাবা যে ভাবে আমাদেব মর্মাহত কবছ, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ভাবে হৃদয বিদীর্ণ কবে তোকে কৃতকর্মেব কথা স্মবণ কবাব।

তখন যাবা ক্রোধ ও লোভেব বশবর্ত্তী হযে তোর অনুবর্তন কববে এবং তোকে বক্ষা কবতে আসবে, সপবিবারে তাদেব সকলকে আমি যমালযে পাঠাব।

অজিন পরিহিত ভীম যখন বনে গমনোদ্যত হচ্ছিলেন তখন দুঃশাসন ভীমকে এটা গরু এটা গরু বলে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে নাচতে লাগলেন। তখন ভীম দুঃশাসনকে লক্ষ্য কবে বললেন,—হে নৃশংস, তুই ছাড়া অন্য কেহ এরূপ কর্কশ বাক্য বলতে পারে না। অন্যায় ভাবে ধন পেয়ে তুই ছাড়া অন্য কেউ এরূপ দম্ভ করতে গারে না। তবে শোন, পৃথা তনয ভীম যদি তোব বুকের বক্ত পান না কবে, তবে আমি সদ্‌গতি পাব না। তিনি আরও বললেন, দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ কবলেই তাঁব কর্ত্তব্য শেষ হবে না, ধৃতবাষ্ট্রের সব পুত্রদেব যুদ্ধে অবিলম্বে যদি বধ না কবেন, তবে তিনি শান্তি পাবেন না। সদলে নিহত করে প্রতিশোধ নেবাব শপথ তিনি পুনবায় উচ্চাবণ কবেন।

দুর্বিনীত দুর্যোধন আনন্দে চলমান ভীমকে ব্যঙ্গ কবতে লাগলেন। ভীম তখন দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য কবে বললেন,

অহং দুর্যোধনং হন্তা কর্ণ হন্তা ধনঞ্জয়ঃ।

শকুনিং চাক্ষকিতবং সহদেবো হনিষ্যতি ॥ (সঃ) ৭৭।২৬

—আমি দুর্যোধনকে, ধনঞ্জয় কর্ণকে এবং দ্যূতকারী শকুনিকে সহদেব বধ করবে।

এই ভাবে ভীম প্রতিশোধ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন।

পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী বন গমনের সময় কে কি ভাবে যাচ্ছিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে তা জিজ্ঞেস করলেন। বিদুর বললেন, পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে চলছিলেন, ভীম তার দুই সুগোল বিশাল বাহু দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই ভাবে বিদুর প্রতি পাণ্ডু পুত্রের চলনের এক চিত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তুলে ধরলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞেস করলেন ভীমসেনের এ ভাবে চলার তাৎপর্য কি? উত্তরে বিদুর বললেন ভীম সকলকে বলেছিলেন বাহুবলে তার সমকক্ষ পৃথিবীতে কোন দ্বিতীয় পুরুষ নেই। এটা ভীমের এক বড় অভিমান।

রাজসভা হতে বেরিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী যখন রাত্রে গভীর অরণ্য পথে চলছিলেন, তখন পর্বতের মত অচল এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস তাঁদের পথ অবরোধ করল। তার মুখ থেকে আটটি দাঁত স্পষ্টভাবে বের হয়েছিল। চোখ দুটি তাম্রবর্ণ, মস্তক আগুনের রং এর মত খাড়া কেশ মণ্ডিত। সে রাক্ষস মায়া বলে জলভরা মেঘের ন্যায় শব্দ করছিল। সে শব্দে ভয়ার্ত হয়ে পাখীরা চারিদিকে উড়ে পালাচ্ছিল এবং স্থলজন্তু ও জলজন্তু এক হয়ে চীৎকার করে দিকে দিকে পালাচ্ছিল। পশুপক্ষী চারদিকে এমনভাবে ছুটে পালাচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন সমুদয় বনটিই ছুটে পালাচ্ছে। তার উরু সঞ্চালনে এমন বায়ুবেগ উঠল যে তার দ্বারা উর্ধোত্থিত ধূলি রাশি আকাশ মণ্ডলকে আবৃত করে জ্যোতিঃ শূন্য করেছিল। পাণ্ডব পুত্রদের অজ্ঞাতে এ মহাশত্রু তাঁদের নিকট উপস্থিত হলো। দূর থেকে সেই রাক্ষস পাণ্ডবদের অগ্রসর হতে দেখে মৈনাক পর্বতের ন্যায় তাঁদের

পথ আগলিয়ে দাঁড়াল।

পূর্বে কখনো দেখেননি এমন একটি জীবকে সামনে দেখে দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বন্ধ করলেন। পঞ্চ ভ্রাতা মোহ্যমান দ্রৌপদীকে ধরে ফেললেন। তখন পুরোহিত ধৌম্য মন্ত্র বলে রাক্ষসের মায়া রূপ হরণ করে নিলেন। মায়া নষ্ট হলে সে রাক্ষস রাগে চোখ বিস্ফারিত করে নিজ মূর্তিতে কালের মত পাণ্ডবদের সামনে প্রকটিত হলো।

রাজা যুধিষ্ঠির তখন তাঁকে তাঁর পরিচয় ও তাঁর উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে রাক্ষস বললেন, আমি বক রাক্ষসের ভাই। আমার নাম কির্মীর। পুরুষদের পরাজিত করে আমি তাদের খেয়ে থাকি। তোমরা কে? তোমাদের সকলকে পরাজিত করে আমি আমার ভোজ্যরূপে গ্রহণ করব।

রাক্ষসের কথা শুনে যুধিষ্ঠির নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, ভীমার্জুন ভাইরা সহ তিনি বনে এসেছেন। এবং কেন বনে এসেছেন তার কারণও জানালেন। তখন রাক্ষসও বললে, সৌভাগ্যবশতঃ ভগবান তোমাদের আমার নিকট হাজির করেছেন। আমি অস্ত্র উদ্যত করে ভীমসেনকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তাকে খুঁজে পাইনি। আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমার ভাইয়ের হত্যাকারী আমার সামনে উপস্থিত হয়েছে।

রাক্ষস আরও বললে, একচক্রা নগরীর নিকট বেত্রকী বনে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইহারা বাস করত। ব্রাহ্মণের মন্ত্রপুষ্ট হয়ে বককে বধ করেছে। হিড়িম্বও আমার প্রিয় সখা ছিল। তাকেও ভীম বধ করেছে। সেই মূর্খ ভীম এ গহন বনে অর্দ্ধ রাত্রে আমার বিচরণের সময় আমার সামনে এসে পড়েছে। আজ আমি আমার এতদিনের সঞ্চিত সকল শত্রুতার প্রতিশোধ নেব। তার প্রচুর রক্তে বকের তর্পন করব। রাক্ষসদের কণ্টক এই ভীমকে বধ করে আমি আমার ভাই ও বন্ধুর ঋণ থেকে মুক্ত হবো। অগস্ত্যমুনি যেমন মহাসুর বাতাপিকে খেয়ে হজম করেছিলেন আমিও ভীমকে খেয়ে

হজম করে ফেলবো।

কির্মীর এ রকম আস্ফালন শুনে রাজা যুধিষ্ঠির বললেন, ইহা কখনো সম্ভব নয় বলে রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।

এমন সময় বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন দশ ব্যাস অর্থাৎ ৪০ হাত পরিধির একটি গাছকে উপড়ে তুলে তাকে পাতা শূন্য করলেন। অন্যদিকে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবে শর যোজনা করলেন। ভীম অর্জুনকে বারণ করে মেঘের ন্যায় গর্জন কারী রাক্ষসের দিকে ধেয়ে গিয়ে বললেন, দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও। একথা বলে ভীম কোমরে কাপড় বেঁধে হাতে হাত রগড়িয়ে ও দাঁতে দাঁত চেপে যমদণ্ডতুল্য সেই গাছ নিয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন। এবং ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় সেই গাছটিকে সবেগে রাক্ষসের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। গাছটিও অনুরূপ আঘাত হানলো। কিন্তু রাক্ষস অবিচলিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তখন রাক্ষস ভীমের উপর জ্বলন্ত কাঠ নিক্ষেপ করল। ভীমসেন তাঁর পায়ের আঘাতে ঐ কাঠকে রাক্ষসের দিকে ফিরে পাঠালেন। রাক্ষসও একটি গাছ তুলে যমদণ্ডের মত ভীমের দিকে ছুটে গেল। দুই অসুরে প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হলো যেন বালি ও সুগ্রীবের যুদ্ধ। দুই বীরের পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত গাছগুলি তাদের মাথায় পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হতে লাগল। এভাবে ভীমসেনের সঙ্গে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ কির্মীর কিছুক্ষণ বৃক্ষ যুদ্ধ চললো।

অতঃপর রাক্ষস ভীমকে একটা পাথর তুলে আঘাত করল। সে আঘাতে ভীম জড়োবৎ হলেন, তাতে রাক্ষস ভীমের দিকে ছুটে গেল। তখন ভীম ও রাক্ষস স্ব স্ব নখ ও দাঁত দিয়ে পরস্পরকে ভয়ঙ্কর আঘাত করতে লাগলেন।

দুর্যোধননিকারাচ্চ বাহুবীর্য্যাচ্চ দর্পিতঃ।
কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ ব্যবর্ধত বৃকোদরঃ ॥ (বন) ১১।৫৫

—দুর্যোধনের তিরস্কার নিজের বাহুবলের স্পর্দ্ধা ও দ্রৌপদীর নয়নের দৃষ্টি ভীমের বল বৃদ্ধি করতে থাকে।

ভীম অসহিষ্ণু হয়ে দুই বাহু দ্বারা কির্মীকে জড়িয়ে ধরলেন। রাক্ষসও অনুরূপ ভীমকে ধরলে ভীম বলপূর্বক তাকে দূরে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর দুই যোদ্ধা বাহুদ্বারা পরস্পরকে নিষ্পেষণ করতে লাগল। তারপর ভীম বলপূর্বক রাক্ষসকে উঠিয়ে তার কোমর ধরে ফেলে বেগে ঘুরাতে থাকেন। রাক্ষস নিজেকে মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ভীম তাকে দড়ি দিয়ে যেমন পশুকে কষা হয়, সেভাবে রাক্ষসকে কষতে লাগলেন। ফলে রাক্ষসের দুই চোখ বেরিয়ে পড়ল। রাক্ষস দুর্বল হয়ে পড়েছে ভীম বুঝতে পেরে তাকে এমনভাবে ঘুরাতে থাকেন যে ফলে সে সংজ্ঞা হারালো। তারপর রাক্ষসকে নিবীর্য দেখে দু হাতে তাকে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে দু হাতে তার গলা টিপতে লাগলেন। তখন রাক্ষসের শরীর জর্জর ও চোখ দুটো ঘূর্ণিত হওয়ায় বিকট দেখাচ্ছিল। ভীম তাকে মাটির উপর ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন, পাপিষ্ঠ, এখন তুই যম লোকেও গিয়ে বক ও হিড়িম্বের চোখের জল মুছাতে পারবি না। (হিড়িম্ব-বকয়োঃ পাপ ন ত্বমশ্রুপ্রমার্জনম।) রাক্ষসের দেহ প্রাণত্যক্ত হয়েছে বুঝে ভীমসেন তাকে ছাড়লেন।

পাণ্ডবরা ভীমের নানা গুণের প্রশংসা করতে করতে আনন্দিত মনে দ্রৌপদীকে আগে রেখে দ্বৈত বনের দিকে চলতে লাগলেন।

বনবাসকালে পাণ্ডবগণ যখন দ্বৈতবনে বাস করছিলেন, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলেই দুঃখিত চিত্তে উপবেশন করেছিলেন। এমন সময় দ্রৌপদী তাঁর লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করছিলেন এবং ক্ষমা বৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষাত্র তেজে উদ্বুদ্ধ হতে অনুরোধ করছিলেন।

যুধিষ্ঠির নানা ভাবে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত করতে চেষ্টা করলে, ভীমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন—ধর্ম, অর্থ ও কাম ত্যাগ করে কেন আমরা তপোবনে বাস করব? দুর্যোধন কপট উপায়ে আমাদের রাজ্য ভ্রষ্ট করেছেন। অর্জ্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত রাজ্য আপনার

অসাবধানতার জন্য আমাদের চোখের সামনেই শত্রু হরণ করেছে। আপনি ধার্মিক বলে খ্যাত। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্যই আমরা বনবাস রূপ মহাসঙ্কটে পড়েছি। আপনার জন্যই আমরা কৌরবদের বধ করিনি এবং সেজন্য আজ অবধি আমরা দুঃখ পাচ্ছি।

কৃষ্ণ, অর্জুন অভিমন্যু, সৃঞ্জয় বংশীয় বীররা, নকুল, সহদেব এবং আমি—আমরা কেউই এই বনবাস পছন্দ করি না। (প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য।)

আপনি কেবল এটা ধর্ম, এটা ধর্ম এইরূপ বলে সর্বদা ব্রতই অনুষ্ঠান করছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনি হয়ত বৈরাগ্য বশতঃ সাহসহীন ক্লীবের ন্যায় জীবন যাপন করছেন। (কচ্চিদ্ রাজন্ ন নির্বেদাপন্নঃ ক্লীব জীবিকাম্।) আপনি বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও শক্তিশালী পুরুষ। এটা ছাড়া আমাদের পুরুষকারের কথাও আপনি জানেন। তথাপি আপনি দয়া পরবশ হয়ে নিজের অনর্থ বুঝতে পারছেন না। আমরা সমর্থ হয়েও শত্রুর অপরাধ ক্ষমা করছি। ফলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্ররা এতে আমাদের দুর্বল মনে করেছে। এটা আমাদের পক্ষে ভয়ানক দুঃখের কথা, এর চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। (অশক্তানিব মন্যন্তে তদ্ দুঃখং নাহবে বধঃ।) যুদ্ধ করতে করতে যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তাতেও আমাদের লাভ। কারণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু হলে পরলোকে লাভ হবে।

সর্বথা কার্য্যমেতন্নঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্
কাঙ্ক্ষতাং বিপুলাং কীর্তিং বৈরং প্রতিচিকীর্ষতাম॥ (বন)
৫৩।১৯।

—আমরা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে চাই এতে আমাদের বিপুল যশই লাভ হবে। সুতরাং আমাদের যুদ্ধ করা উচিত।

আপনার অদূরদর্শিতায় সকলের এই দুর্গতি ঘটেছে। আপনার দিকে তাকিয়ে আমরা সব সহ্য করছি, বন্ধুদের দুঃখিত এবং শত্রুদের

আনন্দিত করছি। দুর্বলতা ত্যাগ করুন। পৌরজন আমাদের অনুকূলে। আপনার ভ্রাতাদের বীরত্ব কম নয়। আমার গদার আঘাত কে সহ্য করতে পারবে? শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে ক্লীবের মত ঘৃণ্য জীবন যাপন করা কি উচিত? যাতে নিজের ও মিত্রদের দুঃখ হয়, তা ধর্ম নয়।

সর্বথা ধর্মমূলোঽর্থো ধর্মাচার্থ পরিগ্রহঃ।
ইতরেতরযোনীতৌ বিদ্ধি মেঘোদধী যথা॥ (বনঃ)

৩৩।২৯

—ধর্মের মূল যেমন অর্থ, তেমনি অর্থের মূল হলো ধর্ম। যেমন মেঘ এবং সমুদ্র পরস্পরের পরিপোষক, তেমনি ধর্ম ও অর্থ পরস্পরের পরিপূরক।

রাজন, আপনার বুদ্ধি ব্রাহ্মণের ন্যায়, ক্ষত্রিয়ের ন্যায় নয়। স্বয়ং মনু বলেছেন—অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে নেই। আমাদের ন্যায় ব্যক্তিদের বিশেষ করে দ্রৌপদীর পক্ষে অজ্ঞাতবাস সম্ভব নয়।

কামং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে ধর্মমাচরেৎ।
বয়স্যনুচরেদেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধি॥ (বন) ৩৩।৪১

—আয়ুকে ভাগ করে পূর্বে কাম, মধ্যে ধন এবং সায়াহ্নে ধর্ম চর্চা করবে—এটাই শাস্ত্রবিধি।

দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা বেদধ্যয়ন ও সরলতা—এইগুলি ইহলোক ও পরলোকে পরম এবং প্রবল ধর্ম। যদি অন্য সব গুণও মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে, তথাপি ধনহীন সেই মানুষের দ্বারা ঐ সব ধর্মানুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নয়।

ধর্মমূলং জগদ্ রাজন্ নান্যদ্ বিশিষ্যতে।
ধর্মচার্থেন মহতা শক্যো রাজন্ নিষেধিতুম॥ (বন)

৩৩।৪৮

—হে রাজন ধর্মই সমস্ত জগতের মূল, ধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছুই নেই। সেই ধর্ম আবার প্রচুর ধন থাকলেই অনুষ্ঠান করা সম্ভব।

সেই অর্থ কখনও ভিক্ষা বা ক্লীবতার দ্বারা অথবা যেমন ধর্মবুদ্ধির দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। দানশীলতার ন্যায় উদারতাই মনীষী বিদ্বানরা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন ঃ

স্বধর্মং প্রতি পদ্যস্ব জহি শত্রুন্ সম্যগতান্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং পার্থ পার্থ ময়া পার্থেন নাশয়॥ (বন)
৩৩।৫২

—স্বধর্মকে গ্রহণ করুন। সমাগত শত্রুদের সংহার করুন। হে পার্থ আমার ও অর্জ্জুনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররূপী বন বিনষ্ট করুন।

অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা যেমন কখনও হয়নি বা হবে না, তেমনি আমার ন্যায় গদাধারী যোদ্ধাও জগতে হয়নি বা হবে না। এইভাবে ভীম নানা প্রকারে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করেন।

ভীমের উপরোক্ত উক্তি ও যুক্তি তাঁর পৌরুষই কেবল প্রকাশ করেনি, শাস্ত্র ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এখানে ভীম চরিত্রের এক অপরূপ ছবি কবি এঁকেছেন। অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত বীর হৃদয়ের করুণ আকুতি ও আবেগ কবি প্রকাশ করেছেন ভীমের মুখে।

যুধিষ্ঠির ধর্ম ও নীতি কথার মাধ্যমে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনের স্থির প্রতিজ্ঞা জানালেন। (যুধিষ্ঠির চরিত্র দ্রষ্টব্য) দুঃখিত ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় উদ্দীপিত করতে বললেন—তের বৎসর পর্যন্ত যদি আমরা অপেক্ষা করি, তবে ঐ কাল আমাদের মৃত্যুর নিকট নিয়ে যাবে। মৃত্যুর পূর্বেই আমাদের রাজ্য লাভের চেষ্টা করা উচিত। আপনার প্রিয় করবার অভিলাষে জননী কুন্তী ও আমরা চার ভাই ও দ্রৌপদী জড় ও মূকের ন্যায় রয়েছি। আপনি যে আমাদের অজ্ঞাত-বাসের সময় লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছেন, তাতে মনে হয় আপনি এক মুষ্টি তৃণের দ্বারা পর্বতকে ঢাকতে চাচ্ছেন। (তৃণানাং মুষ্টি নৈকেন হিমবন্তঞ্চও পর্বতম্।)

সমস্ত পৃথিবীতে যিনি বিখ্যাত সেই আপনার পক্ষে অজ্ঞাতবাস, আকাশে সমুদিত সূর্যের পক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকার ন্যায় অসম্ভব। বৃহৎ শাল বৃক্ষের ন্যায় অথবা শ্বেতবর্ণ গজরাজের ন্যায় এই অর্জুন কেমন করে অজ্ঞাত বাস করবে? সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী আমার কনিষ্ঠ দুই ভাই নকুল ও সহদেব কি ছদ্মবেশে অজ্ঞাতবাস করবে? দ্রৌপদীই বা কেমন করে অজ্ঞাতবাস করবে? আমাকেও বাল্যাবস্থা হতেই সকল প্রজা জানে। সুতরাং মেরু পর্বতের ন্যায় আমার পক্ষে অজ্ঞাত ভাবে বাস করা সম্ভব না। আমাদের অন্বেষণ করবার জন্য তারা চারিদিকে বহু গুপ্তচর নিয়োগ করবে এবং সেইসব গুপ্তচর আমাদের পরিচয় জানতে পেরে দুর্যোধনকে বলবে—এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ের কারণ হবে।

অস্তি মাসঃ প্রতিনিধির্যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ।
পুতিকামিব সোমস্য তথেদং ক্রিয়তামিতি॥ (বন)

৩৫।৩৩

—মনীষীরা বলেছেন—মাস সংবৎসরের প্রতিনিধি। যজ্ঞাদি-ব্যাপারে এইরূপেই গণনা করা হয়। যেমন পুঁই শাক সোমলতার প্রতিনিধি। তেমনি মাসকেও সংবৎসরের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করে নিন।

রাজন, আপনি শত্রু বধের জন্য প্রস্তুত হোন।

ভীম বেশ বিচক্ষণ, অগ্রজ যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা পালনে অটল। তাই প্রয়োজনে চমৎকার যুক্তি দিয়ে ধর্মের বিশ্লেষণ করে যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে চেষ্টা করেছেন।

যুধিষ্ঠির আপন প্রভাবে ভীমকে শান্ত করেন। সরল হৃদয় ভীম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অত্যন্ত অনুগত। তাই অপমানের প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি নীরবে সহ্য করে চলেছেন অন্তরের জ্বালায় দগ্ধ হয়েও। তিনি অপর একদিন দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—

ভবতো দ্যূতদোষেণ সর্বে বয়মপপ্লুতাঃ।

অনীহা পৌরুষাদ্ রাজন্ বলিভির্বলাত্তরাঃ ॥
ক্ষত্রধর্মং মহারাজ ত্বমেবেক্ষিতুমর্হসি।
ন হি ধর্মো মহারাজ ক্ষত্রিয়স্য বনাশ্রয়ঃ ॥ (বন)
৫২।১৩-১৪

—আপনার দ্যূতাসক্তির দোষেই আমাদের সকলের এই লাঞ্ছনা। আমরা অধিকতর বলবান্ ও পৌরুষ যুক্ত হয়েও শত্রুদের চক্রান্তে অসহায় অবস্থায় পড়েছি। মহারাজ, আপনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অবলম্বন করুন। বনবাস ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়।

এবারও যুধিষ্ঠির তাঁকে স্তোক বাক্যে শান্ত করেন।

মধ্যম পাণ্ডব ভীম প্রকৃত বীর। তাঁর উপরোক্ত আবেগ আকিঞ্চন বীরের মতই। ভীমকে 'Restive horse' এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। Restive horse-এর যেমন উদ্দাম গতিতে ছোটাই প্রকৃতি—রাশের টান সহ্য করতে না পেরে ছটফট করে। ভীমসেনও তেমনি প্রতিপক্ষকে নিষ্পেষিত করতে চাইলে অগ্রজের বার বার প্রতিবন্ধকতায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন।

ভীম পুনরায় বলছেন :—

যত্তস্মান্ ন মহারাজ কৃপণান্ কর্তুমিচ্ছসি।
যাবজ্জীবমবেক্ষস্ব বেদধর্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ (বন) ৫২।৩৩

—মহারাজ, আপনি যদি আমাদের যাবজ্জীবন ক্ষুদ্র করে রাখবার ইচ্ছা না করেন, তবে বেদোক্ত সমস্ত ধর্মবই পর্য্যালোচনা করুন।

ভীম "শঠে শাঠ্যং" নীতি অবলম্বন করতে আবেদন করলেন। তিনি আরও বললেন, আগুন যেমন শুষ্কবন দগ্ধ করে, তেমনি আপনি অনুমতি করলে, আমি সর্ব শক্তি দিয়ে মূঢ় দুর্যোধনকে সংহার করব। অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দিন।

উপরোক্ত আবেগ পূর্ণ আবেদন নিবেদনে ভীম যেমন শরীরে উৎকর্ষতা তেমনি মনের উৎকর্ষতারও প্রমাণ রেখেছেন। বেদাদি শাস্ত্রেও যে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, আমরা এখানে তার প্রমাণ পাচ্ছি।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে ৩৩ হতে ৩৬ অধ্যায় বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এই কয়টি অধ্যায়ে অগ্রজ ও মধ্যম পাণ্ডবের চরিত্রের বিশেষ প্রভাবগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহাবলশালী পবন নন্দর সবই অস্থির ও উদ্দাম। বনবাসের কৃচ্ছ্র তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। তাঁরা পাঁচ ভাই ও বন্ধু রাজন্যবৃন্দ অমিত বিক্রমের অধিকারী। তবু তাঁরা সেই দুষ্ট চক্রান্তকারী শত্রুদের অধিকার মেনে নিয়ে রাজ্যসুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য থেকে দীর্ঘ বৎসর বঞ্চিত থাকবেন। ভ্রাতৃবৎসল হয়েও এ জন্য ভীম অগ্রজকে আঘাত করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। বাক্যবাণে জর্জরিত করে তিনি ঐ বন্ধন ভাঙবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে তিনি জয় করতে ব্যর্থ হলেন।

সেই ধীর স্থির মহান পুরুষটি ভীমের বাক্যে দুঃখিত হলে ব্যথা পেলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র অসহিষ্ণু দেখাননি। বরং তিনি ভীমকে বোঝালেন প্রকৃত পরিস্থিতি। তিনি বললেন—

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
ইদমন্যৎ সমাদৎস্ব বাক্যং মে বাক্যকোবিদ॥ (বন)
৩৬।৫

—হে মহাবাহু, ভরতকুলতিলক বাক্য বিশারদ ভীম, তোমার কথা একদিকে ঠিকই, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে আমার কথার ও সমাদর করতে চেষ্টা কর। তিনি বললেন, দুঃসাহসের সঙ্গে মানুষ মহাপাপজনক কাজ করলে, পরে তা দুঃখের কারণ হয়। অন্যদিকে সুন্দর ভাবে মন্ত্রণা করে বিশেষ চিন্তা করে নিজ বিক্রমে যদি কাজ করা হয়, তবে সেই কাজ সুখের হয়। দৈবও তার সহায় হয়।

যত্তু কেবলচাপল্যাদ বলদর্পোত্থিতঃ স্বয়ম্।
আরব্ধব্যমিদং কার্য্যং মন্যসে শৃণু তত্র মে॥ (বন) ৩৬।৮

—কেবলমাত্র চাপল্য বশতঃ ও বলের দর্প বশতঃ যে কাজ করা উচিত মনে হওয়াতেই তা করা হয় সেই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শোন।

তখন যুধিষ্ঠির বোঝাতে লাগলেন,—ভূরিশ্রবা, শল্য, ভীষ্ম, দ্রোণ,

কর্ণ, অশ্বত্থামা ও দুর্যোধন শত ভ্রাতা সকলেই অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী। যে সব নৃপতিদের আমরা জয় করে উত্থাপিত করেছি, এখন তারা সকলেই দুর্যোধনের পক্ষ নিয়েছে। এবং সকলেই তার প্রতি প্রীতি ভাবাপন্ন। দুর্যোধনের মঙ্গল করতে তারা সকলেই তৎপর। পূর্ণবল ও পূর্ণ কোষ নিয়ে তারা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবে। তিনি আরও বোঝালেন যে কৌরব সেনা বাহিনীকে ও অমাত্যগণকে উপভোগের সমস্ত রকম সামগ্রী দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট রাখা হয়েছে। দুর্যোধন এসব যোদ্ধাদের বিশেষ সম্মান করে। সুতরাং তারা দুর্যোধনের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য আমাদের সমদৃষ্টিতে দেখেন, তবু তাঁরা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন। কেননা তার অন্নে তাঁরা পুষ্ট। অতএব অন্নের ঋণ মুক্ত হবার জন্য তাঁরা প্রাণপাত করবেন আমার বিশ্বাস। স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁদের জয় করতে পারেন না। আমাদের প্রতি সর্বদা ঈর্ষা পরায়ণ কর্ণ কুণ্ডল কবচে আবৃত এবং অবধ্য। এসব বরেণ্য বীরবৃন্দকে জয় না করে সহায় সম্বলহীন তুমি দুর্যোধনকে জয় করতে পারবে না। সূতপুত্র কর্ণের হাতের ক্ষিপ্রতা তোমার অবিদিত নয়। তার চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হয় না।

রাজা যুধিষ্ঠিরের উপরের প্রতিবেদনে বীর ভীম বুঝতে পারলেন দুর্যোধনকে পরাজিত করা তেমন সহজ নয়।

যুধিষ্ঠির আপন দলের সহায় সম্পদ ও শত্রু শিবিরের সহায় সম্পদ বিবেচনা করে ভীমের হঠকারিতায় প্রশ্রয় দিলেন না। তাঁর মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ রূপ পাপ কাজ করে কেবল ভীম ও অর্জুনের বলের উপর নির্ভর করে দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সুমন্ত্রণা ও সুচিন্তার কাজ হবে না। ফলে তা অধিকতর কষ্টের কারণ হবে। যুধিষ্ঠির শুধু ধীর নয়। তাঁর দৃষ্টিও সুদূর প্রসারিত ছিল। যার অভাব ছিল ভীমের মধ্যে। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা স্থূল তাঁর আকারের মত। তাঁর দুর্দান্ত বেগ ছিল। কিন্তু সব দিক বিচার করার সহিষ্ণুতা ছিল না।

পাণ্ডব ভ্রাতাদেব ও দ্রৌপদীব অতি প্রিয় অর্জুন দিব্যাস্ত্র লাভেব জন্য স্বর্গলোকে গিযেছেন। যুধিষ্ঠিব তখন অন্যান্যদেব সঙ্গে কাম্যক বনে অবস্থান করছিলেন। অর্জুনেব অভাবে সকলে তখন ব্যথাতুব ও বিষণ্ণ। এ অবস্থায় ভীম পুনবায খেদ ও ক্ষোভে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহাবাজ আপনাব আদেশে অর্জুন অস্ত্রলাভের জন্য তপস্যা কবতে গিয়েছে। তাব মধ্যেই পাণ্ডবদেব প্রাণ রযেছে (পাণ্ডু পুত্রাণাং যস্মিন প্রাণাঃ প্রতিষ্টিতাঃ)। সে বিনষ্ট হলে শুধু পাণ্ডবরা নয় পাঞ্চালগণ সাত্যকি ও কৃষ্ণ বিনষ্ট হবে। (সাত্যকি, বাসুদেবশ্চ বিনশ্যেযুর্ণ সংশযঃ)। এ ব্যাপাব খুবই কষ্ট সাধ্য জেনেও অর্জুন আপনাব আদেশে তপস্যার জন্য গেছে। ইহা হতে অধিকতর দুঃখ আব কি আছে? তাব বাহুবলেব উপব নির্ভব কবে আমবা মনে কবছি আমবা শত্রুদেব নিধন কবে বাজ্য ফিবে পাব। দ্যূত সভায় অর্জুনেব পবামর্শে আমি শকুনি সহ ধৃতরাষ্ট্রেব সমস্ত পুত্রদেব বধ কবিনি। আমবা বাহুবলেব অধিকাবী ও কৃষ্ণ বক্ষিত হযেও কেবল আপনাবই জন্য এ ক্রোধ দমন বেখেছি। কৃষ্ণেব সঙ্গে একত্র হয়ে কর্ণ প্রভৃতি বধ কবে আমবা সমগ্র পৃথিবীব অধীশ্বব হতে পাবতাম। আমরা পৌরুষ শূন্য নয় এবং বলবান সহায়কও আছে। কেবল মাত্র আপনার দ্যূত ক্রীডাব দোষে সকলে বনে কষ্ট ভোগ কবছি। ভীম পুনবায় তাঁব পুর্বোক্ত যুক্তি দিয়ে যুধিষ্ঠিবকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কবতে চেষ্টা কবলেন। ভীম যুধিষ্ঠিবকে লক্ষ্য কবে বললেন, আপনি যদি আমাদের চিবকালেব জন্য ক্ষুদ্র কবে বাখতে ইচ্ছে না কবেন তবে বেদোক্ত ধর্ম বিশ্লেষণ করুন। শঠেব সঙ্গে শঠতাই ধর্ম।

ধীমান যুধিষ্ঠিব অসহিষ্ণু ভাইয়েব মস্তক আঘ্রাণ কবে বললেন, ত্রযোদশ বৎসব পূর্ণ হলে পর তুমি নিশ্চয় অর্জুনেব সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধনকে বধ কববে। শঠতা না কবেও দুর্যোধনকে তাব অনুগামীদেব সঙ্গে বধ কবতে পাববে।

দিব্যাস্ত্র সংগ্রহেব জন্য অর্জ্জুন দেবলোকে গেলে, তাঁব অনুপস্থিতিতে

পাণ্ডবরা কাম্যক বন ত্যাগ করে লোমশ মুনির সঙ্গে নানা তীর্থ পর্যটনে গেলেন। পুরোহিত ধৌম্যও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর তাঁরা অর্জুনের প্রতীক্ষায় বদরিকাশ্রমে অপেক্ষা করছিলেন। তারপর তাঁরা উত্তর দিকে গেলেন। লোমশ মুনি তাঁদের তার দুর্গমতার কথা জানালেন। তিনি আরও বললেন যে অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস ইত্যাদি এখানে বাস করে। অগ্নিহোত্র ও তপস্যার প্রভাবেই সেখানে যাওয়া সম্ভব। সব শুনে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তিনি, নকুল ও লোমশ মুনি গন্ধমাদন পর্বতে যাবেন। ভীম যেন অন্যান্যদের নিয়ে হরিদ্বারে অপেক্ষা করেন।

কিন্তু ভীম যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি সকলকে নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করবেন। কারণ সকলেই অর্জুনকে দেখতে উৎসুক। অবশেষে ভীমের উৎসাহে এবং পাণ্ডবরা কুলিন্দরাজ সুবাহুর রাজ্য অতিক্রম করে মহর্ষিদের সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন।

একদিন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বায়ু দ্বারা সঞ্চালিত একটি সহস্রদল পদ্ম দেখে দ্রৌপদী পদ্মটির খুবই প্রশংসা করেন এবং পদ্মটি তিনি যুধিষ্ঠিরকে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঐরূপ আরও কয়েকটি পদ্ম, তিনি কাম্যক বনে নিয়ে যাবার জন্য সংগ্রহ করবার জন্য ভীমকে অনুরোধ করেন।

ভীম গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হলেন। পথে তিনি অনেক হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়েন। অবশেষে তিনি গন্ধমাদন পর্বতের সানুদেশে সুবিস্তৃত কদলী বনে প্রবেশ করলেন। সেই বনের ভিতর একটি সরোবরে সেই জাতীয় অসংখ্য পুষ্প দেখে তিনি সেই সরোবরে অবগাহন করলেন। তারপর বহুক্ষণ জলক্রীড়া করে তিনি তাল ঠুকে শঙ্খধ্বনি করলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বত গুহার সুপ্ত সিংহরাও গর্জন করে উঠল। এবং সিংহনাদে ভীত হয়ে হস্তীর দলও উচ্চরব করতে লাগল। সেই দেশ হতে উর্ধ দেশে যাত্রা করলে ভীমের

অমঙ্গলেব আশঙ্কা আছে মনে কবে তাঁব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পবন নন্দন হনুমান পথ বন্ধ কবে শয়ন কবে বইলেন।

ভীম প্রশ্ন কবলেন—

কো ভবান্ কিং নিমিত্তং বা বানবং বপুবাস্থিতঃ।
ব্রাহ্মণানন্তবো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়স্তাং তু পৃচ্ছতি॥ (বন) ১৪৭।২

আপনি কে? কেনই বা এই বানব দেহ ধাবণ কবে এখানে অবস্থান করছেন? আমি ব্রাহ্মণেব পববর্ত্তী ক্ষত্রিয জাতি। আমি আপনাকে আপনাব পবিচয জিজ্ঞেস করছি।

হনুমান বললেন, আমি বানব, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও। নতুবা তোমাব মৃত্যু হবে। উভয়েব মধ্যে বচসা সুরু হয়। অতঃপব হনুমান তাঁকে বললেন, তুমি আমাকে ডিঙ্গিযে যাও।

ভীম বললেন, নির্গুণ পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত কবে আছেন। আমি তাঁকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পাবি না। নতুবা হনুমান যেমন সাগব লঙ্ঘন কবেছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে লঙ্ঘন কবতে পাবতাম। হনুমান প্রশ্ন কবলেন কে সেই হনুমান?

ভীম উত্তব দিলেন—

স মে ভ্রাতা মহাবীর্য্যস্তল্যোঽহং তস্য তেজসা।
বলে পবাক্রমে যুদ্ধে শক্তোঽহং তব নিগ্রহে॥

(বন) ১৪৭।১৩

—সেই মহাবীর্যশালী হনুমান আমার ভ্রাতা। আমি তেজস্বিতায়, বলে, পবাক্রমে ও যুদ্ধে তাঁবই তুল্য। সুতবাং আমি তোমাব নিগ্রহে সমর্থ।

হনুমান বললেন যে তাঁব উঠবাব শক্তি নেই। তিনি ব্যাধিগ্রস্ত, ভীম ইচ্ছা করলে তাঁকে লঙ্ঘন কবে যেতে পাবেন। ভীম সর্বশক্তি প্রয়োগ কবেও হনুমানের লাঙ্গুল নাডতে পাবলেন না। তখন ভীম সবিনয়ে বললেন—

প্রসীদ কপিশার্দূল দুরুক্তং ক্ষম্যতাং মম ॥
সিদ্ধো বা যদি বা দেবো গন্ধর্বো বাথ গুহ্যকঃ।
পৃষ্টঃ সন্ কাম্যয়া ব্রূহি কস্ত্বং বানরূপধৃক্ ॥

(বন) ১৪৭।২৩-২৪

—আপনি প্রসন্ন হন। আমার দুর্বাক্যকে ক্ষমা করুন। স্বেচ্ছায় বানররূপ ধারণ করে কে আপনি দেবতা, সিদ্ধ, যক্ষ, বা গন্ধর্ব আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন? আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি আপনার পরিচয় দিন।

হনুমান আত্মপরিচয় দিয়ে ভীমকে উপদেশ দিলেন। ভীমও সেই উপদেশাবলী শুনে কৃতার্থ হলেন। ভীম বললেন—

ময়া ধন্যতরো নাস্তি যদার্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥ (বন) ১৪৯।১

—আমার চেয়ে ভাগ্যবান কেউ নেই। কারণ আমি আজ পূজ্য আপনার দর্শন পেয়েছি।

হনুমান বললেন, ভীম যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের বিনাশ ও হস্তিনাপুর ধ্বংস করতে পারেন। ভীম উত্তরে বললেন, আপনার প্রসাদে আমরা শত্রু জয় করবই।

হনুমান বললেন, ভীম যখন যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহনাদ করবেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাবেন। তিনি অর্জুনের ধ্বজের উপর বসে ভীষণ নিনাদ করে শত্রুদের সন্ত্রস্ত করবেন। ভীমকে এই আশ্বাস দিয়ে হনুমান অন্তর্হিত হলেন।

ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হনুমানের প্রদর্শিত পথে যাত্রা করলেন। কুবেরের পুষ্করিণী হতে পদ্ম তুলতে গেলে পুষ্করিণী রক্ষক রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। কারণ রাক্ষসরা তাঁকে জানিয়ে ছিল এই সরোবর যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় ক্রীড়াস্থল। এখানে মরণশীল মানুষ বিচরণ করতে সমর্থ নয়। দেবর্ষি, যক্ষ ও দেবতারা কুবেরের অনুমতি নিয়ে এখানে এসে সরোবরের জল পান করেন এবং তীরে বিহার করেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরারাও এখানে বিহার করেন।

উত্তরে ভীম বললেন --

ন হি যাচন্তি রাজান এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

ন চাহং হতুমিচ্ছামি ক্ষাত্রধর্মং কথঞ্চন ॥ (বন) ১৫৪।১০

—ক্ষত্রিয়রা কখনো কারো কাছে যাচ্ঞা করেন না। এটাই হলো ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম। সুতরাং আমি কোন প্রকারে ক্ষাত্রধর্ম পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক নই।

ভীমের এই উক্তি হতে ক্ষাত্র ধর্মের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভীম রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে শতাধিক রাক্ষসকে নিহত করেন। অন্যরা সকলে কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীম তখন নদীতে অবতরণ করে অমৃত তুল্য জল পান করলেন এবং পদ্মতরু উৎপাটিত করে অনেক পদ্ম সংগ্রহ করলেন। দ্রৌপদীকে সেই পদ্ম দিয়ে তুষ্ট করলেন।

উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের নিয়ে সেই জায়গায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলে মিলে নরনারায়ণ স্থান বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। সেই স্থানে বক রাক্ষস ও হিড়িম্ব রাক্ষসের সুহৃৎ জটাসুর ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হয়ে ভীম ও তাঁর পুত্র ঘটোৎকচের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে এবং পাণ্ডবদের অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে ভীম অসুরকে দেখতে পেলেন। ক্রুদ্ধ ভীম বললেন—

হে পাপী রাক্ষস, যখন তুই আমাদের অস্ত্রগুলি পূর্বে পরীক্ষা করে দেখছিলি, তখনই আমি তোকে চিনতে পেরেছিলাম। মৃত্যুর কাল পরিপক্ক না হলে তাকে বধ করা যায় না। এজন্য তোকে বধ করা সম্ভব হয়নি। (অপকস্য চ কালেন বধস্তব ন বিদ্যতে।)

নকুল সহদেব তাঁকে সাহায্য করতে রাক্ষসের দিকে ধাবিত হলে তিনি তাঁদের বললেন—আমি একাই একে বধ করতে পারবো। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখো, অতঃপর ক্রুদ্ধ ভীম বাহুবলে

সন্দষ্টৌষ্ঠং বিবৃত্তাক্ষং ফলং বৃক্ষাদিব চ্যুতম্।
জটাসুরস্য তু শিরো ভীমসেনবলাদ্ধৃতম্॥ (বন)

১৫৭।৭১

—বৃক্ষ হতে বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় ভীমসেনের বলে বিচ্ছিন্ন জটাসুরের মস্তকটি ছিন্ন হয়ে ভূপতিত হল। তখন অসুরের ওষ্ঠ দাঁতের দ্বারা সন্দষ্ট এবং চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ছিল।

গন্ধমাদন পর্বতে আষ্টিসেনের আশ্রমে পাণ্ডবরা বাস করা কালীন একদিন পর্বত শিখর হতে সুগন্ধ পুষ্পে গ্রথিত বহু মনোরম মালা এসে পাণ্ডবদের সামনে পড়ল। পাণ্ডবদের সঙ্গে দ্রৌপদী পাঁচ প্রকার পুষ্পে গ্রথিত দিব্য পুষ্প গুলি দেখলেন। একদিন তিনি নির্জনে ভীমকে বললেন। তোমার ভ্রাতা অর্জুন খাণ্ডববন দাহন কালে গন্ধর্ব নাগ, রাক্ষস ও ইন্দ্রকেও নিবারণ করেছিলেন। বহু মায়াবী রাক্ষস তখন তাঁর হাতে নিহত হয়েছে এবং সেজন্য তিনি গাণ্ডীব ধনুও পেয়েছিলেন। তুমি এ স্থানের রাক্ষসদের তাড়িয়ে দাও। আমি তা দেখতে চাই। তাহলে তোমার সুহৃদরা সকলে ভয় ও মোহ শূন্য হয়ে ঐরূপ বিচিত্র মালা বিশিষ্ট মঙ্গলময় ঐ পর্বত শিখর দেখতে পাবে। অনেক দিন হতে আমি মনে করেছি তোমার বাহুবলে রক্ষিতা হয়ে আমি ঐ পর্বত শিখর দেখব।

মহাবৃষ যেমন প্রহার সইতে পারে না। ভীমও সেইরূপ দ্রৌপদীর এই বাক্য সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সশস্ত্র হয়ে পর্বত শৃঙ্গে উঠলেন। পথে বহু যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্ব তাঁকে বাধা দিতে এসে অনেকে প্রাণ হারালো বাকী সকলে পালিয়ে গেল। তখন কুবের সখা মণিমান নামক মহাবল রাক্ষস তাঁকে প্রবল ভাবে বাধা দিতে এসে প্রাণ হারালো তাঁর গদাঘাতে।

দ্রৌপদীর উপরোক্তি ভীমের বীরত্বের প্রতি পরোক্ষে কটাক্ষ। তাঁর অভিমান প্রজ্জ্বলিত হলো, তাঁর পৌরুষে যেন আঘাত করা হয়েছে।

ভীম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করছেন শুনে কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে

পুষ্পক রথে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পাণ্ডবরা দেবতাদের প্রিয় কার্য করবেন শুনে সন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব কুবেরের সামনে নিজেদের অপরাধী মনে করে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম খড়্গ ও ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে কুবেরকে দেখতে লাগলেন।

কুবের ভীমকে তাঁর কৃত কর্মের জন্য প্রশংসা করে জানান, ভীমকে দেখে তিনি অগস্ত্য মুনির শাপ মুক্ত হয়েছেন।

এই ঘটনার পর অর্জুন দেবলোক হতে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর একদিন ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন তাঁদের বনবাসের এগার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তাঁর প্রতিজ্ঞাকে সত্যে পরিণত করবার জন্য এবং আপনার প্রিয় করতে ইচ্ছুক হয়েই আমরা এতদিন পর্যন্ত অনুচরবর্গের সঙ্গে দুর্যোধনকে বধ করতে বন ছেড়ে যাইনি। আমরা সুখী হবার যোগ্য হলেও দুর্যোধন আমাদের সুখ কেড়ে নিয়েছিল। এখন আমরা দুর্যোধনের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে তাকে প্রলোভিত করব এবং তারপর দূরে কোন দেশে গিয়ে বাস করব, তাহলে দুর্যোধন জানতে পারবে না। ভীমের পরামর্শে যুধিষ্ঠিররা গন্ধমাদন পর্বত হতে বদরিকাশ্রম সুবাহু নগর ও বিশাখা যূপের মধ্য দিয়ে সরস্বতী নদীর নিকটে দ্বৈতবনে প্রবেশ করেন।

ভীম মৃগয়ার উদ্দেশ্যে সেই বনে বরাহ, মহিষ প্রভৃতিকে নিজের বাহুবলে বধ করতেন। বাণের দ্বারা বহু মৃগকে বিদ্ধ করতেন। এমন কি দন্তযুক্ত বড় বড় সিংহকে চপেটাঘাতেই ভীম বধ করতেন। ভীমের গর্জনে মহাবল সিংহ ও হস্তী সমূহ পর্বত গুহা ও বন ছেড়ে পলায়ন করত। ভীমের আগমন শব্দে গুহাশ্রিত সর্পগুলি ভীত হয়ে বেগে পালাতো। ভীম এইভাবে বনে বিচরণ করছিলেন। এমন সময় মহাকায় এক সর্প তাঁকে বেষ্টন করে ধরল। ঐ অজগরের স্পর্শে ভীমের সংজ্ঞা লোপ পেল। ভীম মহাশক্তিশালী হয়েও নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। সর্প বহুকাল ক্ষুধার্ত তাঁকে ভক্ষণ করবেন বলে ভয় দেখাতে থাকেন। সেই সর্প ছিল শাপগ্রস্ত রাজর্ষি নহুষ।

যুধিষ্ঠিরকে দেখবার উদ্দেশ্যে তিনি ভীমকে ধরেছিলেন।

ভীম নিজেকে সর্প বন্ধন হতে মুক্ত করতে না পেরে বলেছিলেন —

দৈবং পুরুষকারেণ কো বঞ্চয়িতুমর্হতি।

দৈবমেব পরং মন্যে পুরুষার্থো নিরর্থকঃ॥ (বন) ১৭৯।২৭

—কোন ব্যক্তি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে বঞ্চনা করতে পারে? সুতরাং দৈবকেই আমি বলবান মনে করি। সেখানে পুরুষার্থ নিরর্থক।

আজ আমি দৈব বলেই এই দশাগ্রস্ত হয়েছি। নতুবা আমার বাহুবলের উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি আরও বললেন, তাঁর প্রাণের জন্য তিনি চিন্তিত নন। কিন্তু তাঁর শক্তির উপর নির্ভরশীল ভ্রাতাদের জন্য ও হতভাগী জননীর জন্যই তিনি উদ্বিগ্ন।

ভীমের এই উক্তি যথার্থই বীরোচিত হয়েছে। দুর্বল ব্যক্তির মত তিনি প্রাণ ভিক্ষা করেননি। ভীম কেবল আদর্শ ভাই নন, আদর্শ পুত্র ছিলেন।

ভীমের কথা শুনেও সেই সর্প তাঁকে মুক্ত করলেন না। এদিকে নানাবিধ অশুভ লক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হয়ে ভীমের অন্বেষণে বের হন। ভীমের অবস্থা দেখে যুধিষ্ঠির ভীমের পরিবর্তে অন্য খাদ্য সামগ্রী দিতে চাইলেন। কিন্তু অজগর তাতে সম্মত হলেন না। বরং বললেন, যুধিষ্ঠির তাঁর কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিলে, তিনি ভীমকে মুক্তি দেবেন। যুধিষ্ঠির তাঁর জটিল প্রশ্নাবলীর (যুধিষ্ঠির পর্ব দ্রষ্টব্য) যথাযথ উত্তর দিয়ে ভীমকে মুক্ত করেন।

ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে অত্যন্ত ভয় করতেন। দুর্যোধনাদির ঘোষ যাত্রার পরামর্শ শুনে তিনি বলেছেন—

ধর্মরাজো ন সংক্রুধ্যেদ্ ভীমসেনস্ত্বমর্ষণঃ।

যজ্ঞসেনস্য দুহিতা তেজ এব তু কেবলম্॥ (বন) ২৩৯।৯

— ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হয়ত ক্রোধ করবে না, কিন্তু ভীমসেন তো সদাই অসহিষ্ণু, যজ্ঞসেন কন্যা তো অগ্নির অপরা মূর্তি।

কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন ঘোষ যাত্রার নাম করে

সপরিবারে বনবাসী পাণ্ডবদের দুরবস্থা দেখবার ইচ্ছায় দ্বৈতবনে গেলেন। সেখানে যুদ্ধে দুর্যোধন গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কাছে পরাজিত হয়ে সপরিবারে ও সসৈন্যে বন্দী হলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কর্ণ পূর্বাহ্নেই পলায়ন করেন। দুর্যোধন বন্দী হলে তাঁর মন্ত্রীরা পাণ্ডবদের সাহায্য প্রার্থনা করলে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে মুক্ত করবার জন্য ভীম ও অর্জুনকে বললেন। উত্তরে ভীম দুর্যোধনের তাঁদের প্রতি ও ভীমের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করে বললেন, পূর্বকৃত সেই সব পাপের ফল সে এখন ভোগ করছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নিগ্রহ আমাদেরই কর্তব্য ছিল। সে কাজ অন্যেই করছে। এতে গন্ধর্বরা আমাদের উপকার ও মিত্রের কাজই করছে। এতে আমাদের আনন্দিতই হওয়া উচিত, বিমনা হওয়া উচিত নয়। (উপকারী তু গন্ধর্বো মা রাজন্ বিমনা ভব।)

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম ও অর্জুন দুর্যোধন প্রভৃতিকে মুক্ত করলেন।

দুর্যোধন দ্বৈতবন হতে ফিরে বৈষ্ণব যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করলেন। তিনি পাণ্ডবদেরও তাঁর যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানালেন। ভীম আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—

তদা তু নৃপতির্গন্তা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
অস্ত্রশস্ত্রপ্রদীপ্তেঽগ্নৌ যদা তং পাতয়িষ্যতি।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্ধ্বং রণসত্রে নরাধিপঃ ॥
যদা ক্রোধহবির্ভোক্তা ধার্তরাষ্ট্রেষু পাণ্ডবঃ।
আগন্তাহং তদাস্মীতি বাচ্যস্তে স সুযোধনঃ ॥ (বন)

২৫৬।১৫-১৭

—তের বৎসর পর যখন যুদ্ধ যজ্ঞে অস্ত্রশস্ত্রে অগ্নি প্রজ্বলিত হবে আর সেই অগ্নিতে দুর্যোধনকে ফেলা হবে, তখন যুধিষ্ঠির যাবেন। যখন ধার্তরাষ্ট্ররা সেই যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হবে আর পাণ্ডবরা তাতে ক্রোধ রূপ হবি অর্পণ করবেন। তখন আমি যাব। একথা তুমি দুর্যোধনকে জানিও।

এই উক্তির মধ্যে তাঁর বিক্রমের সঙ্গে অপমানের প্রতিশোধ নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে।

বনবাসকালে একদিন পাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে দুর্যোধনের ভগ্নিপতি জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পাণ্ডবরা আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে সব বৃত্তান্ত জানতে পেরে জয়দ্রথকে আক্রমণ করলে, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ হতে নামিয়ে প্রাণ ভয়ে গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করেন। ভীম পলায়মান জয়দ্রথের চুল ধরে তাঁকে ভূমিতে ফেলে নিষ্পিষ্ট করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত করে তাঁর দুই জানু নিজের জানু দিয়ে চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ সংজ্ঞা হারালেন। জয়দ্রথকে বধ করতে যুধিষ্ঠির বারণ করেছেন এ কথা অর্জুন ভীমকে মনে করিয়ে দিলে ভীম বললেন—

এই পাপী দ্রৌপদীকে কষ্ট দিয়েছে। সে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। আমি নিরুপায়। যুধিষ্ঠির হচ্ছেন দয়ালু, আর তুমি মূঢ়। সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। এই বলে ভীম জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে মুড়িয়ে দিলেন এবং জয়দ্রথকে বললেন—মূঢ়, যদি বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে তুমি যুধিষ্ঠিরের দাস—তবেই তোমার প্রাণদান করব। জয়দ্রথ বলল, তাহাই হোক। যুধিষ্ঠির তাকে মুক্তি দিতে বললেন। দ্রৌপদীও বললেন—এ যখন নিজেকে দাস বলে স্বীকার করেছে এবং তার যখন পঞ্চ শিখা রেখেছো, তখন তাকে মুক্তি দাও। জয়দ্রথ মুক্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে প্রণাম করলেন এবং সেখানে উপস্থিত মুনিদের প্রণাম করলেন।

অতঃপর অজ্ঞাতবাসের জন্য অনুমতি নেবার সময় শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি ধৌম্য প্রবোধ দেন। ভীম তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে অর্জুন ধর্মানুগত বুদ্ধি বশতঃ কোন সাহসের কাজ করেননি। শত্রুদের বিনাশে সমর্থ বিক্রমশালী এই সহদেব ও নকুলও আপনার নিষেধে কোন সাহসের কাজ করেনি।

আপনি আমাদের যে কাজে লাগাবেন, আমরা তা পূর্ণ না করে

নিবৃত্ত হব না। আপনি যুদ্ধের ব্যবস্থা করুন, আমরা শত্রুদের জয় করবো। ভীমের এই উক্তিতে যুধিষ্ঠির আনন্দিত হলেন এবং ব্রাহ্মণরাও তাঁদের আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

বার বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের সময় মৎস্য-রাজ বিরাটের পুরীতে বাস করা স্থির হল। যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভীম বললেন—তিনি 'বল্লভ' নাম গ্রহণ করে রাজার রন্ধন শালার অধ্যক্ষ হবেন। রন্ধনের নিমিত্ত কাষ্ঠ আহরণ করবেন এবং যদি কেউ তাঁর সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ করতে চায়, তবে তাকে প্রহার করে ভূপতিত করবেন। কিন্তু বধ করবেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে ভীম বলবেন তিনি যুধিষ্ঠিরের পাচক ও মল্ল যোদ্ধা ছিলেন। এবং নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাবার্তার জন্য যুধিষ্ঠির ভীমের গুপ্ত নাম রেখেছিলেন 'জয়ন্ত।

যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হয়ে ভীম হাতে খন্তি হাতা ও কোষমুক্ত একখানা অসি নিয়ে বিরাট সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। বিরাট রাজা তাঁকে দেখে তাঁর পরিচয় বিশ্বাস করেননি, তথাপি তাঁকে পাচকদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন।

অজ্ঞাতবাসের চতুর্থ মাসে বিরাট পুরীতে ব্রহ্মার মহোৎসব উপলক্ষে বহু মল্ল উপস্থিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে জীমূত নামক একজন মল্ল যোদ্ধার সঙ্গে কেউ পেরে উঠলো না।

অবশেষে বিরাট রাজার নির্দ্দেশে ভীম জীমূতকে মাথার উপর তুলে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেলে পেষণ করে বধ করলেন। এইভাবে ভীম আরও অনেক মল্লকে পরাজিত করেন। অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় বিরাটের নির্দ্দেশে ভীম সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

ভীমের এইরূপ পরাক্রম একমাত্র কুম্ভকর্ণের সঙ্গেই তুলনীয়।

বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর কাছে ঘৃণ্য প্রস্তাব করে। দ্রৌপদী তা প্রত্যাখ্যান করায় কীচক বল প্রয়োগ করতে

গেলে দ্রৌপদী তাকে ভূপতিত করে দ্রুতবেগে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। কীচক সঙ্গে সঙ্গে রাজসভায় এসে তার কেশাকর্ষণ করে তাঁকে পদাঘাত করেন।

ভীম এই দৃশ্য দেখে ক্রোধে ও ক্ষোভে অজ্ঞাতবাসের কথা বিস্মৃত হয়ে কীচককে বধ করবার জন্য উদ্যত হলে যুধিষ্ঠির ভীমকে সঙ্কেতে নিবৃত্ত না করলে, সেই দিনই ভীমের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত।

রাত্রে দ্রৌপদী ভীমের গৃহে তাঁর দুঃখের কথা জানালে ভীম

ততস্তস্যাঃ করৌ সূক্ষ্মৌ কিণবদ্ধৌ বৃকোদরঃ।
মুখমানীয় বৈ পত্ন্যা করোদ পরবীরহা॥ (বি) ২০।৩০

—তারপর বৃকোদর দ্রৌপদীর সূক্ষ্ম ও কাল শিরাযুক্ত করদ্বয়ে নিজের মুখ ঢেকে রোদন করতে লাগলেন।

ভীমের মত মহাবীরের সম্মুখে স্ত্রীর এইরূপ অপমান নীরবে সহ্য করা যেমন লজ্জাজনক, তেমনি অসহনীয়। কিন্তু পরিচয় প্রকাশ হবার ভয়ে নীরবে তাঁকে এই আত্মগ্লানি সহ্য করতে হচ্ছিল। বীরের পক্ষে এই অপমানকর পরিস্থিতি যে কত বেদনা দায়ক তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভীমের দ্রৌপদীর করপুটে মুখ ঢেকে রোদনের মধ্যে।

ভীম দ্রৌপদীকে অনেক সতী সাধ্বীর দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে খানিকটা শান্ত করলেন। পরদিন রাত্রে নর্তন শালায় কীচককে প্রলুব্ধ করে আনবার পরামর্শ দিলেন ভীম।

ভীম দ্রৌপদীর বেশে সজ্জিত হয়ে নর্তনশালার পালঙ্কে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করে কীচকের প্রতিক্ষায় রইলেন। কীচক দ্রৌপদীর সঙ্গে মিলনের আশায় ঐ কক্ষে প্রবেশ করলে—

তং সম্মথিতসর্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃতম্।
তৃষ্ণয়া দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ॥ (বিঃ) ২২।৮৩

—মহাবল ভীমসেন সর্বাঙ্গ নিষ্পেষিত করে তাকে একটি মাংস

পিণ্ডের ন্যায় করে দ্রৌপদীকে দেখালেন।

দ্রৌপদী নর্তনশালার রক্ষীদের জানালেন যে তাঁর গন্ধর্ব পতিরা দুরাত্মা কীচককে হত্যা করেছে। কীচকের পরিণতি দেখে কীচকের ভ্রাতারা কীচকের শবদাহের সঙ্গে সৈরন্ধ্রীকেও (দ্রৌপদী) দাহ করবার অনুমতি প্রার্থনা করল। বিরাট রাজা ভয়ে উপকীচকদের অনুরূপ অনুমতি দিলেন। তারা সৈরন্ধ্রীকে বেঁধে শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করল।

সৈরন্ধ্রী জয় জয়ন্ত প্রভৃতি গুপ্ত নাম ধরে চীৎকার করে তাঁর এই বিপদের কথা তাঁদের জানালেন বল্লভ তৎক্ষণাৎ শয্যা ত্যাগ করে বেশ পরিবর্তন করে লাফ দিয়ে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে সূত পুত্রদের সম্মুখীন হলেন।

দ্রবতস্তাংস্তু সাম্প্রেক্ষ্য স বজ্রী দানবানিব।
শতং পঞ্চাধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্॥
বৃক্ষেণৈতেন রাজেন্দ্র প্রভাজন সুতো বলী।
তত আশ্বাসয়াৎ কৃষ্ণাং স বিমুচ্য বিশাম্পতে॥ (বিঃ)
২৩।২৭-২৮

—হে রাজেন্দ্র, ইন্দ্র যেমন দানবদের যমালয়ে প্রেরণ করেন, সেই বলবান পবন নন্দন ভীম তেমনি সেই একশত পাঁচজন সূতপুত্রকে পলায়ণ করতে দেখে বৃক্ষাঘাতে যমালয়ে পাঠালেন। তারপর তিনি দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করে আশ্বস্ত করলেন।

ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা বিরাটের গো হরণ করতে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে সুশর্মা বিরাটকে বন্দী করে তাঁর রাজ্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে বিরাটকে মুক্ত করবার জন্য যুধিষ্ঠির ভীমকে পাঠালেন। ভীমের পদাঘাতে সুশর্মা জ্ঞান হারালেন। অবশেষে বিরাট রাজার দাসত্ব স্বীকার করে সুশর্মা প্রাণ রক্ষা পেলেন।

বিরাট পুত্র উত্তর বিরাট রাজাকে পাণ্ডবদের পরিচয় দিতে গিয়ে ছদ্মবেশী ভীম সম্বন্ধে বলেছেন (অর্জুন পর্ব দ্রষ্টব্য)

গন্ধর্ব এষ বৈ হন্তা কীচকানাং দুরাত্মানাম।

ব্যাঘ্রানৃক্ষান্ বরাহাংশ্চ হতবান্ স্ত্রীপুরে তব ॥
(হিড়িম্বঞ্চ বকং চৈব কির্মীরঞ্চ, জটাসুরম্।
হত্বা নিষ্কণ্টকং চক্রে হরণ্যং সর্বতঃ সুখম্ ॥ (বিঃ) ৭১।৫

—ইনিই দুরাত্মা কীচকদের হত্যাকারী গন্ধর্ব। ইনিই আপনার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহদিগকে হত্যা করেছেন।

হিড়িম্ব, বক, কির্মীর ও জটাসুরকে বধ করে ইনি অরণ্যকে সর্বত ভাবে নিস্কণ্টক ও সুখাবহ করেছেন।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভীমের পরাক্রমে ভীত হয়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করে বললেন—

ন হি তস্য মহাবাহোঃ শক্র প্রতিমতেজসঃ।
সৈন্যে হস্মিন প্রতি পশ্যামি য এনং বিষাহেদ্ যুধি ॥ (উঃ)
৫১।৪

—মহাবাহু ভীম ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী। আমি নিজ সৈন্যদের মধ্যে কাউকে এমন শক্তিশালী দেখছি না যে ভীমের সম্মুখীন হতে পারে এবং যুদ্ধে তার বেগ সহ্য করতে পারে।

সে মহাবেগশালী, অত্যন্ত উৎসাহী, দীর্ঘবাহু ও মহাবলবান। সে যুদ্ধ করে নিশ্চয়ই আমার মন্দগতি পুত্রগণকে নিহত করবে।

স এব হেতুর্ভেদস্য ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥ (উঃ)
৫১।১২

—ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীমই এই উভয় কুলের মধ্যে বিভেদের কারণ।

ধৃতরাষ্ট্রের ভীমের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ কুরু পাণ্ডবের বিভেদের জন্য কোন প্রকারেই ভীমকে দায়ী করা যায় না।

অস্ত্রে দ্রোণার্জুনসমং বায়ুবেগসমং জবে।
মহেশ্বরসমং ক্রোধে কো হন্যাদ্ ভীমমাহবে ॥ (উঃ)
৫১।১৪

—এই ভীম অস্ত্রে দ্রোণাচার্য ও অর্জুনের সমক্ষক, বেগে বায়ুর তুল্য এবং ক্রোধে মহেশ্বরের ন্যায়। যুদ্ধে কে তাকে বধ করবে?

বাল্যকালেও সে কখনও আমার বশে ছিল না। সম্প্রতি আমার দুষ্ট পুত্ররা বারংবার তাকে কষ্ট দিয়াছে, সে কি এখন আমার বশে থাকবে? নিষ্ঠুর ক্রুদ্ধ স্বভাবের ভীম বরং ভেঙ্গে পড়বে, তথাপি নত হবে না।

ধৃতরাষ্ট্রের এই বিলাপ ভীম চরিত্রের এক পূর্ণাঙ্গ চরিত্র।

কৃষ্ণকে শেষবারের মত শান্তির চেষ্টায় পাঠাবার পূর্বে ভীম কৃষ্ণকে বলেছিলেন—

আপনি কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করবেন। যুদ্ধের কথা বলে তাঁদের ভীত করবেন না। দুর্যোধন স্বভাবতঃ পাপাত্মা, তার হৃদয় দস্যুর মত ক্রুরতা পূর্ণ। সে ঐশ্বর্য মদে উন্মত্ত এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সর্বদা শত্রুতাই তার কাম্য।

ভীম এইভাবে দুর্যোধন চরিত্রের দোষগুলি বিশ্লেষণ করে কৃষ্ণকে বললেন, যেমন ধর্মের বিপ্লবের সময় উপস্থিত হলে তেজে প্রজ্বলিত সমৃদ্ধিশালী অসুরদের মধ্যে ভয়ঙ্কর কলহ আরম্ভ হয়েছিল। তেমনি হৈহয়বংশে মুদাবর্ত, নীপকুলে জনমেজয় তালজঙ্ঘবংশে বহুল, কৃমিকুলে উদ্ধত বসু, সুবীরবংশে অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রকুলে কর্ষর্দ্ধিক, বলীহহবংশে অর্কজ, চীন কুলে ধৌতমূলক, বিদেহবংশে হয়গ্রীব মহৌকুলে রবষু, সুন্দরবংশে বাহু, দীপ্তাক্ষকুলে পুরূরবা, চেদি ও মৎস্য দেশে সহজ, প্রবীরবংশে বৃষধ্বজ, চন্দ্রবৎস বংশকুলে ধারণ, মুকুটবংশে বিগাহন এবং নন্দিবেগকুলে শম—এই সমস্ত কুলাঙ্গার ও নরাধম ক্ষত্রিয় যুগান্তকাল আসলে ভিন্ন ভিন্ন কুলে সম্ভূত হয়।

পূর্বোক্ত অষ্টাদশ রাজার ন্যায় কুলাঙ্গার, নীচ ও পাপ পুরুষ দুর্যোধনও এই দ্বাপর যুগের শেষে কাল প্রেরিত হয়ে আমাদের কুরু কুলের বিনাশের কারণ রূপে উৎপন্ন হয়েছে।

আপনি তাকে যা কিছু বলবেন কোমল ও মধুর ভাষায় ধীরে ধীরে

বলবেন। আপনার সকল বাক্য ধর্ম ও অর্থযুক্ত এবং হিতকর হোক। তাকে অল্প ও উগ্রতা পূর্ণ বাক্য বলবেন না এবং যা বলবেন তার অধিকাংশই যেন দুর্যোধনের রুচিকর হয়।

অপি দুর্যোধনং কৃষ্ণ সর্বে বয়মধশ্চরাঃ।
নীচৈর্ভূত্বানুথাস্যামো মাস্ম নো ভরতা নশন॥ (উঃ)
৭৪।২০

—কৃষ্ণ, বরং আমরা দুর্যোধনের আনুগত্য স্বীকার করবো, তথাপি আমাদের জন্য যেন ভরত বংশ নষ্ট না হয়।

আপনি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদগণকে বলবেন, তাঁদের যত্নে যেন দুর্যোধন শান্ত হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হয়। আমি শান্তি স্থাপনের জন্য বলছি। রাজা যুধিষ্ঠিরও শান্তিরই প্রশংসা করেন এবং অর্জুনও যুদ্ধ করতে অভিলাষী নয়। কারণ অর্জুনের মধ্যে অধিক দয়া বিদ্যমান।

ভীম চরিত্রের সঙ্গে উপরের উক্তিগুলির যেন কোন সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। যে ভীম বনে সর্বদা যুদ্ধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে উত্তেজিত করেছেন। আজ তাঁর মধ্যে বিপরীত স্বভাব যথার্থই বিস্ময়কর।

কৃষ্ণ ও ভীমের এই দুর্বল মনোভাব দেখে বিস্মিত হন্। তিনি ভীমের মনোভাবকে

গিরেরিব লঘুত্বং তচ্ছীতত্বমিব পাবকে। (উদ্যো) ৭৫।২

—পর্বতের লঘুতা ও অগ্নির শীতলতার ন্যায় মনে করলেন।

তিনি ভীমকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—ভরত বংশধর, তোমার কুল গৌরব স্মরণ কর, উৎসাহী হও অবসাদ ত্যাগ কর। এই গ্লানি তোমার অযোগ্য। ক্ষত্রিয় নিজের বীর্যে যা লাভ করে না তা ভোগও করে না।

উত্তরে ভীম বললেন—

সর্বলোকদভিক্রান্তান্ন ভয়ং বিদ্যতে মম।

কিং তু সৌহৃদমেবৈতৎ কৃপযা মধুসূদন।
সর্বাংস্তিতিক্ষে সং ক্লেশান্ মা চ নো ভরতা নশন॥ (উঃ)
৭৬।১৮

— হে মধুসূদন, যদি সমস্ত লোক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আমাব উপব আক্রমণ কবে, তথাপি আমাব তাতে ভয হয় না। কিন্তু আমি যে শান্তিব প্রস্তাব দিলাম, তা কেবল সৌহার্দেবই জন্য। আমি করুণা-বশতঃ সংসাবেব সকল ক্লেশ সহ্য কবতে প্রস্তুত। তথাপি আমাদেব জন্য যেন ভরতবংশীয়বা ধ্বংস না হয।

উপবোক্ত উক্তিব মধ্যে ভীমেব মনেব অন্য একটি দিক আমবা দেখতে পাই। তিনি যেমন বজ্রেব মত কঠিন, তেমনি কুসুমের মত কোমল। বংশেব ঐতিহ্যের প্রতি তাঁব গভীব শ্রদ্ধা আছে। মহাবীব হযেও তিনি দুর্যোধনেব দেওযা সব অপমান সহ্য কবে তাব আনুগত্য স্বীকার কবতেও ইচ্ছুক, তবুও ভবত বংশ ধ্বংস হোক, তা ইচ্ছা কবেন না।

দুর্যোধন শকুনি পুত্র উলূককে পাণ্ডবদেব যুদ্ধেব জন্য উত্তেজিত কববাব জন্য পাঠালেন। উলূক দুর্যোধনেব নির্দেশে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদেব অকথ্য ভাষায ভর্ৎসনা কবেন।

ভীম ক্রুদ্ধ হযে উলূককে বললেন, তুমি হস্তিনায গিযে সর্ব-সমক্ষে দুর্যোধনকে বলবে—

অস্মাভিঃ প্রীতি কামৈস্তু ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ
মর্ষিতং তে দুবাচাব তত্ত্বং ন বহু মন্যসে॥ (উঃ)
১৬২।২২

—বে দূবাচাব, আমবা সর্বদা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতি কামনা কবি বলে তোমাকে ক্ষমা কবেছি, তা তুমি স্মরণ বেখো।

সর্বেষাং ধার্তবাষ্ট্রাণামহং মৃত্যুঃ সুযোধন। (উঃ)
১৬৩।৩৪

—হে সুযোধন, আমিই সমস্ত ধৃতবাষ্ট্র পুত্রদেব মৃত্যু স্বরূপ।

হত্বা সুযোধন ত্বাং বৈ সহিতং সর্বসোদরৈঃ।
আক্রমিষ্যে পদা মূর্ধ্নি ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ॥ (উঃ)
১৬৩।৩৬

—হে সুযোধন, সব সহোদরের সঙ্গে তোমাকেও বধ করে ধর্মরাজের চোখের সামনেই তোমার মাথায় পদাঘাত করব।

ভীম তাঁর এই কঠিন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সব পুত্রকেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত করেছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা হতেই ভীমের অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভীষ্ম পর্বে ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন ভীম সাতটি তীক্ষ্ণ বাণে দ্রোণাচার্যকে বিদ্ধ করলেন। দ্রুপদ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রুত নিজ রথে তুলে নিলেন। তখন দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের রক্ষার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। সেই সময় কলিঙ্গ দেশীয় বীরদের বিশাল সৈন্য অতিদ্রুত ভীমসেনের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তখন ঐ যোদ্ধাদের সঙ্গে ভীমের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হল।

কলিঙ্গ ও নিষাদের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধ হয়। ভীমসেন দ্বারা শত্রুদের, ভানুমান ও কেতুমানের বিনাশ ঘটলো এবং তাঁদের বহু সৈন্য নিহত হল।

উভয় পক্ষেরই ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য প্রভৃতি বীরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এবং দুর্যোধনের দশ হাজার বেগশালী গজসৈন্য সহ মগধরাজকে অগ্রে রেখে দুর্যোধন ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম হাতে গদা নিয়ে সিংহের মত গর্জন করতে করতে রথ হতে ভূতলে নেবে পড়লেন। লৌহ নির্মিত সেই বিশাল ও ভারী গদাকে নিয়ে ভীম সমগ্র গজ সৈন্য সংহার করলেন।

গজ সৈন্য নিহত হওয়ায় দুর্যোধন আদেশ দিলেন সমস্ত সৈন্য মিলিত হয়ে ভীমকে বধ করতে। সেই সময় ভীম অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। অশ্ব, হস্তী ও রথসহ সব নৃপতিই আক্রমণ

কবলেন। ভীম গদাব দ্বাবা সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে প্রতিবোধ করে মেরু পর্বতেব ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান কবতে লাগলেন। ভীমেব গদাঘাতে যুদ্ধ ক্ষেত্র শ্মশান ভূমিতে পবিণত হলো। ভীষ্মেব সঙ্গে ভীমেব যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধেব চতুর্থ দিনে ভীম ও তাঁব পুত্র ঘটোৎকচ প্রবল পবাক্রম দেখান। বহু বীর ভীমের দ্বাবা নিহত হয। তখন ভীষ্ম তাঁব সৈন্যদেব আদেশ দিলেন সকলে সমবেত হযে ক্রুদ্ধ ভীমকে বন্দী কর। বাজা ভগদত্ত তাঁকে শবাঘাতে আচ্ছন্ন কবলেন। সেই সময় অভিমন্যু ভীমেব সহায়তায ভগদত্তকে আক্রমণ কবলে ভগদত্ত ভীমের বুকে আঘাত করলেন। ভীম মূর্ছিত হযে পড়ে গেলেন। ভীমকে সংজ্ঞা হাবাতে দেখে ভগদত্ত সবেগে সিংহনাদ কবতে লাগল। পিতাব এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ সেই স্থানেই অদৃশ্য হযে পড়ল। তারপব মাযা সৃষ্টি কবে তাব রাক্ষস সহায়ক নিয়ে প্রবল বেগে যুদ্ধ কবতে লাগল। ঘটোৎকচ প্রচণ্ড বেগে ভগদত্তকে আক্রমণ করে তাঁকে জর্জবিত করে। ভীষ্ম দ্রোণকে বললেন, ঘটোৎকচ এখন বল-বীর্য ও সহায় সম্পন্ন। আমাদেব সৈন্যরা শ্রান্ত। সূর্যও অস্তাগত প্রায, অতএব এখন যুদ্ধেব বিরাম হোক।

যুদ্ধের পঞ্চম দিনে কৌবব পুত্রদের ভীমের ভয হতে মুক্ত করবাব জন্য ভীষ্ম তুমুল যুদ্ধ কবেছিলেন। ভীষ্ম ও ভীমেব মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয। এই সংগ্রামে মৃত বাহন, ছিন্ন মস্তক, ধনু, গদা, পরিখ, হস্ত, জঙ্ঘা, চবণ অলঙ্কার ও কেযুব বাশি আকাবে দেখা যাচ্ছিল। অতঃপব পাণ্ডব সৈন্যরা ভীমেব সহায়তায় এলো, দুর্যোধন কলিঙ্গ সৈন্য পবিবেষ্টিত হয়ে ভীষ্মকে অগ্রে বেখে পাণ্ডবদের আক্রমণ করল। কিন্তু পাণ্ডবদের আক্রমণে কৌরব সৈন্য বিপর্য্যস্ত হচ্ছিল। এই দিন দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমেব প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।

যুদ্ধের ষষ্ঠ দিনেও ভীম প্রচণ্ড পরাক্রম দেখিয়েছেন। সেদিন পাণ্ডব ও কৌবব সেনাবা যথাক্রমে মকবব্যূহ ও ক্রৌঞ্চ ব্যূহ নির্মাণ

করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ভীমসেন সেই ব্যূহের মুখভাগে থাকলেন। ভীম দ্রোণাচার্যকে প্রবল আক্রমণ করেন। দ্রোণের আঘাতে আহত হয়ে ভীম তার সারথিকে নিহত করেন। দ্রোণ নিজেই অশ্ব চালনা করে প্রচণ্ড ভাবে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে থাকেন। ভীমার্জুনের বাণাঘাতে কৌরবসেনা ক্ষত বিক্ষত হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

ভীম দুর্যোধনের সব ভ্রাতাদের উপর আক্রমণ করলেন। অতঃপর তিনি কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁরা তাঁকে জীবিত বন্দী করবার অভিপ্রায়ে চতুর্দিক দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেললেন। এবং তার উপর বান বর্ষন করতে লাগলেন। নির্ভীক ভীম কাউকে গ্রাহ্য না করে কৌরব বীরদের নিহত করতে লাগলেন। ভীমকে কৌরব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে ছেড়ে ভীমের সহায়তার জন্য এসে দেখলেন ভীমের রথ শূন্য। তিনিও তখন সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি ভীমসেনকে শত্রু সৈন্য দগ্ধ করতে দেখলেন। বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধরত ভীমের হাতে নিহত কৌরব সৈন্যদের দেখে তাদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

ধৃষ্টদ্যুম্ন, অত্যন্ত দ্রুত তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর শরীরে প্রবিষ্ট বাণগুলি তুলে নিলেন। দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রমোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। তাতে দুর্যোধনাদি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই অবকাশে ভীম বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের অবস্থা শুনে দ্রোনাচার্য এলেন এবং প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট করলেন।

যুধিষ্ঠিরের আদেশে সৈন্যরা ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নর সাহায্যে গেলেন। কৌরব সৈন্যরা ভীমের ভয়ে ব্যাকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নর বাণে নিহত হচ্ছিল। তখন দ্রোণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমের প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সুরু হয়।

অপরাহ্ন আগত প্রায় সূর্য রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তখন দুর্যোধন

ভীমকে বধ কববাব জন্য তাঁব দিকে ধাবিত হলেন। তখন ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমি বহু বৎসব ধবে যে অভিলাষ প্রতীক্ষা কবে আসছি সেই সুযোগ এখন এসেছে। গা অযং স কালং সম্প্রাপ্তো বর্ষ পূগাভিবাঞ্ছিতঃ) যদি তুমি যুদ্ধ ত্যাগ করে পালিয়ে না যাও তবে আজই তোমাকে অবশ্যই বিনাশ কবব।

অদ্য কুন্ত্যাঃ পবিক্লেশং বনবাসঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পবিক্লেশং প্রণেষ্যামি হতে ত্বয়ি॥ (ভীঃ) ৭৯।৪

—কুন্তীকে যে ক্লেশ সহ্য কবতে হযেছে, আমবা বনবাসে যে কষ্ট ভোগ কবেছি এবং দ্রৌপদীকে যে দুঃখ সইতে হয়েছে, সে সমস্তব প্রতিশোধ তোমাকে বধ কবে আজ গ্রহণ করব।

ভীম প্রকৃতিতে অমর্ষ ছিলেন। ভবত বংশেব কল্যাণার্থে একবাব মাত্র তাঁব চবিত্রে কোমলতা দেখা গেছে।

তিনি আবও বললেন. ঈর্ষা বশতঃ তুমি পাণ্ডবদেব অপমান কবেছ। সেই পাপেবই ফল স্বরূপ এই সঙ্কট আজ তোমাব উপব এসেছে। পূর্বে কর্ণ ও শকুনিব মতকে আশ্রয় কবে পাণ্ডবদেব গ্রাহ্য না কবে নিজেব ইচ্ছামত ব্যবহাব কবেছ। কৃষ্ণ সন্ধিব প্রস্তাব নিযে গিয়ে ছিলেন। তুমি তাঁকেও তিবস্কাব করেছ এবং উলূকেব দ্বাবা যে সংবাদ পাঠিয়েছিলে, তদনুসাবে ভ্রাতৃবৃন্দ সহ ও সবান্ধবে বধ কবে তোমাব সমস্ত পাপেব শাস্তি দেব,—বলে ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনেব ধনু ছিন্ন, সাবথি আহত এবং চার অশ্ব নিহত হল দুর্যোধন শববিদ্ধ হয়ে মূর্ছিত হলেন, কৃপাচার্য তাঁকে নিজেব বথে উঠিয়ে নিলেন।

যুদ্ধেব সপ্তম দিনেও ভীম প্রবল পবাক্রম দেখিয়েছিলেন। সেদিন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিবেব বিচিত্র ধনু ও ধ্বজ ছেদন কবায় তিনি ভীত হয়ে পড়েন। তা দেখে ভীম গদা নিয়ে পদব্রজে জয়দ্রথকে আক্রমণ কবেন। ভীমকে বধ কববাব জন্য দুর্যোধন সেখানে উপস্থিত হন। ভীম শকুনি ভ্রাতৃবৃন্দ সহ দুর্যোধনকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে গদা দ্বাবা জয়দ্রথকে বধ কবতে অগ্রসব হলেন। ভীমেব গদাঘাত হতে

আত্ম বক্ষার্থে কৌবব সৈন্যবা চারিদিকে পলায়ন করে।

যুদ্ধেব অষ্টম দিনে ভীম ও ভীষ্মেব মধ্যে যুদ্ধ চলবাব সময় প্রচুর লোকক্ষয হয। দুর্যোধন ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীষ্মকে সাহায্য কবতে এগিয়ে আসেন। ভীম ভীষ্মের সারথিকে বধ কবলেন। তখন তাঁব বথেব অশ্ববা যত্র তত্র চতুর্দিকে দৌডাতে লাগল। দুর্যোধনেব ভ্রাতা সুনাভ ভীমকে আক্রমণ কবলে, তিনি তাঁর শিবচ্ছেদ কবেন। দুর্যোধনেব অন্যান্য আট ভ্রাতা তাঁকে আক্রমণ করেন ও ভীম তাঁদেব নিহত কবেন। এবং অন্যান্য কৌববদেরও নিহত কবেন। এ ব্যাপারে দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হয়ে ভীষ্মকে অভিযুক্ত কবেন। (দুর্যোধন পর্ব দ্রষ্টব্য)।

ঘটোৎকচের প্রচণ্ড যুদ্ধে কৌবব সৈন্যরা পলায়ন করে। তখন দুর্যোধনকে বধ কববার জন্য সে ধাবিত হয়। কৌবব সৈন্যরা ও দুর্যোধনেব ভ্রাতারা তাকে সমবেত হয়ে আক্রমণ করতে আবম্ভ কবে। যুধিষ্ঠিবের আদেশে ভীম ঘটোৎকচেব সাহায্যের জন্য গিয়ে বহু সৈন্য হত করলেন। অন্যান্যরা ভয়ে পলায়ন করল।

দুর্যোধনের মুখে পরাজয় সংবাদ শুনে ভীষ্ম তাঁকে বললেন, তুমি সর্বদা আত্মবক্ষায় সতর্ক থেকে যুধিষ্ঠির বা তাঁর কোনও ভ্রাতাব সঙ্গে যুদ্ধ কববে। কাবণ রাজধর্ম অনুসারে রাজাব সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ কবেন। অতঃপর তিনি ভগদত্তকে ঘটোৎকচেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। ভগদত্ত ঘটোৎকচ ভীমসেন ও পাণ্ডব সৈন্যদের সঙ্গে ঘোব যুদ্ধ কবেন। ভীম প্রচণ্ড যুদ্ধ করে ধৃতবাষ্ট্রের নয় পুত্রকে সংহার করেন।

যুদ্ধের নবম দিনে দ্রোণাচার্য ও সুশর্মাব সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয় এবং ভীম গজসৈন্য সংহার কবেন। তিনি দাঁতালো হস্তির দন্ত ধরে তা উৎপাটিত কবলেন এবং সেই হস্তীকে দন্তহীন করলেন। এবং সেই দন্তের দ্বারাই সেই হস্তীর কুম্ভ স্থলে প্রহাব কবে তাকে নিহত করেন। রক্তে রঞ্জিতা গদা মেদ ও মজ্জার লেপনে বিকৃত রূপ ধারণ করে ভীমকে রুদ্রদেবের মত মনে হচ্ছিল। ভীমের প্রহাবে মহাগজরা কৌবব

সৈন্যদেব পিষ্ঠ কবে পলাযন করল। গজবাজদেব সঙ্গে দুর্যোধনেব সব সৈন্যবা পুনবায যুদ্ধ বিমুখ হযে পডল।

ভীম স্বীয প্রপিতামহ বাজা বাহ্লীককে বাণে বিদ্ধ কবে উচ্চৈঃ স্ববে গর্জন কবতে লাগলেন।

ভীমের অদ্ভুত পবাক্রম সম্বন্ধে সঞ্জয ধৃতবাষ্ট্রকে বলেছেন—

ভগদত্তঃ কৃপঃ শল্যঃ কৃত্যবর্মা তথৈব চ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সৈন্ধবশ্চ জযদ্রথঃ॥
চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ তথা দুর্মর্ষণাদযঃ।
দশৈতে তাবকা যোধা ভীমসেনমযোধয়ন্॥ (ভীঃ)

১১৩।১-২

—ভগদত্ত, কৃপাচার্য, শল্য, কৃতবর্মা, অবন্তী দেশের দুই বাজকুমাব বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুবাজ, জযদ্রথ, চিত্রবসেন, বিকর্ণ ও দুর্মর্ষণ এই দশ যোদ্ধা একত্র হযে ভীমেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

কৌবব পক্ষেব প্রধান প্রধান মহাবথী বীবদেব সঙ্গে যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনকে অদ্ভুত বিক্রম দেখিযে ছিলেন।

ভীষ্মেব পতনের পব দ্রোণের সেনাপতিত্বে যখন যুদ্ধ পুনরায় সুরু হল, তখন দুর্যোধন হস্তি সৈন্যদেব সঙ্গে নিয়ে ভীমকে আক্রমণ করলেন। ভীম যুদ্ধে নিপুণ ও বাহুবল সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অল্প সমযের মধ্যেই হস্তী সৈন্যদের বিদীর্ণ কবে ফেললেন। পর্বতবাজ ভগদত্তেব হস্তী ও বৃদ্ধ ভগদত্তেব সঙ্গে ভীম প্রচণ্ড যুদ্ধ কবেন। এই যুদ্ধে ভগদত্ত ও তাঁর হস্তী যাথষ্ট পরাক্রম দেখিয়েছিলেন।

কৌবব পাণ্ডব সৈন্যদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম। কৌবব মহাবথী বীবদেব সঙ্গে ভীমসেনেব যুদ্ধে ভয়ানক লোকক্ষয় হয়।

বালক অভিমন্যুকে অন্যায় ভাবে বহু মহাবথী একত্র হযে নিহত করায়, অর্জুন প্রতিজ্ঞা কবেছিলেন জয়দ্রথ—যিনি বূহের মুখ অবরোধ করে পাণ্ডব সৈন্যদেব অভিমন্যুব সহায়তা কবতে বাধা দিয়ে ছিলেন তাকে সূর্যাস্তের আগে বধ কববেন। সামনে জয়দ্রথেব সৈন্য পশ্চাতে

দ্রোণাচার্যের সমুদ্র। অর্জুন একা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনের সহায়তায় সাত্যকিকে যেতে বললেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে একা পেয়ে দুর্যোধন যাতে যুধিষ্ঠিরকে সজ্ঞানে বন্দী করতে না পারে। এজন্য কৃষ্ণার্জুন তাঁর (সাত্যকির) উপর ভার দিয়ে যান যে তাঁরা না ফেরা পর্যন্ত সাত্যকি যেন যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনের সাহায্যের জন্য সাত্যকিকে পাঠাতে চাইলেন। সাত্যকি তাঁকে একা ফেলে যেতে সম্মত না হওয়ায় যুধিষ্ঠির জানালেন যে ভীম তাঁকে রক্ষা করবেন। অতঃপর ভীম কুরু সৈন্যদের শেষ করবার জন্য তার মধ্যে প্রবেশ করবেন স্থির করেন। কিন্তু সাত্যকি তাঁকে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষাই শ্রেষ্ঠ কাজ বলে জানালে তিনি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষার্থে গেলেন।

অতঃপর অর্জুন ও সাত্যকির অন্বেষণের জন্য চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির ভীমকে তাঁদের সন্ধানে পাঠালেন। ভীম ও কৌরব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি দ্রোণাচার্যের সারথি সহ রথকে চূর্ণ করে ধৃতরাষ্ট্রের এগারজন পুত্রকে নিহত করেন। অবশিষ্ট পুত্ররা সৈন্যদের সঙ্গে ভীমের ভয়ে পালিয়ে গেল।

দ্রোণাচার্য ও অন্য কৌরব যোদ্ধাদের পরাজিত করে ভীম দ্রোণাচার্যের রথকে তুলে আট বার নিক্ষেপ করেন। ভীম যেন খেলা করতে করতেই আট বার রথকে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর সাত্যকি ও অর্জুনের সন্ধানে গেলেন। তাঁদের দেখতে পেয়ে তিনি ভয়ঙ্কর গর্জন করলেন। কৃষ্ণার্জুন মহাসিংহনাদ করতে করতে অগ্রসর হলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনের সিংহনাদ শুনে প্রসন্ন হয়ে মনে মনে বললেন, ভীম, তুমি জ্ঞাতব্য বিষয় জানালে এবং গুরুজনের আজ্ঞা পালন করেছ। পাণ্ডুনন্দন, যাদের শত্রু তুমি, তাদের যুদ্ধে জয়লাভ হতেই পারে না। (ন হি তেষাং জয়ো যুদ্ধে যেষাং দ্বেষ্টাসি পাণ্ডব)

যুধিষ্ঠিরের এই উক্তি হতে ভীম মহপরাক্রমশালী হয়েও গুরুজন ব্যক্তিদের আজ্ঞাবহ এবং তাঁর শক্তি শত্রু পক্ষের ভীতির কারণ

পাঠকের কাছে স্পষ্ট।

ভীম ও কর্ণের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ভীমের নিকট সিংহনাদের সমবেত যোদ্ধাদের ধনু ও অন্যান্য অস্ত্র সব হাত থেকে খসে পড়ল। কত যোদ্ধা নিহত হল। সৈনদের বাহনরা অত্যন্ত ভীত হয়ে মলমূত্র ত্যাগ করতে লাগল। এই সময় বহু দুর্নিমিত্ত প্রকাশ পেলো। কর্ণ ও ভীমের এই যুদ্ধে আকাশ শকুনি কঙ্ক, ও কাকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভীমের আক্রমণে কর্ণ পীড়িত হল। ভীম ভল্লের দ্বারা সারথিকে নিহত করেন। তারপর তাঁর রথের চারটি অশ্বকে প্রাণহীন করে দিলেন। কর্ণ ভীত হয়ে অশ্বহীন তার রথ হতে লাফ দিয়ে অতি দ্রুত বৃষ সেনের রথে চড়লেন। এইভাবে ভীম তাঁকে পরাজিত করে সিংহনাদ করতে লাগলেন।

ভীমসেন ও কর্ণের মধ্যে আবারও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় এবং কর্ণ পরাজিত হন। (কর্ণ পর্ব দ্রষ্টব্য) এই সময় তিনি ধৃতরাষ্ট্রের দুর্জয় দুর্মুখ ইত্যাদি নামের সাত পুত্রকে নিহত করেন এবং কর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।

বারংবার কর্ণ ভীমের নিকট পরাজিত হয়ে পলায়ন করলে ধৃতরাষ্ট্র আক্ষেপ করে সঞ্জয়ের নিকট সখেদে ভীমের শক্তির বর্ণনা করে পুত্রদের নিন্দা করে বললেন।

দুর্যোধন বারংবার বলেছে কর্ণ বলবান, শৌর্যশালী বীর, সুদৃঢ় ধনুর্ধর এবং যুদ্ধে শ্রম ও ক্লান্তি জয় করেছে। কর্ণ সঙ্গে থাকলে পর রণাঙ্গনে তাকে দেবতারাও পরাজিত করতে পারবেন না। সে জায়গায় শক্তিহীন ও বিবেকশূন্য পাণ্ডবরা তার কি করতে পারবে? কিন্তু আজ রণাঙ্গনে বিষহীন সর্পের ন্যায় কর্ণকে পরাজিত হতে ও যুদ্ধ হতে পলায়ন করতে দেখে দুর্যোধন কি বলল?

অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপাচার্য এবং কর্ণ—এরা সকলে মিলিত হয়েও নিশ্চয়ই ভীমের সামনে অবস্থান করতে পারবেন না।

ন শক্তাঃ প্রমুখে স্থাতুং নূনং ভীমস্য সঞ্জয়।

তেহপি চাস্য মহাঘোরং বলং নাগয়যুতোপমম্ ॥
জানন্তো ব্যবসায়ঞ্চ ক্রূরং মারুত তেজসঃ।
কিমর্থং ক্রূর কর্মাণং যমকালান্তাকাপমম্ ॥ (দ্রোঃ) ১৩৫।৮-৯

—এদের সকলেই বায়ুতুল্য তেজস্বী ভীমের দশ হাজার হাতীর বলকে এবং তার ক্রূরতা পূর্ণ সিদ্ধান্তকে নিশ্চয়ই জানেন, তার বল, পরাক্রম এবং ক্রোধের সঙ্গে এঁদের পরিচয় আছে। এরূপ অবস্থায় তাঁরা যম, কাল ও অনন্ত তুল্য ক্রূর কর্মকারী ভীমকে যুদ্ধে পুনরায় নিজেদের উপর কেন ক্রুদ্ধ করবেন ?

যিনি যুদ্ধে অসুরকে জয়লাভ করেছিলেন সেই কর্ণকে যে পরাজিত করেছে, সেই ভীমকে কেউ যুদ্ধে জয় করতে পারবে না।

সঞ্জয়, যেমন বজ্র নিয়ে হস্ত উত্তোলনকারী দেবরাজ ইন্দ্রের সম্মুখে কোন দানবই অবস্থান করতে পারে নাই, সেইরূপ ভীমসেনের সম্মুখেও কোন যোদ্ধাই অবস্থান করতে সমর্থ হয় না।

উদ্যতাশনিহস্তস্য মহেন্দ্রস্যেব দানবঃ।
প্রেতরাজপুরং প্রাপ্য নিবর্তেতাপি মানবঃ ॥ (ভী) ১৩৫।১৪

—মানুষ যমালয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে, কিন্তু যুদ্ধে ভীমের নিকট কখনও কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারে না।

ধৃতরাষ্ট্রের উপরোক্তি হতে ভীমের পরাক্রম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানা যায়।

ভীমসেন ও কর্ণের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয় যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে। প্রথমে ভীম ও পরে কর্ণের জয়লাভ, তারপর অর্জুনের বানে ব্যথিত হয়ে কর্ণ ও অশ্বত্থামা পলায়ন করেন।

বহুবার কর্ণ ভীমের নিকট পরাজিন হন। অতঃপর কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধনু ছিন্ন এবং রথের অশ্বগুলি নিহত হল। ভীম রথ থেকে নেমে খড়্গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ ভীমের চর্ম ছেদন করলেন। ক্রুদ্ধ ভীম তাঁর খড়্গ নিক্ষেপ করে কর্ণের ধনু ছেদন করলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন। নিরস্ত্র ভীম- হস্তীর মৃতদেহ

ও ভগ্ন রথের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং অশ্ব হস্তীর দেহ নিক্ষেপ করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মূর্ছিত প্রায় হলেন। কুন্তীর নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে কর্ণ ভীমকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, ওরে মূর্খ, ওরে পেটুক, তুমি অস্ত্র বিদ্যা জান না। আর যুদ্ধ করতে এসো না। যেখানে বহুবিধ খাদ্য পানীয় থাকে, সেখানেই তোমার স্থান। তুমি রণভূমির অযোগ্য। ভীম, তুমি বনে গিয়ে মুনি হয়ে ফলমূল খাও। তুমি ত মৎসরাজ বিরাটের একজন ভৃত্য ও পাচক। গৃহে গিয়ে পাচক ও ভৃত্যদের তাড়না কর। আমার মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। তুমি কৃষ্ণার্জুনের কাছে যাও। তুমি গৃহে চলে যাও, বালক, তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন কি ?

কর্ণের এই উক্তি হতে বুঝা যাচ্ছে ভীম ভোজন বিলাসী ছিলেন। তাই কর্ণ সময় সময় তাঁকে ঔদরিক বা তূবরক (মাকুন্দ) বলে বিদ্রূপ করতেন।

যে কর্ণ বার বার ভীমের নিকট পরাজিত হয়েছেন, তাঁর এই দম্ভ অশোভনীয়। বস্তুতঃ এইরূপ হীন ভাষায় ভীমের মত মহাপরাক্রম-শালী যোদ্ধাকে উপহাস করা কোন প্রকারেই সঙ্গত নয়।

ভীম কিন্তু উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন—

জিতস্ত্বমসকৃদ্ দুষ্ট কথ্যসে কিং বৃথাত্মনা।
জয়াজয়ৌ মহেন্দ্রস্য লোকে দৃষ্টৌ পুরাতনৈঃ॥

(দ্রোঃ) ১৩৯।১০৭

—অরে দুষ্ট। আমি তোমাকে যুদ্ধে বার বার পরাজিত করেছি। সুতরাং তুমি বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করছ ? সংসারে পূর্বপুরুষগণ দেবরাজ ইন্দ্রেরও কখনও জয় এবং কখনও পরাজয় দেখেছেন।

এস আমার সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ কর। যেমন কীচককে পিষে বধ করেছিলাম, তেমনি এই সব রাজাদের সামনেই তোমাকে আমি

এক্ষুনি যমালয়ে পাঠাব।

ভীম প্রকৃত যোদ্ধার মত হার জিতকে মেনে নিয়েছেন। কর্ণের প্রবোচনায় তিনি উত্তেজিত হয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে যুদ্ধের শক্তি ক্ষয় করেননি। তাই তিনি দ্বিতীয় রাউণ্ডে কর্ণকে পরাজিত করতে পারলেন।

ভীম প্রতীপ পুত্র বাহ্লীককে যুদ্ধে নিহত করেন, ধৃতরাষ্ট্রের দশ পুত্র শকুনির সপ্ত রথী ও পঞ্চ ভ্রাতাকেও নিহত করেন। ভীমার্জুনের আক্রমণে কৌরব সৈন্যরা পলায়ন করে।

কর্ণ ও ঘটোৎকচে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তখন রাক্ষসরাজ অলায়ুধ পরাক্রমশালী সহস্র সহস্র রাক্ষস পরিবৃত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে দুর্যোধনকে বলালন—

হিড়িম্ব বক কির্মীরা নিহতা মম বান্ধবাঃ।

পরামর্শশ্চ কন্যায়া হিড়িম্বয়াঃ কৃতঃ পুরা॥ (দ্রোঃ) ১৬৭।৭

—(ভীম) আমাদের বন্ধু হিড়িম্ব, বক ও কির্মীকে বধ করেছে। এবং আমাদের অপমান করে রাক্ষস কন্যা হিড়িম্বাকে পুরোপুরি লাভ করেছে।

সুতরাং আমি ভীমসেন ও হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচকে বধ করবার জন্য স্বয়ং এখানে এসেছি।

অলায়ুধের উক্তি হতে মহাপরাক্রমশালী ভীমের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি একা এতগুলি রাক্ষসকে বধ করেছিলেন।

অলায়ুধের সঙ্গে ভীমের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। অবশেষে ঘটোৎকচ অলায়ুধকে বধ করে। (ঘটোৎকচ পর্ব দ্রষ্টব্য)

দ্রোণাচার্যকে দুর্যোধন পক্ষপাতিত্বের দোষের জন্য তিরস্কার করায় দ্রোণ পাণ্ডবদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ হেনে দ্রুপদের পৌত্রদের, দ্রুপদ ও বিরাট প্রভৃতি বীরদের বধ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তখন পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধে বিমুখতা দেখে ভৎর্সনা

করে বললেন, কোন ক্ষত্রিয় দ্রুপদের বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে শত্রুকে দেখেও উপেক্ষা করে ? কোন পুরুষ রাজসভায় শপথ করে পিতা ও পুত্রদের হত্যা দেখেও শত্রুদের পরিত্যাগ করে ? এই বলে ভীম শর নিক্ষেপ করতে করতে দ্রোণ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন।

দ্রোণের শরাঘাতে পাণ্ডব সেনা বিপর্যস্ত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ পরামর্শ দিলেন ধর্ম পথে কেউ দ্রোণকে জয় করতে পারবে না। তাই অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দিয়ে তাঁকে যুদ্ধ হতে বিরত করা উচিত।

মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে এক হস্তী ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোণের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বললেন—অশ্বত্থামা হত হয়েছে। এখানে ভীমের প্রত্যুৎপন্নমতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু দ্রোণাচার্য ভীমের কথা অবিশ্বাস করলেন এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে সত্য কথা জানতে চাইলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মৃত এই উক্তি দ্রোণের সম্মুখে বলতে অস্বীকৃত হলে ভীম ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—

হইয়া পাণ্ডবস্বামী, সকলে নাশিলে তুমি
তব সত্য না জানি কেমন ॥
অধর্ম করিলে যদি, হয় লোকে অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্যোধন।
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্তরথিগণে
এতদ্বিশিশু করিল নিধন ॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম, তুমি কি করিলে কর্ম,
নাশিলে, সকল রাজ্য-ধন। (দ্রোঃ)

যুধিষ্ঠিরকে প্রবোচনার যথার্থ যুক্তি উপস্থিত করেছেন ভীমসেন। Nothing is unfair in war. এখানে ভীমের ক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে দ্রোণ শোকে অভিভূত হয়ে পড়লে ভীম রূঢ় ভাষায় তাঁকে বলেছিলেন, যদি ব্রাহ্মণরা স্বধর্মে সন্তুষ্ট না থেকে অস্ত্র শিক্ষা করে যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকতো তবে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় হত না। এই সৈন্যরা নিজের পেশা অনুসারে যুদ্ধ করছে। আপনি অব্রাহ্মণের বৃত্তি নিয়ে এক পুত্রের জন্য বহু প্রাণী হত্যা করছেন। আপনার লজ্জা হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপনি অস্ত্র ধারণ করেছেন, যাঁর অপেক্ষায় আপনি জীবিত, আপনার সেই পুত্র সমর ক্ষেত্রে শায়িত হয়েছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথায় আপনার সন্দেহ করা উচিত নয়।

অশীতিপর গুরুর প্রতি একটি মিথ্যেকে সত্যে পরিণত করার জন্য ভীমের এই নির্মম প্রয়াসকে কোন প্রকারেই সমর্থন করা যায় না।

অর্জুন দ্রোণের মৃত্যুর জন্য যুধিষ্ঠির ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ধিক্কার দিলে ভীম অর্জুনকে বলেছিলেন—তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার পক্ষে এরূপ বলা উচিত নয়। তোমার কথা যেন অরণ্যবাসী মুনিদের ধর্মোপদেশের মত। যত দুঃখ পেয়েছ তা স্মরণ কর। সব ঘটনা ভুলে শুধু ধর্ম পথে থাকলে ক্ষাত্রধর্ম পালিত হয় না।

ভীমের এই উত্তর ধর্ম ও সত্যের কষ্টি পাথরে সমীচীন না হলেও বাস্তবতার দিক থেকে তা সমর্থন যোগ্য। বীর যোদ্ধার পক্ষে এরূপ উক্তি বিরূপ নয়।

দুঃশাসনকে একদিন সম্মুখ সমরে পেয়ে ভীম সেন গদাঘাতে তাঁর রথ বিধ্বস্ত করলেন এবং দুঃশাসনকে এরূপ আঘাত করলেন যে দুঃশাসন মূর্চ্ছিত প্রায় হয়ে পড়লেন।

তখন—

তত্রাহ কর্ণঞ্চ সুযোধনঞ্চ
কৃপং দ্রৌণিং কৃতবর্মাণমেব ॥
নিহন্মি দুঃশাসনমদ্য পাপং
সংরক্ষ্যতামদ্য সমস্তযোধাঃ ॥ (কর্ণ) ৮৩।১৬-১৭।

—ভীম সেখানে কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা এবং কৃতবর্মাকে

সম্বোধন করে বললেন—আজ আমি পাপিষ্ঠ দুঃশাসনকে বধ করছি। তোমরা সমস্ত যোদ্ধারা তাকে রক্ষা করতে পারলে রক্ষা কর।

এই বলে ভীম ভূতলে পতিত দুঃশাসনের গলায় পা দিয়ে তীক্ষ্ণ তরবারির দ্বারা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে পুনঃ পুনঃ রক্ত আস্বাদন করতে লাগলেন। এই অবস্থাতেও দুঃশাসন উঠবার চেষ্টা করলে ভীম তাঁর মস্তক ছেদন করে বললেন—

সর্বেভ্য এবাভ্যধিকো রসোঽয়ং
মমাদ্য চাস্যাহিতলোহিতস্য ॥ (কর্ণ) ৮৩।৩১

—সব কিছু হতেও এই শত্রুর রুধিরের আস্বাদ আজ অধিক বলে আমার মনে হচ্ছে।

দুঃশাসনকে প্রাণহীন দেখে ভীম অট্টহাস্য করে বললেন—আর কিই বা করব ?

ভীমের এই নিষ্ঠুর উল্লাস Shelley-র Revenge is the naked idol of the worship of a barbarous age কথাটি মনে পড়ে।

মৃত্যুনা রক্ষিতোঽসি ॥ (কর্ণ) ৮৩।৩২

—মৃত্যুই তোমাকে রক্ষা করল।

ভীমের এই ভীষণ মূর্তি দেখে কৌরব পক্ষে সকলই ভীত সন্ত্রস্ত পলায়নপর হয়ে বলতে লাগলেন

ন বৈ মনুষ্যোঽয়মিতি ব্রুবাণাঃ ॥ (কর্ণ) ৮৩।৩৫

—(ভীম) মানুষ নহে রাক্ষস।

এইখানে ভীম চরিত্রের সঙ্গে কুম্ভকর্ণ চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভীমসেনের এতদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখ অপমান জিঘাংসা বৃত্তিতে পর্য্যবসিত হলো। ভীমের এই আসুরিক বৃত্তি মানবাতাকে যেন লজ্জা দিচ্ছে। ভাই ভাই এর রক্ত পান করার মত পৈশাচিক মনোবৃত্তি পবন পুত্রর থেকে আশা করতে পারা যায় না। ভীমের সমগ্র চরিত্রে এতটা নির্মমতা আর কোথাও দেখা যায় না। তবে দুর্ধর্ষ বীর

চরিত্র সর্বত্র লোমহর্ষ।

অত্রৈব দাস্যাম্যপরং দ্বিতীয়ং
দুর্যোধনং যজ্ঞপশুং বিশস্য।
শিরো মৃদিত্বা চ পদা দুরাত্মনঃ
শান্তিং লপ্স্যে কৌরবাণাং সমক্ষম্॥ (কর্ণ)

৮৩।৫১

—এই যে অপর এক যজ্ঞ পশু দুর্যোধন রয়েছে, তাকেও বলিদান করব এবং সমস্ত কৌরবগনের সাক্ষাতেই এই দুরাত্মার মস্তক পদাঘাতে মর্জিত করে শান্তি লাভ করব।

কর্ণ নিহত হলে পর কৃপাচার্য দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সন্ধি করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, দুর্যোধন প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন—

মধ্যমঃ পাণ্ডবস্তীক্ষ্ণো ভীমসেনো মহাবলঃ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ তেনোগ্রং ভজ্যেতাপি ন সন্নমেৎ॥ (শঃ) ৫।১৪

—মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন মহা বলবান ও অতি ক্রুদ্ধ স্বভাব। তিনি উগ্র প্রতিজ্ঞা করেছেন। তিনি বরং ভেঙ্গে পড়বেন, তবু নতি স্বীকার করবেন না। অর্থাৎ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না।

দ্রোণের মৃত্যুর পর কর্ণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ হয়। অর্জুন কর্ণকে নিহত করেন। অবশেষে শল্যর সেনাপতিত্বে যুদ্ধ সুরু হয়। ভীমের সঙ্গে শল্যর যুদ্ধ হয়। শল্য পরাজিত হন। দ্বিতীয়বার ভীমের সঙ্গে শল্যর ভয়ানক গদাযুদ্ধ হয়। উভয়েরই পরাক্রম অলৌকিক ছিল। উভয়েই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী বীর। উভয়ে উভয়কে মর্দিত করতে মণ্ডলাকারে বিচরণ করছিলেন এবং নিজের নিজের বিশেষ কার্য কৌশল দেখিয়েছিলেন। ইহারা উভয়ে উভয়কে গদাঘাতে আহত করেছিলেন এবং উভয়েই এক সঙ্গে ভূতলে পতিত হলেন। কৃপাচার্য শল্যকে নিজের রথে তুলে অতি দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। অন্যদিকে ভীম ক্ষণকালের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে মদমত্ত পুরুষের ন্যায় শল্যকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করতে লাগলেন।

ভীম শল্য রাজার অশ্বদের ও সারথিকে হত্যা করেছিলেন। ভীমসেন শল্যকে বধ করেছিলেন। ভীমসেন একশ হাজার পদাতিক সৈন্যকে গদার দ্বারাই ধরাশায়ী করেছিলেন। কৌরব সৈন্যরা ভয়ে পলায়ন করছিল। অতঃপর অর্জুন ও ভীম কৌরবপক্ষের রথ সৈন্য সংহার করে ছিলেন। কৌরব সৈন্যরা পুনরায় পলায়ন করে। সাত্যকি সঞ্জয়কে বন্দী করেন। ভীম ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত পুত্রকেই হত্যা করেন এবং চতুরঙ্গিনী সৈন্য বিনাশ করেন।

দুর্যোধনের পক্ষে এক এক করে সকলেই প্রায় নিহত হলে দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করলেন। যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে অবশেষে দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে গদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সম্মত হলেন।

ভীম গদা হস্তে দুর্যোধনকে আহ্বান করে বললেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি যে সব অন্যায় কাজ করেছ তা স্মরণ কর। দুরাত্মা, তুমি সভা মধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে নিগৃহীত করেছ, শকুনির বুদ্ধিতে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় জয় করেছ। নিরপরাধ পাণ্ডবদের প্রতি বহু দুর্ব্যবহার করেছিলে—তার অশুভ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই পিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, তোমার পাপে দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, শকুনি—সকলেই রণাঙ্গনে নিহত। তোমার ভ্রাতারা বীর পুত্ররা, সৈন্যরা এবং শক্তিশালী বহু নৃপতিও মৃত্যু বরণ করেছে।

অবশিষ্টস্তমেবৈকঃ কুলঘ্নোঽধমপুরুষঃ।
ত্বামপ্যদ্য হনিষ্যামি গদয়া নাত্র সংশয়॥ (শল্য) ৩৩।৫০

—এখন এই বংশের অবশিষ্ট নরাধম একমাত্র তুমিই জীবিত আছ। এই গদার আঘাতে তোমাকেও বধ করব—এতে কোন সংশয় নেই।

আজ আমি যুদ্ধে তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করব। তোমাকে বধ করব।

দুর্যোধন বললেন, বৃকোদর আত্মশ্লাঘা করে কি হবে? আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার যুদ্ধ প্রীতি আজ দূর করব। পাপী, কোন

শত্রু আজ ন্যায় যুদ্ধে আমাকে জয় করতে পারবে ? ইন্দ্রও পারবেন না। তোমার যত বল আছে, তা আজ যুদ্ধে দেখাও।

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ যখন আরম্ভ হতে যাচ্ছিল তখন হলধর বলরাম সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন দুর্যোধন ও ভীম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবরা তাঁকে অর্চনা করে বললেন, আপনি আপনার দুই শিষ্যের যুদ্ধ কৌশল দেখুন। তিনি সকলকে যথাযোগ্য আলিঙ্গন ও কুশল প্রশ্ন করে যুদ্ধ দেখবার জন্য বসলেন। বলরামের পরামর্শে সকলে কুরুক্ষেত্রে গেলেন এবং সেখানে দুর্যোধন ও ভীম যুদ্ধ সুরু করলেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে ভীমের গদা যুদ্ধ সুরু হলে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন ভীম অধিকতর বলবান হলেও দুর্যোধন অধিক কৌশলী। ন্যায় যুদ্ধে দুর্যোধন জয়ী হবে। দ্যূত সভায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবেন, এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। মায়াবী দুর্যোধনকে মায়ার দ্বারাই অর্থাৎ কপটতার দ্বারাই হত্যা করুন। ভীম যদি নিজের বলের উপর নির্ভর করে ন্যায় যুদ্ধ করেন তবে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়বেন। তখন অর্জুন নিজের বাম উরুতে করাঘাত করে ভীমকে ইঙ্গিত করেন। ভীমও সুযোগ বুঝে দুর্যোধনের উরুতে এক প্রচণ্ড আঘাত করলেন। দুর্যোধন মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

দুর্যোধন সশব্দে মাটিতে পড়লে তখন ধূলি বৃষ্টি ও উল্কাপাত হল, যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচরা অন্তরীক্ষে কোলাহল করে উঠল, ঘোর দর্শন কবন্ধরা নৃত্য করতে লাগল ভীম দুর্যোধনকে ভর্ৎসনা করে তাঁর কৃতকর্ম স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, আমাদের শঠতা দ্যূত ক্রীড়া বা বঞ্চনা নেই. আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহুবলেই শত্রুবধ করি। তারপর বাঁ পা দিয়ে দুর্যোধনের মাথায় লাথি মেরে প্রতিশোধ নিলেন।

একমাত্র ভীমের পক্ষেই এমন নির্দয় কর্ম সম্ভব। যেমনি তাঁর

অমানুষিক শক্তি, তেমনি তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ। অপমানের আগুন অহর্নিশ তাঁকে তেরটি বছর দগ্ধ করেছিল। তবু তিনি ভরতবংশ রক্ষার জন্য সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন যখন তাতেও সম্মত হলেন না, তখন তিনি তাঁকে তাঁর যোগ্য চরম শাস্তি দিলেন।

ভীমের আচরণে সোমক বীররা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি সৎ বা অসৎ উপায়ে শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছ, প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দুর্যোধন এখন হতপ্রায়। ইনি একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা ও কৌরবদের অধিপতি। তোমার আত্মীয়, তুমি এঁকে পদাঘাত কর না। এঁর জন্য শোক করা উচিত। উপহাস করা উচিত নয়। তুমি পদাঘাত করে অন্যায় করেছ। তারপর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বললেন দুঃখ কর না। তোমার কর্মফলে এই নিদারুণ ফল ভোগ করছ। তোমার পাপেই আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিদের বধ করেছি। তুমি নিজের জন্য শোক কর না। তোমার প্রশংসনীয় মৃত্যু হয়েছে। এখন সর্ব প্রকারে আমরাই শোচনীয় অবস্থায় পড়েছি। কারণ প্রিয় বন্ধুদের হারিয়ে দীনভাবে জীবন যাপন করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা বধূদের আমি কি করে দেখব বা সান্ত্বনা দেব ?

ত্বমেকঃ সুস্থিতো রাজন্ স্বর্গে তে নিলয়ো ধ্রুবঃ ॥
বয়ং নরকসংজ্ঞং বৈ দুঃখং প্রাপ্স্যাম দারুণম্। (শল্য)
৫৯।২৯½

—তুমিই একাকী সুখী। নিশ্চয়ই স্বর্গে তুমি স্থান লাভ করবে এবং এস্থানে আমাকে নরক তুল্য নিদারুণ দুঃখ ভোগ করতে হবে।

সমগ্র মহাভারতে এটাই নিদারুণ ট্র্যাজেডি। যুদ্ধে জয় লাভ করেও আত্মীয় পরিজন বান্ধবহীন জীবনের নিদারুণ শোকে পাণ্ডবরা নিমজ্জিত হলেন। দুর্যোধন সমর ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করে স্বর্গ সুখ লাভ করলেন। কারো জন্য শোক করবার জন্য তিনি জীবিত রইলেন না।

বলরাম অন্যায়ভাবে নাভির নিম্নে গদার প্রহারে দুর্যোধনকে পরাজিত করার জন্য ভীমের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করে তাঁর লাঙল উদ্যত করে ভীমের প্রতি ধাবিত হলে কৃষ্ণ তাঁকে নিবৃত্ত করেন। তিনি আরও বললেন ভীম দ্যূত সভায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে যুদ্ধে দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করবেন, তাছাড়া মহর্ষি মৈত্রয়ও দুর্যোধনকে এইরূপ অভিশাপ দিয়েছিলেন। কলিযুগও আরম্ভ হয়েছে। ভীমের দোষ নেই। বলরাম অপ্রসন্ন হয়ে বললেন, ভীম অন্যায়ভাবে দুর্যোধনকে বধ করে কুট যোদ্ধা বলে খ্যাত হবে। সরলভাবে যুদ্ধ করার জন্য দুর্যোধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ করবে ও যশ লাভ করবে বলে বলরাম দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা করেন।

অশ্বত্থামা গভীর রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালদের এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে হত্যা করেন।

যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নাদি ও পুত্রদের হত্যায় বিলাপ করলে ভীম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন :—

অকারণে কর শোক ইতরের প্রায় ॥
পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু হয় কর্মবশে।
নাহি জান কোথা ছিলে যাবে কোন্ দেশে ॥
কর্ম বশে আসি মিলে কেহ নহে কার।
জন্মিলে মরণ আছে নহে খণ্ডিবার ॥
যে মরিল সে চলিল যথা কর্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দেবের সংযোগ ॥
কালপূর্ণ হলে আর কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃপুনঃ মরে ॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
বিপক্ষে জিনিয়া মৃত্যু হৈল নিশাকালে ॥
কাল পূর্ণ হৈলে মরে বিধির নির্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে ইথে এই বন্ধ ॥

ইথে শোক অনুচিত ভাবিয়া কি কাজ।
শাস্ত্র বিজ্ঞ হয়ে কেন চিন্ত মহাবাজ॥ (ঐষীক)

এখানে ভীমের অসীম বিজ্ঞতার পবিচয় পাওয়া যায়। শোক সন্তপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি এইভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিয়ে সান্ত্বনা দেবাব চেষ্টা করেছেন।

এই ঘটনায় দ্রৌপদী প্রাযোপবেশন করবেন মনস্থ কবেন। যুধিষ্ঠিব তাঁকে সান্ত্বনা দিলে তিনি বললেন অশ্বত্থামার মস্তকে একটি মণি আছে, তাকে বধ কবে সেই মণি যদি যুধিষ্ঠিব নিজেব মস্তকে ধাবণ করেন, তবেই তিনি জীবন ত্যাগে বিবত হবেন। ভীম সেই মণিটি দ্রৌপদীকে এনে দিয়েছিলেন।

দ্রৌপদী তাঁব পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জুনকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। যুধিষ্ঠিবকে তিনি তাঁব প্রিয় জিনিস উপহাব দিতেন যেমন উড়ে আসা পদ্মফুল বা মনি ইত্যাদি। কিন্তু তাঁব বিপদের দিনে ডাক পড়তো ভীমেব। তাঁব সব আবদাব বাখতেন ভীম। এখানেও ভীমেব একটি সুন্দব চবিত্র ফুটে উঠেছে। দ্রৌপদীর এ ধরণেব পক্ষপাতিত্বে তিনি কখনও অনুযোগ, অভিযোগ বা অভিমান কবেননি। এখানে তাঁব চরিত্রেব উদারতা ও সরলতাব পবিচয় পাওয়া যায। দ্রৌপদীব প্রতি কৌববদেব বা কীচকেব সব বকম লাঞ্ছনাব প্রতিশোধ একমাত্র ভীমসেনই নিয়েছেন। স্বামীর যথার্থ কর্তব্য পালন কবেছেন।

অন্যায় যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে নিহত করায় গান্ধারী ক্রুদ্ধা হলেন। ভীম তাঁকে বললেন, আত্মবক্ষার্থে তিনি ভযে এইরূপ করেছেন। তাঁব পুত্রদেব দুষ্কর্মের কথা স্মবণ করিয়ে দিয়ে ভীম বললেন, সেই জন্যই তিনি এরূপ কর্ম কবেছেন। তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কবেন।

গান্ধারী দুঃশাসনেব বক্তপানেব জন্য ভীমকে তিবস্কার করলে ভীম বললেন, আমি বক্ত পান কবিনি। ওষ্ঠ রক্ত রঞ্জিত করেছিলাম।

দ্রৌপদীর উপর রাজসভায় সর্ব সমক্ষে যে লাঞ্ছনা হয়েছিল, সে সময় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই ঐ কর্ম করতে বাধ্য হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ভীম গান্ধারীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পাণ্ডবদের প্রতি তাঁর পুত্রদের দুর্ব্যবহার করার সময়, তিনি তাঁদের নিবৃত্ত করেননি। কিন্তু এখন পাণ্ডবদের কেন দোষারোপ করছেন ?

অপ্রিয় সত্য বলতে ভীমসেন কখনো পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এক-মাত্র তিনিই এমন ভাবে গান্ধারীর সমালোচনা করবার দুঃসাহস করেছেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনা কোন স্থানে অন্যায় বা অযৌক্তিক নয়। সর্বত্রই ভীমকে স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক দেখতে পাই।

আত্মীয় পরিজন বিরহ শোকাতুর যুধিষ্ঠির জয়লাভ করার পর অর্জুনের উপর রাজ্যভার দিয়ে বনবাসের সঙ্কল্প করলেন। তখন ভীম তাঁকে বলেছিলেন, আপনি বেদ পাঠক ব্রাহ্মণের ন্যায় কথা বলছেন। আপনি আলস্যে দিন যাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। আপনার এমন বুদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ। শক্তিশালী কৃতবিদ্য ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন ক্লীবের বশে চলেছি। বনে গিয়ে মৌনব্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে, জীবিকা নির্বাহ হবে না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এমন কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে একমাত্র ভীমই পারতেন। তাঁর মত একজন মহাবীর দীর্ঘকাল অরণ্যে অরণ্যে যে ক্লেশ ভোগ করেছেন তার একমাত্র কারণ যুধিষ্ঠির। সুতরাং আজ তাঁর এই বৈরাগ্যে ভীমের ধৈর্য্যচ্যুতি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে আরও বলেছিলেন, আপনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নরপতি হয়েও কাপুরুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত কেন হচ্ছেন। আপনি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন, এখন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। পিতৃ পিতামহের অনুসরণ করে রাজ্য শাসন ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, আমরা ও কৃষ্ণ আপনার অনুগত রয়েছি।

এখানে তিনি অপেক্ষাকৃত সংযত ভাষায় যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের পরে ভীমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়েছিল।

কাশীদাসী মহাভারতে অশ্বমেধ পর্বে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলছেন ভীম যুদ্ধ করে অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে আনবে। তা শুনে কৃষ্ণ ভীমের সমালোচনা করেন। তা শুনে ভীম ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণকে প্রত্যুত্তরে বলেন—

কহিলে আমারে তুমি গর্বিত বলে॥
তুমি যদি বল আমি কি করিতে পারি।
কিন্তু আপনার ছিদ্র নাহি জান হরি॥
ভাগর উদর মম দেখ নারায়ণ।
তোমার উদরে কৃষ্ণ এ তিন ভুবন॥
আমা সমা কামাতুর না দেখ আপনি।
ষোল শত অষ্ট হয় তোমার রমণী॥
তাহা লয়ে ক্রীড়া কর দিবস রজনী।
আমি কিসে কামাতুর বল গুণমণি॥
নিন্দিলে আমার কাছে রাক্ষসী বনিতা।
তোমার গৃহেতে আছে ভল্লুক-দুহিতা॥
আপনা না জানি কৃষ্ণ নিন্দহ অন্যেরে।
কীর্ত্তি রাখিয়াছ গোকুল নগরে॥
পাসরিলে সেই কথা রাধার জীবন।
আমারে নিন্দিয়া কহ কুৎসিত বচন॥
ভয় নাহি করি আমি যুবনাশ্ব বীরে।
তুরঙ্গ আনিব আমি জিনিয়া তাহারে॥
— — — —
সত্য বলি এই কথা জানে সর্বজন॥

আমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে। (অশ্বমেধ)

এখানে ভীম যে কেবল স্পষ্ট বক্তা তাই প্রকাশ পায়নি, কৃষ্ণের মত সর্বজন পূজ্য ব্যক্তিকে অপ্রিয় হলেও সমালোচনা করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। কিন্তু এই উক্তি নিছক কবি কল্পনা বলেই মনে হয়।

ভীমের ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি আক্রোশ কমেনি। সকলের অগোচরে তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শুনিয়ে নিজের বাহুবলের প্রশংসা করতেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের তিনি হত্যা করেছেন তা সাড়ম্বরে বৃদ্ধকে শোনাতেন। ভৃত্যদের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ লঙ্ঘন করিয়ে প্রতি-হিংসা মিটাতেন।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরদের আহ্বান করে তাঁর সস্ত্রীক বাণপ্রস্থ গ্রহণের সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তার প্রকৃত কারণ গোপন করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে নিহত আত্মীয় পরিজনদের শ্রাদ্ধার্থে অর্থ চাইলেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জুন সেই অর্থ দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু ভীম সক্রোধে বললেন—ভীষ্ম দ্রোণাদি এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদের শ্রাদ্ধ আমরা করব। কর্ণের শ্রাদ্ধ কুন্তী করবেন। শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অর্থ দেওয়া উচিত নয়, তাঁর দুষ্টাত্মা পুত্ররা পরলোকে কষ্ট ভোগ করুক। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের পূর্ব দুষ্কর্ম এক এক করে ভ্রাতাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ভীম যে কতটা নির্দয় প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন—এই উক্তি তার প্রমাণ। কর্ণ ভীমের ভ্রাতা জানা সত্ত্বেও ভীমের প্রতি কর্ণের বিদ্বেষ শ্লেষোক্তির কথা স্মরণ করে, পাণ্ডবের প্রতি কর্ণের শ্লেষোক্তির কথা স্মরণ করেই বোধ হয় তাঁর তর্পণাদি ক্রিয়া কর্ম জননীর উপর ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কর্ণ পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমা করতে তিনি পারেননি।

যুধিষ্ঠির ভীমকে শান্ত করে বিদুরকে বলেন, আপনি কুরুরাজকে জানান যে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ আমি নিজের কোষ হতে দেব।

তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবে না। বনবাস কালে ভীম অনেক কষ্ট ভোগ করেছে। তার রূঢ় ব্যবহারে কুরুরাজ যেন ক্রুদ্ধ না হন।

Seneca র Revenge is a confession of pain—এই উক্তিটি যুধিষ্ঠিরের ভীমের প্রসঙ্গে বিদুরের নিকট কথিত উক্তিকে সমর্থন করেছে।

ভীম যে যথার্থই স্পষ্ট বক্তা ছিলেন তার আরও একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর বানপ্রস্থ যাত্রা করলেন, তখন কর্ণের শোকে শোকাতুরা জননী কুন্তীও তাঁদের অনুগমন করেন। তখন ভীম কুন্তীকে জিজ্ঞেস করেন যে সন্তানদের ত্যাগ করে বন গমনের ইচ্ছাই যদি তাঁর ছিল, তবে তাঁদের যুদ্ধ করবার জন্য উৎসাহিত করবার জন্য বিদুলার কাহিনী শুনিয়ে লোকক্ষয় কেন করালেন?

ভীমের নিকট আপন জননীরও নিষ্কৃতি ছিল না। তিনি জননীকেও স্পষ্ট কথা শোনাতে দ্বিধা করতেন না।

ভীমও ভ্রাতাদের সঙ্গে জননী কুন্তী ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সঙ্গে দেখা করবার জন্য বনে গমন করেন। কিছুকাল সেখানে বাস করে তাঁরা পুনরায় হস্তিনায় ফিরে আসলেন। দেবর্ষি নারদের নিকট হতে ধৃতরাষ্ট্রাদি ও কুন্তীর মৃত্যু সংবাদ শুনে ভীমও জননীর জন্য বালকের মত কেঁদেছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের পঁয়ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হলে রাজ্যে নানা প্রকার অমঙ্গল দেখা গেল। তখন যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থানে যাবেন সঙ্কল্প করলেন। ভীমও অন্যান্য পাণ্ডব দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে মেরু পর্বতের নিকটবর্তী হলে পথি মধ্যে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জুনের মৃত্যু হয়। ভীম যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যেকের মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। যুধিষ্ঠিরও যথাযথ উত্তর দেন। (যুধিষ্ঠির পর্ব দ্রষ্টব্য) অবশেষে ভীমও পতিত হলেন।

তখন ভীম যুধিষ্ঠিরকে তাঁর পতনের হেতু জিজ্ঞেস করলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমকে জানালেন, তিনি ভোজন বিলাসী ছিলেন এবং অন্যের বল সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়েই, নিজ বলের গর্ব করতেন—এই অপরাধেই তাঁর পতন ঘটেছে। এই পতনই ভীমসেনের মৃত্যুর কারণ।

ভীম সরল প্রকৃতির ও স্পষ্টবক্তা। আত্মীয় পরিজনের মৃত্যু তিনি ইচ্ছা করেননি, তাই কৃষ্ণকে সন্ধির চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি যদিও ধর্মভীরু ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনে ছলনার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মত বীর্যবান্ রামায়ণে একমাত্র কুম্ভকর্ণ চরিত্রেই দেখা যায়। পাণ্ডবরা ও দ্রৌপদী তাঁর শক্তির উপরই অধিক নির্ভর করতেন। ভীমের ভ্রাতৃভক্তিও প্রশংসনীয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মহাভারতে তাঁর উদাহরণ অদ্বিতীয়।

Schopenhauer বলেছেন Where there is much pride of self-conceit there will be a great desire for revenge. ভীম সম্বন্ধে কথাটি খুবই প্রযোজ্য।